সংখ্যা, ১-৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

CUL-H01951-79-P36222

ত্রৈমাসিক

একাশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ—আষাঢ়

১৩৮১

(79)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা—৭০০০০৯

স্মারক গ্রন্থ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান্ এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চিরস্মরণীয় লেখকদের দুষ্প্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহেব নির্বাচিত সংকলন ॥

বাঙ্গালাব "ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, স জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষযে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত" হইযা পরিষৎ-পত্রিকায় হইযাছিল সেগুলিব পরিচয় কৌতূহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এই গ্রন্থে প

পবিচ্ছন্ন মুদ্রণ, শোভন বাঁধাই, উৎকৃষ্ট কাগজ।

মূল্য পনের টাকা ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

একাশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ—আষাঢ়

১৩৮১

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

P 36,222

ভারত কোষ

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা Encyclopaedia এন্‌সাইক্লোপীডিয়া

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সুদৃশ্য বাঁধাই। সম্পূর্ণ সেট্ এক শত টাকা।

ভি. পি. খরচ সহ অগ্রিম পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। অন্যূন ১০ খণ্ড লইলে গ্রন্থ-বিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয়।

পরিষদ্ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ

বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসের পদাবলী, রামমোহন-গ্রন্থাবলী, মধুসূদন-গ্রন্থাব বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ভারতচ গ্রন্থাবলী, অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী, রামেন্দ্রসুন্দর-বচনাবলী, রামেশ্বর-বচনাব বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর-গ্রন্থাবলী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বচনাবলী, শরৎকুম চৌধুরাণী বচনাবলী

প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে রক্ষণীয়॥

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম হইতে ১১শ খণ্ড

সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী

মূল্য : ১২৫·০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৩৭৪৩

২। **অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-পুরস্কার ॥**

বিষয় : বাংলাকাব্যে অক্ষযকুমাব বডাল।

লেখক : শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায।

৩। **স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কার ॥**

বিষয় : বাংলা কাব্যসাহিত্যে নিরুপমা দেবী।

লেখিকা : শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায।

৪। **লীলা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার ॥**

বিষয : কবি কামিনী রায।

লেখিকা : শ্রীমতী মীবা চট্টোপাধ্যায ॥

কার্য্যনির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনেব জন্য কার্য্যনির্বাহক সমিতিব ৮টি অধিবেশন হইযাছে। আলোচ্য বর্ষেব কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্বাহক সমিতিব সভ্যগণের নাম পবিশিষ্ট 'ক'-এ প্রদত্ত হইল ॥

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয :

১ম মাসিক অধিবেশন : ৬ই আশ্বিন ১৩৮০, ববিবাব।

২য় মাসিক অধিবেশন : ৮ই অগ্রহাযণ ১৩৮০, শনিবাব।

৩য় মাসিক অধিবেশন : ৫ই মাঘ ১৩৮০, শনিবাব।

৪র্থ মাসিক অধিবেশন : ২৯শে চৈত্র ১৩৮০, শুক্রবাব ॥

সদস্য

বিভিন্ন শ্রেণীব সদস্যগণেব বিববণ পবিশিষ্ট 'খ'-এ প্রদত্ত হইল ॥

ভারতকোষ

বিগত ৮১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে (৮ই শ্রাবণ ১৩৮০, ২৪শে জুলাই ১৯৭৩) ভাবতকোষেব ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয। ভাবতকোষে যে সকল প্রযোজনীয প্রসঙ্গ স্থানাভাবে মুদ্রিত নাই, সেই প্রসঙ্গগুলি লইযা একখানি পবিপূবক খণ্ড প্রকাশ কবিবাব জন্য পবিষৎ চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষযে পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশে সহাযতাব জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয বন্দ্যোপাধ্যায, পশ্চিমবঙ্গেব শিক্ষা-কমিশনাব ও শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপকুমাব গুহ ও শিক্ষাঅধিকর্তা অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন কবকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পশ্চিমবঙ্গেব মাননীয বাজ্যপাল

শ্রীযুক্ত আণ্টনি লালসলট্ দিযাস্ ৫ম খণ্ড প্রকাশেব জন্য পবিষদেব প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশ কবিযাছেন। তাঁহাব আগ্রহে ও অনুগ্রহে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে ভাবতকোষেব পঞ্চম খণ্ডেব জন্য বিশেষ অনুদান লাভ সম্ভব হওযায ভাবতকোষ সম্পূর্ণ কবা সম্ভব হইযাছে, ইহা কৃতজ্ঞতাব সহিত স্মবণ কবি ॥

সভাসমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইযাছে :

১। ৮১-তম প্রতিষ্ঠা উৎসব : ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায

মঙ্গলাচবণ : শ্রীহবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদাব, শ্রীসুকুমাব সেন, শ্রীমদনমোহন কুমাব।

২। অশীতিতম বার্ষিক অধিবেশন : ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমাব

৩। কবি অতুলপ্রসাদ সেনেব চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসব : ৮ই অগ্রহাযণ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায

বক্তা : শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদাব, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায (বনফুল), শ্রীবাজ্যেশ্বব মিত্র, শ্রীমদনমোহন কুমাব।

সঙ্গীত : লোকবঞ্জন শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সবকাব।

৪। বাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শনী : ১লা মাঘ ১৩৮০

উদ্বোধক : শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমাব

৫। বাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভা : ৫ই মাঘ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায

প্রবন্ধ পাঠ : শ্রীসুকুমাব সেন। বিষয : 'ভাষা ও সাহিত্যে বাজেন্দ্রলালেব দান'।

বক্তা : শ্রীবি. মুখোপাধ্যায (সভাপতি এসিযাটিক সোসাইটি), শ্রীশিশিবকুমাব মিত্র, শ্রীদিলীপকুমাব মিত্র, শ্রীমদনমোহন কুমাব।

৬। বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুব পবলোকগমনে স্মৃতিতর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি : ৫ই ফাল্গুন ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায

বক্তা : শ্রীপবিমল ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ি, শ্রীমহাদেব দত্ত, শ্রীমৃণাল-কুমাব দাসগুপ্ত, শ্রীজযন্ত বসু, শ্রীসমবেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীবমেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমদনমোহন কুমাব

৭। বসন্তবঞ্জন বায বিদ্বদ্বল্লভেব চিত্রপ্রতিষ্ঠা, বসন্তবঞ্জনেব বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধেব পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও সংগৃহীত পুথি ইত্যাদিব প্রদর্শনী : ১৯ শে ফাল্গুন ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেদগান : কুমাবী শুক্লা কুমাব, কুমাবী স্বপ্না মণ্ডল, কুমাবী শুভ্রা চক্রবর্তী ও কুমাবী দীধিতি বিশ্বাস

(প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সংস্কৃত কলেজেব ছাত্রীবৃন্দ)

বক্তা : শ্রীসুকুমাব সেন, শ্রীমদনমোহন কুমাব

৮। বমাপ্রসাদ চন্দেব জন্মশতবার্ষিকী, চিত্রপ্রতিষ্ঠা, বচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রেব প্রদর্শনী : ১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ পাঠ : শ্রীদীনেশ চন্দ্র সবকাব। বিষয : (১) 'প্রত্নতাত্ত্বিক বমাপ্রসাদ চন্দ', (২) 'পালবংশীয় বাজগণেব ধর্মমত'।

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয : 'বমাপ্রসাদ চন্দ'।

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমাব। বিষয : 'বসন্তবঞ্জন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'

৯। ফেডাবেল বিপাব্লিক অফ জার্মানীব কনসাল জেনাবেল মাননীয হান্স ফের্দিনান্দ লিন্সেব-কর্তৃক প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথিব মাইক্রোফিল্ম প্রদান উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান : ১২ই চৈত্র, ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায (বনফুল)

বক্তা : হান্স ফের্দিনান্দ লিন্সেব, শ্রীকালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত, শ্রীমদনমোহন কুমাব

১০। ইন্দিবা দেবী চৌধুবাণী ও হেমলতা ঠাকুবেব জন্মশতবার্ষিকী-উৎসব : ২৯শে চৈত্র, ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমাব বিশ্বাস

বক্তা : শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায, শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী, শ্রীসমীবেন্দ্রনাথ সিংহবায, শ্রীমদনমোহন কুমাব

১১। মাইকেল মধুসূদন দত্তেব সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উৎসব : ৩০শে চৈত্র, ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায (বনফুল)

প্রবন্ধপাঠ : শ্রীজ্যোতির্ময ঘোষ, শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমাব

কবিতাপাঠ : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবণেশচন্দ্র পোদ্দার

১২। কবি-গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের চিত্রপ্রতিষ্ঠা ও রচিত গ্রন্থ, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রাদির প্রদর্শনী : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার

কবিতাপাঠ : শ্রীসুধীরকুমার বসু, শ্রীমণ্টুকুমার মিত্র কর্তৃক কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের কবিতা ॥

পুস্তক মুদ্রণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নূতন সংস্করণ অথবা পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে :

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (৯ম সংস্করণ)—শ্রীমদনমোহন কুমার সং

২। রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড

৩। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত :

৯ সংখ্যক গ্রন্থ : রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী

১৩ „ „ : জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার

২৩ „ „ : মধুসূদন দত্ত

২৭ „ „ : নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ

৩৮ „ „ : যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

৪৯ „ „ : রাজনারায়ণ বসু

৯৭ „ „ : কেশবচন্দ্র সেন।

এই গ্রন্থগুলি দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকায় 'সাহিত্যসাধকচরিতমালা' খণ্ডিত ছিল। এগুলি পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় গবেষকগণ সাহিত্যসাধকচরিতমালা সম্পূর্ণ সেট পাইবেন।

৪। কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫। বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬। লীলাবতী—দীনবন্ধু মিত্র

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পরিষৎ-সংস্করণ রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সমগ্র রচনাবলী দীর্ঘদিন মুদ্রিত ছিল না। বর্তমান বর্ষে সেগুলির সম্পূর্ণ সেট পুনরায় পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকগণের হস্তে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন।

নিম্নলিখিত পুস্তক নূতন প্রকাশিত হইযাছে :

১। স্মাবক-গ্রন্থ (বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ৭৫-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসবে পঠিত এবং ৭৫ বৎসবেব সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা হইতে নির্বাচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ)

২। কবিকঙ্কণ মুকুন্দবাম চক্রবর্তী : জীবন ও কাব্য—শ্রীমদনমোহন কুমাব

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ইতিহাস : প্রথম পর্ব—শ্রীমদনমোহন কুমাব ॥

পুথিশালা

বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব পুথিশালা অমূল্য বত্নভাণ্ডাব। আলোচ্য বর্ষে তালিকাভুক্ত সর্ব্বপ্রকাব পুথিব সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ৬৭৩৪। ইহাদেব বিষযভাগ নিম্নরূপ :

বাংলা—৩৫৩৯ (সাধাবণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ৩০৫৯ + ৪৮৯), সংস্কৃত—২৯২৬ (সাধাবণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ২২৭৫ + ৬৫৩), হিন্দুস্থানী—১, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী—১৩। পবিষদে প্রদত্ত বিভিন্ন সংগ্রহেব মধ্যে আছে বাংলা পুথি : দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাস সংগ্রহ—৪১১, বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী সংগ্রহ—২১, এবং গোপালদাস চৌধুবী সংগ্রহ—৫৭ ; সংস্কৃত পুথি : দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাস সংগ্রহ—১৩, বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী সংগ্রহ—৬০, গোপালদাস চৌধুবী সংগ্রহ—২৫৬, ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগব সংগ্রহ—৩২৪।

এ বৎসব মোট ৫ জন গবেষক ২২ খানি পুথি পবিষৎ মন্দিবে বসিযা ব্যবহাব কবিযাছেন।

বর্ত্তমান বৎসবে ফেডাবেল বিপাবলিক অফ্ জর্মানিব কন্সাল্ জেনাবেল ডক্টব হান্স ফের্দিনান্দ লিন্সেব পবিষৎ মন্দিবে বক্ষিত বহু সুপ্রাচীন পুথিব মাইক্রোফিল্ম, গত ১২ই চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দে 'বনফুল'-এর সভাপতিত্বে পবিষদ্ মন্দিবে একটি মনোবম অনুষ্ঠানে, পবিষৎ সম্পাদকেব হাতে প্রদান কবিযা পবিষদেব অপবিসীম উপকাব কবিযাছেন। অধ্যাপক গ্যেফ্কে কর্তৃক এই দুর্লভ প্রাচীন পুথিগুলিব মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত হইযাছে। অধ্যাপক গ্যেফ্কে, কন্সাল্ জেনাবেল লিন্সেব এবং ফেডাবেল বিপাবলিক অফ্ জর্মানিব সবকাব সকলকেই আমাদেব অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন পবিষদেব পুথিশালায একটি মাইক্রোফিল্ম বীডাব যন্ত্র সংগৃহীত হইলে এই মাইক্রোফিল্মগুলি গবেষকগণেব পক্ষে ব্যবহাব কবা সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব ও কেন্দ্রীয সবকাবেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবি।

বীবভূম লাভপুব থানাব অধীনস্থ হবানন্দপুব গ্রাম নিবাসী শ্রীঅনিলবরণ বায তাঁহাদেব পরিবাবে বক্ষিত এক বাণ্ডিল পুবাতন পুথি পবিষদে দান কবিযাছেন। এগুলি হইতে নিম্নলিখিত পুথিগুলিব কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ উদ্ধাব কবা হইযাছে :

(১) চৈতন্য-ভাগবত—বৃন্দাবন দাস (২ খানি)

(২) চৈতন্য-চবিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিবাজ

(৩) চৈতন্য-লীলামৃত—মুকুন্দ দাস

(৪) গোবিন্দ-লীলামৃত

(৫) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচৈতন্যঅদ্বৈতঞ্চ

(৬) তত্ত্বশিক্ষা

(৭) কালিকামঙ্গল—ভারতচন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গ পাব্‌লিক্ সার্ভিস কমিশনেব অন্যতম সদস্য অধ্যক্ষ শ্রীঅমিযকুমাব মজুমদাব দেবনাগবী অক্ষবে হিন্দুস্থানী ভাষায লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-বিষযক একখানি সুবৃহৎ পুথি পবিষদে প্রদান কবিযাছেন। পুথিখানি বাজস্থান হইতে সংগৃহীত।

পূর্ব বেলেব উচ্চপদস্থ কর্মচাবী শ্রীশিশিবকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায তাঁহাদেব গৃহে বক্ষিত, একত্রে বাঁধা কয়েকখানি খণ্ডিত সংস্কৃত পুথি পবিষদে প্রদান কবিযাছেন, ইহাদেব মধ্যে নিম্নলিখিত পুথি দুইটি উদ্ধাব কবা হইযাছে ঃ

১। চণ্ডীমহিমা

২। সাহিত্যদর্পণ।

২২/৩ ঝামাপুকুব লেন, কলিকাতা নিবাসী শ্রীমধুসূদন চন্দ্র পবিষদে কযেকখানি পুথি দান কবিযাছেন। ইহাদেব মধ্যে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'ব পুথিটি উল্লেখযোগ্য। এই পুথিব দুইটি পাতায় চাবিটি চিত্র প্রাচীন চিত্রশিল্পেব অপূর্ব নিদর্শন বলিযা গণ্য কবা যায়॥

চিত্রশালা

বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব চিত্রশালা বঙ্গসংস্কৃতিব বহু অমূল্য নিদর্শন দীর্ঘদিন ধবিযা বক্ষা কবিতেছে। নানা প্রাচীন মুদ্রা, শিল্পদ্রব্যাদি, অসংখ্য প্রত্নবস্তু এবং ববেণ্য মনীষিবৃন্দেব প্রতিকৃতিব সংগ্রহে এই চিত্রশালা গৌড-বঙ্গেব গৌববেব সামগ্রী। বর্তমানে পবিষৎ মন্দিবে সংবক্ষিত প্রতিকৃতিব সংখ্যা ২০৯। আবক্ষ প্রতিমূর্তির সংখ্যা ১৩।

বর্তমান বৎসবে অনেকগুলি চিত্র প্রযোজন অনুযাযী যথাযোগ্য সংস্কাব কবা হইযাছে, তবে এখনও বহু চিত্র অর্থাভাবে আমরা সংস্কাব কবিতে পাবি নাই।

বর্তমান বৎসবে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি যথাযোগ্য মর্য্যাদায অনুষ্ঠান-সহকাবে পবিষৎ মন্দিবে নিম্নলিখিত দিবসে প্রতিষ্ঠা কবা হইযাছে ঃ

১। কবি অতুলপ্রসাদ সেন—৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০
[কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রদত্ত।]

২। পণ্ডিত বসন্তবঞ্জন বায বিদ্বদ্বল্লভ—১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০
[পবিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমাব কর্তৃক সংগৃহীত চিত্র হইতে প্রস্তুত]

৩। ঐতিহাসিক বমাপ্রসাদ চন্দ—১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০
[শ্রীরণজিৎ প্রসাদ চন্দ কর্তৃক প্রদত্ত।]

৪। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস—১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১

[কবিব পুত্র শ্রীহেমবঞ্জন দাস কর্তৃক প্রদত্ত।]

৫। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১

[পবিষদেব ব্যযে শিল্পী শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায কর্তৃক প্রস্তুত তৈলচিত্র—কবিব স্বাক্ষবিত ছবি হইতে প্রস্তুত।]

৬। কবি মোহিতলাল মজুমদাব—১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১

[কবিব স্বাক্ষবিত ফোটোগ্রাফ হইতে পবিষদেব ব্যযে শিল্পী শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রস্তুত তৈলচিত্র।]

উপবিউক্ত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠাব সমযে এবং বাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব স্মবণোৎসবে, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই মনীষিগণেব চিঠিপত্র, প্রকাশিত গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদিব প্রদর্শনীব ব্যবস্থা কবা হইযাছিল এবং প্রত্যেকটি প্রদর্শনী এক সপ্তাহ কাল জনসাধাবণেব জন্য খোলা বাখা হইযাছিল। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিব সমাগমে প্রত্যেকটি প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইযাছিল।

বামেন্দ্রসুন্দবকে লিখিত ও বামেন্দ্রসুন্দবেব লিখিত অনেকগুলি মূল্যবান্ পত্র, বামেন্দ্রসুন্দব-বচিত গণিতগ্রন্থেব একটি পাণ্ডুলিপি ও বামেন্দ্রসুন্দব সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজ-পত্র বামেন্দ্রসুন্দবেব প্রদৌহিত্র শ্রীঅমিতাভ বায ও শ্রীসমিতাভ বায পবিষদ্ মন্দিবে অর্পণ কবিযাছেন। তাঁহাদেব পাবিবাবিক সংগ্রহে ঐ কাগজপত্রগুলিব মাইক্রোফিল্ম কবাইযা লইবাব জন্য পবিষদ্ সম্প্রতি ঐ কাগজপত্রগুলি সাময়িকভাবে তাঁহাদেব দিযাছেন।

মিনার্ভা থিযেটাবে অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায-লিখিত "বাঙ্গালী" নাটকেব কবি মোহিতলাল মজুমদাব-কৃত ইংবেজী অনুবাদেব পাণ্ডুলিপি পবিষদেব চিত্রশালায বর্তমান বর্ষে সংগৃহীত হইযাছে।

এতদ্ব্যতীত শিল্পী যামিনী বাযেব অঙ্কিত অগ্রজ বসন্তবঞ্জন বায বিদ্বদ্বল্লভেব পুবাতন একখানি দুর্লভ তৈলচিত্র, বসন্তবঞ্জনেব সহিত বঙ্গসাহিত্যসেবী সুধীবৃন্দেব একখানি ফোটোগ্রাফ, বসন্তবঞ্জনেব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, বসন্তবঞ্জনেব স্বহস্তে সংশোধিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থেব কযেকটি সংস্কবণ ও অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্রাদি বর্তমান বর্ষে পবিষদেব চিত্রশালায সংগৃহীত হইযাছে। বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকেব স্বহস্তলিখিত কাগজপত্র ও চিঠিপত্র বিভিন্ন ব্যক্তিব আনুকূল্যে আমবা বর্তমান বর্ষে সংগ্রহ কবিযাছি, তাঁহাদেব সকলকেই সহাযতাব জন্য সাধুবাদ জানাই॥

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগাবেব কার্য্য যথাবীতি পবিচালিত হইযাছে। এ বৎসব গ্রন্থশালা মোট ২৬৮ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৯৫০৩ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৫·৪৫

জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লেন-দেন বিভাগে ২৬৮ দিন কাজ হয় এবং ৪৪৭৩ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬'৬৯ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষেও মোট ২৬৮ দিন কাজ হয় এবং ৫০৩০ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৮'৭৬ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষ ও লেন-দেন বিভাগে সর্ব্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৫ ও ৪২ জন।

এ বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৯০৪৩ খানি পুস্তকের (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৭১'০৫ খানি) আদান-প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেন পত্রকের সাহায্যে ৭০৩১ (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬'২৩) ও পাঠকক্ষে ১২০১২ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪৪'৮২ খানি) পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যা পরিশিষ্ট 'গ'-এ দেওয়া হইল।

১৩৮০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত (ইন্‌ডেক্সড্) পুস্তক তালিকা পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ দেওয়া হইল।

গ্রন্থশালার পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থা-ও আলোচ্য বৎসরে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। ধূপন-প্রকোষ্ঠে (Fumigation Chamber-এ) এ বৎসর ৮৪ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছে। অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রন্থশালায় পুস্তক ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের বিভিন্ন পত্র, পাণ্ডুলিপি, জন্মপত্রিকা এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র ধূপন-প্রকোষ্ঠে পরিশোধিত হইয়াছে। ইহার মোট সংখ্যা ৫৪৩। আলোচ্য বৎসরে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের নিকট হইতে পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ৯,৭৫০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই দানের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

১৩৮০ বঙ্গাব্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ৫৭৯ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের আনুমানিক মূল্য ২৭৯৯'৬০ টাকা। যাঁহারা উপহার দানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি॥

স্মারক-গ্রন্থ

৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্মারক-গ্রন্থ বর্তমান বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের ৭৫ বর্ষ-পূর্তি-উৎসব-উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি নির্বাচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। নানা বাধাবিঘ্নের জন্য এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশে বহু বিলম্ব হইয়াছে। বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি যে বহুদিনের অপেক্ষিত এই অসমাপ্ত কাজটুকু সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন ইহা তাঁহাদের পক্ষে আনন্দের কথা। যে সমস্ত বন্ধু ও সহকর্মী এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যাঁহারা এই,

গ্রন্থের জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়া পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করি ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ পত্রিকার ৮০তম বর্ষের বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০ এবং শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮০ সংখ্যা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে। যথাসময়ে কাগজ না পাওয়ায় অপর দুইটি সংখ্যার প্রকাশ বিলম্বিত হইয়াছে। কাগজের দুর্ভিক্ষ ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের জন্য মুদ্রণসঙ্কট সত্ত্বেও এই দুর্দিনে পরিষদ্ গবেষণামূলক গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ যথাসাধ্য করিয়া আসিতেছেন। আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, আচার্য্য শ্রীসুকুমার সেন, আচার্য্য শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, 'বনফুল', শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তাশীল লেখকের প্রবন্ধ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য প্রেসে দেওয়া হইয়াছে, মুদ্রণ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাগজের অভাবে বন্ধ হইয়া আছে। যাহাতে এক পক্ষ কালের মধ্যে এই সকল মূল্যবান প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি ॥

পরিষদ্ বাঙ্গালা অভিধান

এক বৎসর পূর্বে, পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠাদিবসে, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক অভিধান রচনার সঙ্কল্প পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছে। 'আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি' ও 'রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি'র সাহায্যে আমরা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি এবং এ জন্য তিন জন বৃত্তিভোগী গবেষক পরিষদের সহায়তা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন গবেষক বিনা পারিশ্রমিকে এই অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। ইঁহাদের সকলকেই পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুখের বিষয়, বহু বঙ্গভাষানুরাগী এই অভিধানের কাজে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া পরিষদে পত্র লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বা অগ্রিম মূল্য দিয়া অভিধানের গ্রাহক হইতে চাহিয়াছেন। বঙ্গভাষানুরাগী পাঠকগণ 'পরিষদ্ বাঙ্গালা অভিধান' সম্বন্ধে এইরূপ আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করায় আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।

পরিষৎ পরিকল্পিত বঙ্গভাষার এই পূর্ণাঙ্গ অভিধান সম্বন্ধে দুই একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় সদস্যগণের নিকট নিবেদন করা কর্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী বিকাশে—প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত যাবতীয় সাহিত্যিক ও মৌখিক শব্দের সংকলন এই অভিধানে করা হইবে। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে, ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সাহিত্যিক প্রয়োগ সমন্বিত, সাধু ও চলিত ভাষায় এবং মৌখিক ও আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত বাঙ্গালা শব্দের মহাকোষ প্রণয়নে বঙ্গের সুধীসমাজের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষার বৃহত্তম প্রামাণ্য অভিধান Oxford English Dictionary প্রণয়নে ইংরেজ জাতির সমস্ত পণ্ডিত সক্রিয় সাহায্য

করিয়াছেন, এক একজন সুধী ব্যক্তি, এক বা একাধিক লেখকের সমগ্র রচনা সযত্নে পাঠ করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দ,—তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতিসহ সংকলন করিয়া প্রেরণ করিতেন। সেই সযত্ন-সংকলিত শব্দাবলীর ও শব্দ-প্রয়োগের নিদর্শনগুলি অভিধান-সংকলনের প্রাথমিক উপকরণ রূপে গৃহীতহইত। এইভাবে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশী সাহিত্যিক-প্রয়োগের উদ্ধৃতি সুধী পাঠকগণ ইংরেজী ভাষার অভিধান প্রস্তুতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত সম্পূর্ণ Oxford English Dictionary-র মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬,৫৭০; খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে প্রকাশ-কাল পর্য্যন্ত ধৃত শব্দসংখ্যা ৪১৪, ৮২৫; প্রত্যেকটি শব্দের পদ, অর্থ, শ্রেণী, ব্যুৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগ—প্রতি শতাব্দী হইতে অন্ততঃ একটি উদ্ধৃতি সহ প্রদর্শিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও সেই পদ্ধতি ধরিয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রয়োগের উদ্ধৃতি পরীক্ষিত হইয়া নিরুক্তি ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত হইতেছে। এই পদ্ধতিতে বঙ্গভাষার এই মহাকোষ সম্পূর্ণ করিতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত দীর্ঘদিন কাজ করিতে হইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে A New English Dictionary on Historical Principles (পরবর্তী-কালে Oxford English Dictionary নামে অভিহিত) পরিকল্পনা হইতে প্রকাশন সম্পূর্ণ করা পর্য্যন্ত ইংরেজ জাতির ৭৫ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে Philological Society ফিললজিকাল সোসাইটির নিযুক্ত এক কমিটি এই কাজে হাত দেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে F. J. Furnivall এফ্. জে. ফার্নিভাল ও Herbert Coleridge হার্বার্ট কোল্‌রিজ্ অভিধান প্রণয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিললজিকাল সোসাইটি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের মধ্যে চুক্তির পর ক্লারেণ্ডন প্রেস এই অভিধান সংকলনের ও প্রকাশের ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হন, James A. H. Murray জেম্‌স্ এ, এইচ, মারে সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষার এই বৃহৎ প্রামাণ্য সুবৃহৎ অভিধানের সঙ্কলন কার্য্য সমাপ্ত হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিধানের শেষ খণ্ড, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আরব্ধ বঙ্গভাষার পূর্ণাঙ্গ, সর্বাত্মক অভিধান বা মহাকোষ সম্পূর্ণ করার জন্য বহু পণ্ডিতের ও বঙ্গভাষানুরাগী সমাজের দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, নিরলস সাধনা ও নিঃস্বার্থ সেবার প্রয়োজন হইবে। বঙ্গবাণীর পূজায়, মাতৃভাষার অর্চনায় যিনি যতটুকু শ্রম ও সময় দান করিতে পারেন তাহাই অর্ঘ্যরূপে দান করিবার জন্য তাঁহাকে সশ্রদ্ধ আহ্বান জানাই॥

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১।
৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস॥

পরিশিষ্ট—'ক'

৮১ তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সভাপতি

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
শ্রীত্রিবিদনাথ রায়
শ্রীকুমারেশ ঘোষ
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহারাধন দত্ত
শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

সর্বশ্রী অধীর দে, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊষা সেন, কামিনীকুমার রায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার ঘোষ, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, মনসুর আলি সিদ্দিকী, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, সুধাকান্ত দে, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

শাখা-প্রতিনিধি

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, বিষ্ণুপুর শাখা
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, কৃষ্ণনগর শাখা
শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, নৈহাটি শাখা
শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর শাখা॥

পরিশিষ্ট—'খ'

৮১তম বর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

পৃষ্ঠপোষক ঃ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআন্টনি লান্সলট্ দিযাস্।

বান্ধব ঃ রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুব।

বিশিষ্ট সদস্য ঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায, শ্রীগোপীনাথ কবিবাজ, শ্রীবাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীদিলীপকুমাব বায়, শ্রীসুকুমাব সেন, শ্রীহবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস বায।

ন্যাসরক্ষক ঃ সর্বশ্রী সুকুমার সেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব, প্রমথনাথ বিশী, অশোককুমাব সবকাব, বিমলেন্দুনাবায়ণ বায়।

আজীবন সদস্য ঃ সর্বশ্রী সত্যচবণ লাহা, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, প্রশান্তকুমাব সিংহ, বঘুবীব সিংহ, মুবাবিমোহন মাইতি, ধীবেন্দ্রনাবায়ণ বায়, হিবণকুমাব বসু, সমীবেন্দ্রকুমাব সিংহবায, ইন্দুভূষণ বিদ্, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নীহাববঞ্জন বায়, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, সুধাকান্ত দে, বিভুভূষণ চৌধুবী, অজিত বসু, অনিলকুমাব বাযচৌধুবী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায, জগদীশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদাব, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধীবকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায, সুধীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায, কল্যাণী দেবী, কৃপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায, দেবীচবণ চট্টোপাধ্যায, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায, বঞ্জিত মুখোপাধ্যায, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীমকুমাব দত্ত, বীবেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কব সিংহ, ঊষা সেন, বঞ্জিতকুমাব্ দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ড, কমলকুমাব গুহ, বাসন্তী চৌধুবী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্কবদাস বন্দ্যোপাধ্যায, ক্ষীবোদকুমাব বসু, সুবেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সবকাব, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখোপাধ্যায, গিবীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমাব চট্টোপাধ্যায, হবিনাথ পাল, দেবকুমাব বসু, অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায, বাণী সেন, অশোককুমাব সেন, ভূপতি চৌধুবী, অববিন্দ বসু, অতীশচন্দ্র সিংহ, দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায, দিলীপকুমাব মিত্র, মধুসূদন মজুমদাব, দেবজ্যোতি দাস, অরুণকুমাব সেন, কালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত, বমেশচন্দ্র ঘোষ, মলযকুমাব চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সরকাব, অজিতকৃষ্ণ ঘোষ, সীতারাম সাকসেবিযা, চিত্তবঞ্জন সাহা, বামকুমাব ভুযাল্কা, মণীন্দ্রকুমাব কুণ্ড, নন্দলাল কানোবিযা, জনার্দনপ্রসাদ কানোবিযা বি. পি. খৈতান, পুরুষোত্তম দাস তুলসাযন ॥

পরিশিষ্ট—'গ'

পুস্তক আদান-প্রদান : ১৩৮০

বিষয়ানুযায়ী

১৩৮০	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	৫৭	১৩৬	১৯৩
ধর্ম (২০০)	১৮২	৪৭৭	৬৫৯
সমাজ-বিজ্ঞান (৩০০)	৫৯	২৭১	৩৩০
শিক্ষা (৩৭০)	২৬	৭৫	১০১
ভাষা (৪০০)	৮২	১৭৫	২৫৭
বিজ্ঞান (৫০০)	৮	৪৭	৫৫
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০)	১৩	৩৫	৪৮
শিল্পকলা (৭০০)	২৯	২০	৪৯
সঙ্গীত (৭৮০)	৬১	৩৭৫	৪৩৬
সাহিত্য (৮০০)	৫,৮৭০	৩,৮৯৫	৯,৭৬৫
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১২০	৯০	২১০
জীবনী (৯২০)	৩৭৭	৯১৪	১২৯১
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১১৫	৪১৩	৫২৮
সহায়ক গ্রন্থ (০০০)	৩২	৪৮৭	৫১৯
পত্র-পত্রিকা		৪,৬০২	৪,৬০২
	৭,০৩১	১২,০১২	১৯,০৪৩

ভাষানুযায়ী

১৩৮০	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৬,৯৬১	১০,৭৫২	১৭,৭১৩
ইংরাজী	৫১	১,০১৮	১,০৬৯
সংস্কৃত	১৯	২৪২	২১৬
হিন্দী	—	—	—
	৭,০৩১	১২,০১২	১৯,০৪৩

পরিশিষ্ট—'ঘ'

পঞ্জীকৃত পুস্তক (১৩৮০)

১৩৮০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারে পঞ্জীকৃত গ্রন্থ—৩১২১

পরিশিষ্ট—'ঙ'

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের

তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে দান

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি	২০০·০০	মনসুর আলি সিদ্দিকী	১০·০০
শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১·০০	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০·০০
শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা	১০০·০০	শ্রীপশুপতিনাথ লাহা	১০·০০
ভূযাল্‌কা জনকল্যাণ ট্রাস্ট	১০০·০০	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	১০·০০
শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী	৫১·০০	শ্রীমল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়	১০·০০
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু	৫১·০০	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সেন	৮·০০
শ্রীকানাইচন্দ্র পাল	৫১·০০	শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ	৭·৭১
শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ	৫০·০০	শ্রীমতী ঊষা সেন	৫·০০
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)	২৫·০০	শ্রীহরনাথ পাল	৫·০০
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত	২৫·০০	শ্রীহারাধন দত্ত	৫·০০
শ্রীমদনমোহন কুমার	২৫·০০	শ্রীশুভব্রত শেঠ	৪·০০
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২৫·০০	শ্রীআর. এম চক্রবর্তী	৩·০০
শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ	২০·০০	শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	২·০০
শ্রীকামিনীকুমার দে	১৬·১৪	শ্রীজয়ন্তকুমার চক্রবর্তী	২·০০
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	১৫·০০	শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ	২·০০
শ্রীভূবামল আগরবাল	১০·০০	শ্রীমতী চৈতালী রায়	২·০০
শ্রীঅসীমকুমার দত্ত	১০·০০	শ্রীমদনমোহন নাথ	২·০০
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	১০·০০	শ্রীশিশিরকুমার কর	১·০০
		মোট টাকা	৯৮৩·৮৫

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১।
৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস ॥

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আলোচনা সম্বলিত

নবম সংস্করণ

শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত।

বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মুখবন্ধ, বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল', বসন্তরঞ্জনের পুনর্লিখিত ভূমিকা, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর, বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনী, শব্দসূচী এবং বসন্তরঞ্জনের জীবন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাতপূর্ব ও নূতন তথ্য নবম সংস্করণে সংযোজিত ॥

বসন্তরঞ্জনের অপ্রকাশিতপূর্ব আলোকচিত্র, স্বহস্তলিখিত কড়চা ও পত্রাদির আলোক-চিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির বিভিন্ন ছাঁদের হস্তাক্ষরের ১২ খানি পূর্ণ পৃষ্ঠার হাফটোন ছবি। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪৫৬। মূল্য ত্রিশ টাকা ॥

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন ও কাব্য

শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত

কবি করুণানিধানের ব্যক্তিজীবন; দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, হেমচন্দ্র বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত করুণানিধানের সম্পর্ক; সতীশচন্দ্র বাগচি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জগদিন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত অন্তরঙ্গতা; কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা; কবির লিখিত ও কবিকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ; বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বা গ্রন্থে প্রকাশিত করুণানিধানের সমগ্র কবিতার বর্ণানুক্রমিক সূচী-সমন্বিত করুণানিধান ও সমসাময়িক সাহিত্যজগৎ সম্পর্কিত আকর-গ্রন্থ।

"এই বইখানি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় এবং যুগপৎ জীবনী-সাহিত্যের উন্নয়নে একখানি বহুমূল্যবান আকর-গ্রন্থ হইয়া থাকিবে।"

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবির স্বাক্ষরিত অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ৪ খানি দুর্লভ হাফটোন চিত্র। সুদৃশ্য বেক্সিনে বাঁধাই। ডবল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৬৮০। মূল্য ২৮·০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ২৪ জন প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবির বঙ্গভাষায় রচিত প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ, শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত সরোজবজ্রের দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষ ও অবহট্টে রচিত 'ডাকার্ণব'; নেপাল রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি প্রাচীন পুথির সংগ্রহ।

মূল্য পনের টাকা।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম আকরগ্রন্থ। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

আলালের ঘরের দুলাল

টেকচাঁদ ঠাকুর

(১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত)

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণের (দ্বিতীয় সংস্করণ)

পাঠ ও চিত্রাবলী পুনর্মুদ্রিত

(যন্ত্রস্থ)

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

(১৭৯৫-১৮৭৬)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা

পঞ্চম সংস্করণ

(যন্ত্রস্থ)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮০ আচার্য্য জগদীশ বসু রোড,
কলিকাতা-১৪ হইতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

একাশীতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ – চৈত্র

১৩৮১

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি

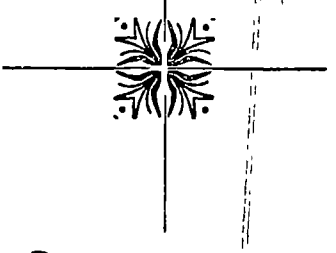

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

স্মা র ক গ্র ন্থ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান্ প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চির-স্মরণীয় মনীষী ও লেখকদের দুষ্প্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহের নির্বাচিত সংকলন ॥

বাঙ্গালার "ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত" হইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইযাছিল সেগুলির পরিচয় কৌতূহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন ॥

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, শোভন বাঁধাই, উৎকৃষ্ট কাগজ।

মূল্য পনের টাকা ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

একাশীতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ - চৈত্র

১৩৮১

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮১ বর্ষ ॥ দ্বিতীয়—চতুর্থ সংখ্যা
১৩৮১, শ্রাবণ—চৈত্র

সূচীপত্র

ক্রোড়পত্র
পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিব পুনরুদ্ধাব,
পরিষৎ মন্দিবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বিষ্ণু
পাল-রীতিব ধাতুমূর্তি, গৌববঙ্গ (মধ্যযুগেব বাঙ্গলাদেশ)
খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক—— শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব

Reinstallation of the lost
Vishnu Murti at the Bangiya
Sahitya Parisad Museum—Governor Anthony Lancelot Dias

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা
সাগরদীঘি হইতে প্রাপ্ত গৌড-বঙ্গেব
খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকেব বিষ্ণুমূর্তি
অপহবণ, পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা শ্রীমদনমোহন কুমাব

LETTER
Museum of Fine Arts
Boston Massachusetts— Jan Fontein, Curator
(Facsimile reproduction)

AGREEMENT
Museum of Fine Arts
Boston Massachusetts
(Agreement between Sri Madan Mohan Coomer, Secretary Bangiya Sahitya Parisad and Mr Merrill C Rueppel, Director Museum of Fine Arts, Boston Massachusetts)
(Facsimile reproduction)

পৃষ্ঠা

বিষ্ণুমূর্তি পুণঃ প্রতিষ্ঠা উৎসবের
আলোক চিত্র ৪ খানি।
হাড়মাসড়ায আবিষ্কৃত মূর্তিব আলোক চিত্র।
মাননীয় রাজ্যপালেব ভাষণ ১
পবিষৎ সভাপতিব ভাষণ— শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫
অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ-
প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদন— শ্রীমদনমোহন কুমার ৮
সুহৃদ্ববব বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ২১
রাখালদাস স্মৃতি— শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায ৩৫
বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকাব ৪৬
বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
লালন ফকির— শ্রীহিবণ্ময বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯
লালন-চবিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য— মুহম্মদ আবু তালিব ৬৫
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়— শ্রীহাবাধন দত্ত ৮৭
হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রচীন মূর্তি— শ্রীমদনমোহন কমাব ৯৬

॥ বিষ্ণু ॥

পাল-রীতির ধাতুমূর্তি
গৌড়বঙ্গ (মধ্যযুগের বাঙ্গালা দেশ)
খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘী গ্রামে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত এই মূর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা হইতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অপহৃত হইয়া আমেরিকার বস্টন নগরে নীত হয়,

এবং পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের সবিশেষ চেষ্টায় ও প্রযত্নে, বস্টন সুকুমার-শিল্প-সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহ ও তৎপরতায় এই মূর্তি পরিষদের নিকট প্রত্যর্পিত ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস কর্তৃক পরিষৎ মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(২১ মাঘ ১৩৮১, ১২ ফেব্রুআরি ১৯৭৫, বুধবার) ॥

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
প্রাক্তন সভাপতি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

V I S H N U

BRONZE IMAGE, PALA STYLE GAUDA-VANGA (MEDIEVAL BENGAL), ELEVENTH CENTURY CHRISTIAN ERA.

This image was discovered in the village of Sagardighi in Murshidabad District in 1909, and was stolen from the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad (where it was gifted) on 14th January 1965, and found a place in the Museum of Fine Arts, Boston, U S A. ,

And then through the exertions and efforts of Prof Madan Mohan Coomer, Hony Secretary of the Parisad and the courtsey of the authorities of the Museum in Boston, and the prompt and active interest of Srimati Indira Gandhi, Prime Minister of India,

It was returned to the Parisad and reinstalled by Sri Anthony Lancelot Dias, Governor of West Bengal, on Wednesday 12th February, 1975 (29th Magh, 1381)

Ramesh Chandra Majumdar
Former President
Bangiya Sahitya Parisad.

Suniti Kumar Chatterji
President
Bangiya Sahitya Parisad

GOVERNOR OF WEST BENGAL

Reinstallation of the Lost Vishnu Murti

At the Bangiya Sahitya Parisad Museum

In Calcutta, on February 12, 1975

Speech by

Governor Anthony Lancelot Dias

Dr Suniti Kumar Chatterji, Dr Mazumdar, Professor Coomer, distinguished members of the Bangiya Sahitya Parisad, and friends

I feel greatly privileged to have been invited here this evening, to participate in this little but very significant ceremony of reinstalling the eleventh century bronze image of Vishnu, which originally was in this museum, but was then purloined, sent across the seas, and finally recovered

This occasion is therefore of special significance It is significanct because a priceless treasure of great religious and sentimental value has been recovered and restored to the museum It is also significant because it is the home-coming of a much revered deity I have no doubt that all the votaries of this hallowed temple of learning must consider this an occasion of great rejoicing

Professor Coomer has, a little while ago, given you a full account of how this and two other images were lost, how one was recovered earlier and the interesting chain of events leading to the recovery of the second bronze image which I have the privilege and the honour of reinstalling in this museum Professor Coomer's account is also set out in fuller detail in the little booklet which has been published today by the Parisad

This is a suitable occasion, in the first place, to pay a tribute, publicly to Professor Coomer for the painstaking research that he made and for the persistence with which he followed up his original findings, which resulted, ultimately, in the recovery of this priceless treasure I think that the members of this Parisad—in fact, the public of this country——owe a debt of gratitude to him for his efforts in recovering this priceless treasure.

I would also like to take this opportunity of paying a public tribute to the Boston Museum authorities, but for whose cooperation, and gracious gesture, we would never have been able to recover this priceless treasure In particular, we are thankful to the Curator of the Boston Museum of Fine Arts, Dr Fontein, and the Director Dr Ruepell. Photostats of their letters have been included in the brochure published by the Parisad We are all deeply grateful to these authorities of the Boston Museum of Fine Arts for having enabled us to recover this bronze image

As you are already aware there were three images One was recovered earlier, one has now been recovered; and there is a third image that is still nestling somewhere. I do not know if Professor Coomer has done any research, or has stretched out his tentacles, or set up his antennae to locate this third image It must be somewhere, either at home or abroad. I would like to take this opportunity to appeal to the person who presently possesses that image to do the right thing and restore it to this museum. I am sure that any of you who may have a clue as to where that image may be will pass that information to the Parisad authorities, so that it can be followed up and ultimately lead to the recovery of the third image

This incident of the loss and recovery of this image highlights the fact that the clandestine trade in precious art objects still continues to a considerable extent. A number of antiques and other art objects are smuggled out of the country in one form or another. Hardly a month passes

without one reading about the theft of some object from a temple, or museum.

I happen to be the Chairman of two museums here—the Indian Museum and the Victoria Memorial Museum. We have lost by theft or pilferage certain articles from these museums We often read of the auction of some precious object from India in the auction rooms of Christie's, or Sotheby's, but are quite helpless to do anything about their disposal.

I am glad that public opinion is gradually being created in this connection and that the Government has taken the initiative in recovering several objects which have crossed the seas In fact, I feel that this evil can only stop if there is increased public vigilance, and a strong public opinion which ensures, in the first place, that there is not any internal trafficking in these precious art objects, that information is quickly passed on to the authorities when such illicit traffic takes place. Even when there is a legitimate passing of an object from one private party to another, I feel that it is necessary that such transfers should be brought to the notice of the concerned Governmental agencies—such as museums—so that they may have the first option of refusal Museums are provided with a certain quantum of funds to purchase antiques and art objects They should therefore have the first opportunity of being able to make such purchases

Public vigilance is also vital to ensure that these art objects are not surreptitiously passed on to foreigners Not long ago, I saw an advertisement inserted by a foreigner in the local papers to the effect that he was interested in the purchase of antiques and art objects. This is where public vigilance and public opinion can help in ensuring that our precious heritage is kept within the country.

I suggest that the Central Government and the public spirited citizens of this country should take the initiative in

creating a National Trust with adequate funds to acquire antiques, objects d' art, historical records, archives etc. from private collectors and display them in public museums. Such National Trusts have been created by various countries —Russia, America, England and in various European countries.

When I was in Moscow about two months ago, I visited some of the museums and saw some of the beautiful treasures of the old regime which were displayed I was shown an edict of Lenin which was issued in 1917 which enjoined the people not to indulge in any vandalism or to deface any building , not to purloin any art object or any national treasure, but to give it to the State which would arrange for its display in a public museum

I hope that the Central Government now sees the urgency of enacting legislation to ensure that smuggling is brought under stricter control and that Government is kept informed when antiques, art objects etc are sold to private collectors. There is also need for State intervention in other ways There is need for funds being placed at the disposal of both public and private institutions which have collections of precious objects, rare manuscripts, or historical records, for the purpose of ensuring that they are in safe custody and are properly preserved, and that they are properly inventoried, catalogued and photographed There should also be periodical physical verification of objects especially in public museums and institutions

Apart from the need for preservation, an uptodate catalogue with proper photographs of each object is equally essential for scholars and researchers Without such catalogue it is difficult for scholars and researchers, to know the precious heritage that sometimes lies hidden in so many museums and libraries. We also ought to pay better attention to the preservation of old manuscripts and historical records In Tamil Nadu recently some old historical records

of the East India Company, or even prior to that period were destroyed This may be happening in other States as well I think that it is high time that there should be some guidelines from Government as to the type of records that should be preserved

I happen to be associated with some museums, libraries and educational institutions. On the basis of my experience I feel the time has come when there ought to have a National Commission to make a deep study of the functioning of our museums and to examine how effective they are in the matter of the custody, preservation, cataloguing, and physical verification. I would also recommend that Government at the Central and State levels should extend its patronage and support to private institutions like the Bangiya Sahitya Parisad, so that they are provided with adequate resources for the proper maintenance and management of the precious collections that they possess

I do not wish to take more of your time this evening I would like to say once again how privileged I feel to have been asked to participate in this ceremony of reinstalling the bronze image of Vishnu. I hope that, with its reinstallation, the priceless heritage of the Parisad will grow richer and richer.

●

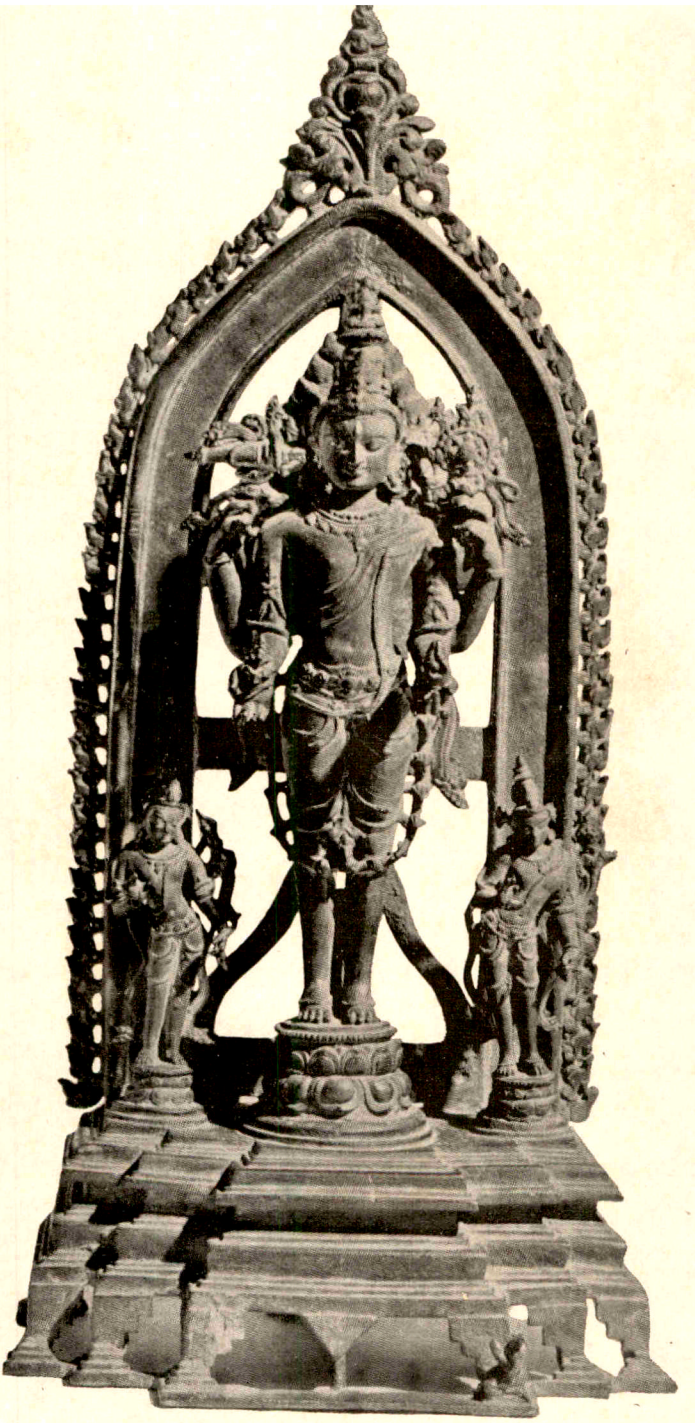

বিষ্ণু
খ্রীঃ একাদশ শতক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

VISHNU
11th Century A. D.
Bangiya Sahitya Parisad

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা

সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত

গৌড়-বঙ্গের খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের

বিষ্ণুমূর্ত্তি অপহরণ, পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ॥

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের সহিত বঙ্গ-সংস্কৃতির বিস্মৃত, অবলুপ্ত পরিচয় পুনরুদ্ধারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ব্রতী হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বাঙ্গালী জাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন পুথিপত্রের ও পুরাতন মুদ্রিত পুস্তকের সহিত বহু-প্রত্নবস্তু, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, শিল্পকর্ম, দলিলপত্র ও বঙ্গের সাহিত্যিক ও মহাপুরুষগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও হস্তাক্ষর, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি দান করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে বা অভ্যুদয়-পর্বে কোনও মিউজিয়ম স্থাপনের পরিকল্পনা না থাকিলেও ধীরে ধীরে—পরিষদের ভাড়াটিয়া বাড়িতে ও পরে নিজস্ব ভবনে—বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত ও প্রদত্ত প্রত্ন-বস্তুর সম্ভারে একটি সংগ্রহশালা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতে থাকে।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার (Indian National Congressএর) অধিবেশনে ভারতীয় শিল্প- ও কৃষি-প্রদর্শনীতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পরিষদে সংগৃহীত দুর্লভ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীন পুস্তকাদি, তাম্রশাসন, খোদিত লিপি, বঙ্গ-ইতিহাসের স্মরণীয় জনপদ, রাজধানী, প্রাচীন মন্দির, ধ্বংসোন্মুখ

প্রাসাদ, অট্টালিকা ও পুরাতন মৃন্ময় ও ধাতু-মূর্তির ফোটোগ্রাফ, প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন এবং বঙ্গের সাহিত্যিক ও মনীষীগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি প্রেরণ করেন। পরিষদের প্রেরিত এই প্রত্নবস্তুগুলি ৬ পৌষ হইতে ১৪ ফাল্গুন ১৩১৩ (২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৬—২৬শে ফেব্রুআরি ১৯০৭) বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বহু দর্শকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। পরিষদের বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ এই সব প্রত্নবস্তু ও নিদর্শন ঐ প্রদর্শনীতে দর্শকগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন এবং জনসাধারণের চিত্তে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রত্নবস্তুর নিদর্শন সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ায় তাঁহাদের আনুকূল্যে পরিষৎ মন্দিরে এই শ্রেণীর দ্রব্যসম্ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, অযত্নরক্ষিত, ধ্বংসোন্মুখ বা লুপ্তপ্রায় শিল্পকলার নিদর্শন ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষণের প্রস্তাব পরিষৎ-হিতৈষী ও দেশপ্রেমী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পরিষদ্-কর্তৃপক্ষের নিকটে আসে।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজার রাজবাটীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পরিষৎ সম্পাদক পুণ্যশ্লোক রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী পরিষৎ মন্দিরে 'সারস্বত ভবন' স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সেখানে এইরূপ দুর্লভ ও প্রাচীন সামগ্রী সংরক্ষণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। পরিষদ্ তখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের স্বল্পপরিসর ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকায় সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। পরিষদের একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে আবদ্ধ সংগ্রহশালায় এই সব দুর্লভ সামগ্রী রক্ষিত হয়। পরিষদের সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ও প্রযত্নে অনেকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তি সংগৃহীত হয়।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে পরিষদ্ নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হইলে পরিষদের সদস্য ও পরিষদ্‌প্রেমীগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত তাম্রশাসন,

প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, ধাতুমূর্তি ও প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি অমূল্য সম্ভারে এই সংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সরকারী সাহায্য ছাড়াই বঙ্গবাসীর দানে পরিষৎ মন্দিরে বাঙ্গালীর জাতীয় সংগ্রহশালা গড়িয়া উঠে।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রীঃ) রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছিলেন, "if the present rate of growth be maintained, it will grow into a National Museum of our own, which we may look upon with pride."

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল ১৯১২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের Museum বা চিত্রশালা একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয় এবং চিত্রশালা পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য অন্যতম অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষরূপে 'চিত্রশালাধ্যক্ষ' পদের সৃষ্টি হয় এবং নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের প্রথম চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। পরে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,[১] প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পকলাবিৎ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পুরাতত্ত্ববিৎ অজিত ঘোষ, শিল্প-রসিক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুধী ব্যক্তি পরিষদের চিত্র-শালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বতন্ত্র বিভাগরূপে 'চিত্রশালা' (Museum) প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ১৩১৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের তিনটি দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি সংগৃহীত

১ অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশালাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বনওয়ারিলাল চৌধুরী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। [কা, নি, স, ১৬ আশ্বিন ১৩২৪, ২ অক্টোবর ১৯১৭]

হয়। পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক (১৩১১-১৮) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই মূর্তি তিনটি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী-নিবাসী কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। কিশোরীমোহন পরিষদের সদস্য ছিলেন, ১৩১২ বঙ্গাব্দে তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। তিনি এই মূর্তি তিনটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন, তিনটি মূর্তিই মুর্শিদাবাদ, জেলার কান্দী মহকুমার সাগরদীঘীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে ২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার (১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৯) অপরাহ্ণ ৫টায় এই মূর্তি তিনটি পরিষৎ সদস্যগণের নিকট প্রদর্শিত হয়। সভায় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দুর্গা-নারায়ণ সেনশাস্ত্রী, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ পশুপতিনাথ ঘোষ, ললিতচন্দ্র মিত্র, চারুচন্দ্র বসু, বাণীনাথ নন্দী, নরসিদন্‌জী, নরকৃষ্ণ ঘোষ, রামকমল সিংহ, সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সহঃ-সম্পাদক-ত্রয় হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যোমকেশ মুস্তফীসহ ৫৯-জন সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত এই দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি তিনটির সহিত আরও-কয়েকটি মূল্যবান্ প্রত্নবস্তু এই সভায় প্রদর্শিত হয়। পরিষদের পুরাতন কার্য্যবিবরণের নথি হইতে ঐ অধিবেশনে মূল্যবান্ প্রত্নবস্তুসমূহ-প্রদর্শন-সংক্রান্ত বিবরণটি উদ্ধৃত হইল :

"৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কান্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য পরিষদের জন্য সংগৃহীত

তিনটি ধাতুমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। এই তিনটি মূর্ত্তিমধ্যে দুইটি মূর্ত্তি Indian Museum বা British Museumএ নাই। এই মূর্ত্তিগুলি সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সময়ের। এই মূর্ত্তিত্রয়ের একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তির মাঝামাঝি কোন মূর্ত্তি এবং তৃতীয় মূর্ত্তিটি কাহার তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। তৎপরে রাখালবাবু মিসেস্ জোন্স (Mrs. Jones) কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রস্তরমূর্ত্তি ও বুদ্ধগয়ায় তাঁহার নিজ সংগৃহীত কতকগুলি মৃন্ময় ছাঁচের প্রতিমা (Seal) প্রদর্শন করেন। গরির তীর্থযাত্রিগণ এইরূপ seal ব্যবহার করিত। অতঃপর পরিষদের পুথিসংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সম্রাট্ শাহ আলমের সময়ের তাম্রমুদ্রা ও অপর কতকগুলি মুদ্রা রাখালবাবু প্রদর্শন করেন। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক মহাশয়ের প্রেরিত একটি কামান শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়।

এই প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় জানান যে, রাখালবাবু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মুদ্রাগুলি তিনি নিজে উপহার প্রদান করিয়াছেন ও মিসেস জোন্স অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিহার অঞ্চল হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছেন। রাখালবাবু ও মিসেস জোন্সএর ধন্যবাদের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।"

এই সভায় সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পরিষৎ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাবিত "সারস্বত ভবন" স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে "রমেশচন্দ্র সারস্বত

ভবন" নামে প্রতিষ্ঠাপিত করার জন্য সমস্ত ভাবতবর্ষেব নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবেন। ববোদার সয়াজী বাও গায়কোবাড় এজন্য ৫০০০ টাকা দান কবেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১লা এপ্রিল ১৯১৫) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 'রমেশ-ভবন' নির্মাণেব জন্য পবিষদ্-ভবন সংলগ্ন ৭ কাঠা জমি দান কবেন। লর্ড কাবমাইকেল ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বমেশ-ভবনেব ভিত্তি স্থাপনা কবেন, পবিষদেব চিত্রশালাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিযর মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যাযেব পবিকল্পনা অনুযাযী ১৩২৮ বঙ্গাব্দে নির্মাণকার্য্য শুরু হয ও ১৩৩১ বঙ্গাব্দে নির্মাণ-কার্য্য শেষ হয। ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫ তাবিখে পবিষদেব নবগৃহ প্রবেশেব পব যে সকল প্রত্নবস্তু 'সাবস্বত ভবনে'ব জন্য ও পবিষদেব চিত্রশালাব জন্য সংগৃহীত হইযাছিল সেগুলি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে "বমেশ-ভবনে" সুবিন্যস্ত কবা হয় এবং সাগবদীঘী হইতে প্রাপ্ত এই দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি তিনটিও বমেশ-ভবনে স্থাপিত হয়।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রীঃ) •বাখালদাস এই মূর্ত্তি তিনটিব প্রথমটিকে বিষ্ণুমূর্তি, দ্বিতীযটিকে বোধিসত্ত্ব ও বিষ্ণুমূর্তিব মাঝামাঝি কোনও মূর্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত কবেন এবং তৃতীয মূর্তিটি কাহাব সে সম্বন্ধে সুনিশ্চয হন নাই। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রীঃ) পবিষৎ সম্পাদক বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত সহকাবী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায-বচিত "Descriptive List of Sculptures & Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad" গ্রন্থে বাখালদাস প্রথম মূর্তিটি ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, দ্বিতীয় মূর্তিটি ললিতক্ষেপ মুদ্রায় উপবিষ্ট বিষ্ণু সিদ্ধান্ত কবেন এবং তৃতীয মূর্তিটি—সপ্তনাগছত্র-শোভিত ষড়ভুজ-সমন্বিত—সম্ভবত কোনও বৌদ্ধ দেবতাব মূর্তি বলিয়া মনে কবিলেও উহাব বামদিকেব দুইটি হস্তে গদা ও শঙ্খ এবং তৃতীয় হস্তে দণ্ডোপবি গরুড-মূর্তি লক্ষ্য কবেন। বিষ্ণুমূর্তিব লক্ষণগুলি

এই তৃতীয় মূর্তিটিতে রাখালদাসই প্রথম উল্লেখ করেন। সাগর-দীঘীর এই তৃতীয় মূর্তিটির পিছনে উৎকীর্ণ লিপি রাখালদাস পাঠ করেন ঃ

"সুবাচক নন্নোদাসসুত
পন দানপতি ইদম্ দেযো ধর্মঃ।"

[সুবক্তা, নন্দদাসপুত্র, দাতা পন কর্তৃক ধর্মার্থে ইহা প্রদত্ত।]

রাখালদাসের ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ২১শে ফেব্রুআরি ১৯১১ উইলিয়ম রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আসিয়া এই মূর্তি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন ঃ

"I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures , and I think the day will come when full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things".

William Rothenstein
President, Society of India
February 21, 1911. Great Britain and Ireland

E. B. Havell ঈ. বি. হ্যাভেল, Percy Brown পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কে, কুমারস্বামী প্রমুখ শিল্পরসিকগণ এই অপূর্ব-সুন্দর মূর্তি তিনটির শিল্পকলা ও বৈশিষ্ট্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত এই তিনটি বিষ্ণু-মূর্তিই গৌড-বঙ্গের পাল-যুগের খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পরিষৎ প্রকাশিত "Handbook to the

Sculpture in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad" গ্রন্থে এই বিষ্ণুমূর্তি তিনটিব চিত্র (Plates XXIV, XXV, XXVI) প্রকাশ করেন ও ইহাদেব পবিচয প্রদান করেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী হইতে প্রকাশিত বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব "Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture" গ্রন্থে মূর্তিগুলিব আলোচনা ও চিত্র প্রকাশিত হয়।

এই অপূর্ব-সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ লণ্ডনে Royal Academy of Art বয়েল একাডেমি অফ্ আর্ট কর্তৃক আযোজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ হইতে প্রেবিত ও প্রদর্শিত হয এবং বিশ্ব-শিল্প-বসিকগণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত তিনটি মূর্তিব মধ্যে তৃতীয মূর্তিটি ষড়ভুজ হৃষীকেশ বিষ্ণুমূর্তিটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ (১লা মার্চ ১৯৫৭) বমেশ-ভবনেব নিম্নতলস্থ প্রদর্শনী-কক্ষ হইতে চুবি যায়। সাগবদীঘী হইতে প্রাপ্ত তিনটি বিষ্ণুমূর্তিব মধ্যে এইটিই ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, আয়তন ১´-১৯" ইঞ্চি। আষাঢ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (জুন ১৯৫৭) এই অপহৃত মূর্তিটি কলিকাতাব জনৈক বিশিষ্ট শিল্প-সংগ্রহকাবী ধনাঢ্য ব্যক্তিব নিকট হইতে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা মূল্যে পবিষদ্ ক্রয কবেন এবং পবিষৎ মন্দিবে পুনবায় আনয়ন কবেন।

কযেক বৎসব পরে ১৪ই জানুআবি ১৯৬৫, ৩০শে পৌষ ১৩৭১, বৃহস্পতিবাব, পৌষ-সংক্রান্তির মধ্যরাত্রে পবিষদ্ভবনেব দ্বিতলে চিত্রশালাব তালা ভাঙিয়া সাগবদীঘীর অপব দুইটি বিষ্ণুমূর্তি, উপরিলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয বিষ্ণুমূর্তি—দণ্ডাযমান ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তি (সাগরদীঘি বিষ্ণুমূর্তিব মধ্যে এইটিই ছিল উচ্চতম ২´—১৳˝) ও ললিতক্ষেপ মুদ্রায পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মে (মহাম্বুজপীঠে) উপবিষ্ট হৃষীকেশ বিষ্ণুমূর্ত্তি—চুবি হয। এই তৃতীয মূর্তিটিব পাদপীঠ এখনও

পবিষদেব চিত্রশালায আছে। পুলিস ও গোযেন্দা বিভাগে সংবাদ দেওয়া হয কিন্তু মূর্তি দুইটিব পুনরুদ্ধাব সম্ভব হয না।

Unesco ও Interpol-এ এই অপহবণ-সংক্রান্ত কোনও তথ্য অনুসন্ধান কবিযা পাওযা যায নাই।

১৯৭৪ সালেব জানুআবি-ফেব্রুআবি মাসে বর্তমান পবিষৎ সম্পাদক, পবিষৎ সভাপতি জাতীয অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাযেব অনুমতি লইয়া, পবিষদেব চিত্রশালায় বর্তমানে বক্ষিত এবং চিত্রশালা হইতে অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিব কযেকখানি আলোকচিত্র বিশ্বেব কযেকটি বিখ্যাত মিউজিযমে পাঠান এবং অনুরূপ বা সদৃশ কোনও বিষ্ণুমূর্তি সেখানে থাকিলে তাহাব বিবরণ জানাইবার অনুবোধ কবিযা পত্র লেখেন। আমেবিকাব বস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসেব কিউবেটব যান ফন্টেন (Jan Fontein) ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তাবিখেব পত্রে পবিষৎ সম্পাদককে জানান যে প্রেবিত আলোকচিত্রগুলিব মধ্যে একটি বিষ্ণুমূর্তিব অনুরূপ মূর্তি (ঈষৎ বিকৃত অবস্থায) বস্টন মিউজিযমে আছে এবং ঐ মূর্তি ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাবা ক্রয় করিয়াছেন। বস্টন মিউজিযমেব বার্ষিক বিবরণে ঐ বিষ্ণুমূর্তিব যে আলোকচিত্র প্রকাশিত হইযাছিল তাহা হইতে বুঝিতে পাবা যায যে উহা পবিষদেব চিত্রশালা হইতে ১৪ জানুআবি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অপহৃত সাগবদীঘীব উচ্চতম বিষ্ণুমূর্তি; বিক্রযেব পূর্বে মূর্তিব পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র প্রণত মূর্তি অপসাবিত হইযাছে। বস্টন মিউজিযমেব কিউবেটর তাঁহাব ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তাবিখেব পত্রে পবিষৎ সম্পাদককে লিখেন :

"the bronze had suffered minor damage before it reached this museum. The small kneeling figure at the base has disappeared, and the statue of one of the attendants has been detached from its base."

মূর্তিটি পরিষদ হইতে অপহবণের পব পাঁচ বৎসব ভারতে

লুকাইযা বাখা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতাব হাত ঘুবিয়া পবে উহা আমেবিকায নীত হয ও বস্টন মিউজিযম কর্তৃপক্ষেব নিকট ৫০ হাজার ডলাব (চাব লক্ষ টাকা) মূল্যে বিক্রীত হয। ১৯৩৩ খ্রীঃ দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযেব "Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture" গ্রন্থে প্রকাশিত ঐ মূর্তিব চিত্র (Plate LXVIIc) দেখিয়া বস্টন মিউজিযম কর্তৃপক্ষ উহা ক্রয কবিযাছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে মূর্তিটি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব সম্পত্তি তাহা উল্লেখ না থাকায বস্টন মিউজিযম কর্তৃপক্ষ পবিষদ্ হইতে মূর্তি অপহবণেব পুলিস-বিপোর্ট এবং পবিষদেব স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রমাণেব অন্যান্য দলিলপত্র প্রেবণেব অনুবোধ জানান। এতৎসংক্রান্ত পুলিস-বিপোর্ট অনুসন্ধান কবিযা পাওযা না গেলেও পবিষদেব ৬৫ বৎসবেব পুবাতন নথিপত্র এবং ২৫ বৎসব পূর্বেকাব সংবাদপত্রাদিব বিববণ ও আলোকচিত্রাদি হইতে পবিষদেব স্বত্ব-স্বামিত্বেব প্রমাণেব নিদর্শন সঙ্কলন কবিযা পবিষৎ সম্পাদক বস্টনে পাঠান। পবিষদেব স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পবিষদেব মূর্তি পবিষৎ মন্দিবে প্রত্যর্পণেব জন্য সম্পাদকেব অনুবোধে বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ অসাধাবণ সৌজন্য প্রদর্শন কবেন এবং সকল পক্ষেব স্বার্থ বক্ষা কবিযা একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনেব পব পবিষৎ সম্পাদকেব প্রস্তাব অনুযাযী ওয়াশিংটনে ভাবতীয় বাষ্ট্রদূতেব হস্তে উহা সমর্পণ কবিতে স্বীকৃত হন এবং পবিষৎ সম্পাদককে লেখেন :

"The museum regrets to find one of its finest Indian bronzes to have been stolen, but we trust its return will redress the situation."

বস্টন মিউজিযম ও বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র এই নিবন্ধের শেষে প্রকাশিত হইল।

চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইলে পবিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায ভাবতেব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধীকে এ বিষযে প্রযোজনীয সহায়তাব জন্য ১৩ই জুন ১৯৭৪ পত্র লেখেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন কবিযা তাঁহাব ২৪শে জুন ১৯৭৪ তাবিখেব পত্রে জানান যে ভাবতীয পববাষ্ট্রমন্ত্রকে ও আমেরিকায ভারতীয় বাষ্ট্রদূতেব দফ্‌তরে তিনি এ বিষযে নির্দেশ প্রেবণ কবিতেছেন এবং বস্টন মিউজিযমেব কিউবেটব Jan Fontein কে তিনি এ বিষযে ধন্যবাদ-জ্ঞাপক পত্র পাঠাইতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গেব মাননীয বাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লম্সলট দিযাস ১২ই জুলাই ১৯৭৪ বাজভবনে পবিষৎ সম্পাদকেব সহিত আলোচনা-কালে এতৎ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখিয়া প্রযোজনীয সাহায্যেব ব্যবস্থা কবেন।

বস্টন মিউজিযমেব কিউবেটব ওযাশিংটনে ভাবতীয দূতাবাসে একটি অনুষ্ঠানে ভাবতেব বাষ্ট্রদূত টি, এন, কাওলেব T. N. Kaul-এব হাতে বিষ্ণুমূর্তিটি সমর্পণ কবেন। ভাবতেব বাষ্ট্রদূত বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিযা বলেন :

"To art collectors this may be worth $ 50,000 ; to us it is priceless.

I hope this example will be followed by others and other countries."

যে শিল্প-বিক্রেতা মূর্তিটি বস্টন মিউজিযমে বিক্রয কবিযাছিলেন তিনি পবিষৎ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ কবিযা কিভাবে মূর্তি তাঁহাব হস্তগত হইযাছিল তাহা ব্যাখ্যা কবিবেন বলিযা বস্টন মিউজিযমেব কিউবেটব পবিষৎ সম্পাদককে লিখিযাছিলেন। ঐ শিল্প-বিক্রেতা অদ্যাবধি পবিষৎ সম্পাদকেব সহিত সাক্ষাৎ কবেন

নাই, তিনি বস্টন মিউজিযমেব কর্তৃপক্ষকে মূর্তিব মূল্য স্বরূপ ৫০ হাজাব ডলাব (৪ লক্ষ টাকা) প্রত্যর্পণ কবিয়াছেন।

ভাবতেব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধীব সহায়তায ভাবত সরকাবেব ব্যযে মূর্তিটি নিউ ইযর্ক হইতে বিমান যোগে দিল্লীতে আনীত হয এবং পবিষৎ সম্পাদকেব হস্তে উহা অর্পিত হইলে দিল্লী হইতে উহা বিমান-যোগে কলিকাতায আনীত হয। ভাবতবর্ষ হইতে অপহৃত, বিদেশে নীত ও বিক্রীত প্রাচীন মূর্তিব ভাবতে প্রত্যাবর্তনেব ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমবঙ্গেব মহামান্য বাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস পরিষদ্ ভবনে অদ্য ২৯শে মাঘ ১৩৮১, ১২ই ফেব্রুআবি ১৯৭৫, দশ বৎসব পূর্বেব অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবিতেছেন। বস্টন মিউজিযমেব কর্তৃপক্ষ যে অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন কবিয়া বিষ্ণুমূর্তিটি পবিষদে প্রত্যর্পণ কবিযাছেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী ও বাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদেব প্রতি যে আনুকূল্য প্রদর্শন কবিযাছেন ও তৎপবতার সহিত যে সহাযতা কবিযাছেন, সেজন্য বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ তথা সমগ্র দেশবাসী তাঁহাদেব নিকট চিবকৃতজ্ঞ ॥

শ্রীমদনমোহন কুমাব
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

USEUM OF FINE ARTS Boston Massachusetts 02115

MFA

y 22, 1974

M M. Coomer
norary Secretary
giya Sahitya Parisad
/1 Acharya Prafulla Chandra Road
cutta-6

ar Mr Coomer,

I was pleased to receive your letter of May 4. We have asked our nsel, Weld S. Henshaw, Choate, Hall & Stewart, 28 State Street, Boston, Massausetts 02109, to prepare a brief agreement covering the return of the object e main point of the agreement would be that we will rely completely on your structions regarding the return of the object to the Indian Embassy

If you could make arrangements to have your Embassy instruct us the return, this should expedite matters. With regard to the identity of the ler through whom we purchased this object, we certainly feel you have every ght to this information. We have, however, asked him to get in touch with you ctly as we believe him to be a man of fine reputation and integrity, and we confidence in his innocence in this matter It seems to us to be most fair give him a chance to explain to you the circumstances of his acquisition of Vishnu Bronze

You should be hearing from Mr Henshaw shortly regarding the return the object through your Embassy Thank you very much for your patience in this ter

ry truly yours,

Jan Fontein

ontein
tor

MUSEUM OF FINE ARTS

BOSTON · MASSACHUSETTS 02115

Office of the Direc

This agreement is made this 22nd day of May 1974, by and between the Bangiya Sahitya Parisad of Calcutta, India, (the "Parisad") and the Museum of Fine Arts of Boston, Massachusetts (the "Museum"). This agreement arises through the purchase in 1970 of a bronze image of Vishnu cast in Bengal in approximately the eleventh century. The Museum has recently discovered that this image is the property of the Parisad and was stolen from it in early 1965. This agreement is made to expedite and insure the safe and speedy return of the image to the Bangita Sahitya Parisad.

It is agreed that the Museum may accept all written directions from the Indian Embassy in Washington, D.C. with regard to return of the image and that compliance with these instructions shall operate as a full discharge and release to the Museum by the Parisad. The Museum shall pay all expenses related to the delivery of the object to the Embassy in Washington if such a delivery is requested.

In witness whereof the parties hereto set their hands and seals this 22nd day of May 1974.

BANGIYA SAHITYA PARISAD

By: Madan Mohan Coomer

Madan Mohan Coomer, Hony. Secretar

SEAL OF
MUSEUM OF FINE ARTS
BOSTON, MASS
FOUNDED A D 1870

MUSEUM OF FINE ARTS

By: Merrill C. Rueppel

Merrill C. Rueppel, Director

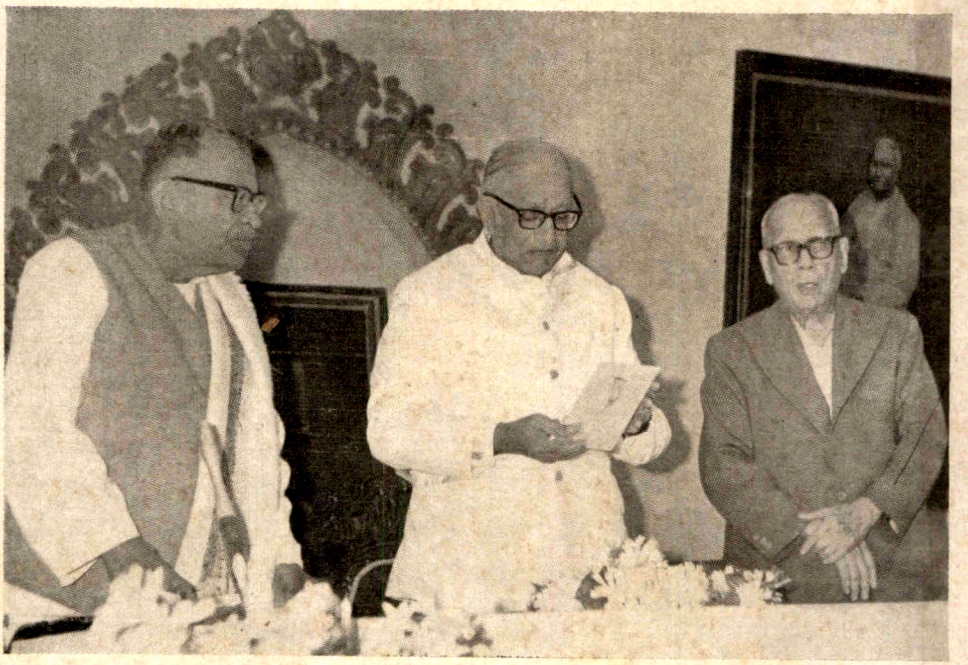

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরে ২৯ মাঘ ১৩৮১ বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লম্সলট দিয়াসের হস্তে পরিষৎ-সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত সীল-মোহরকরা খামে বিষ্ণুমূর্তির আধারের চাবি ও এতৎসংক্রান্ত দলিলপত্র মাননীয় রাজ্যপাল পরিদর্শন করিতেছেন, পার্শ্বে আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, পশ্চাৎপটে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ও পুণ্যশ্লোক রমেশচন্দ্র দত্তের তৈলচিত্র।

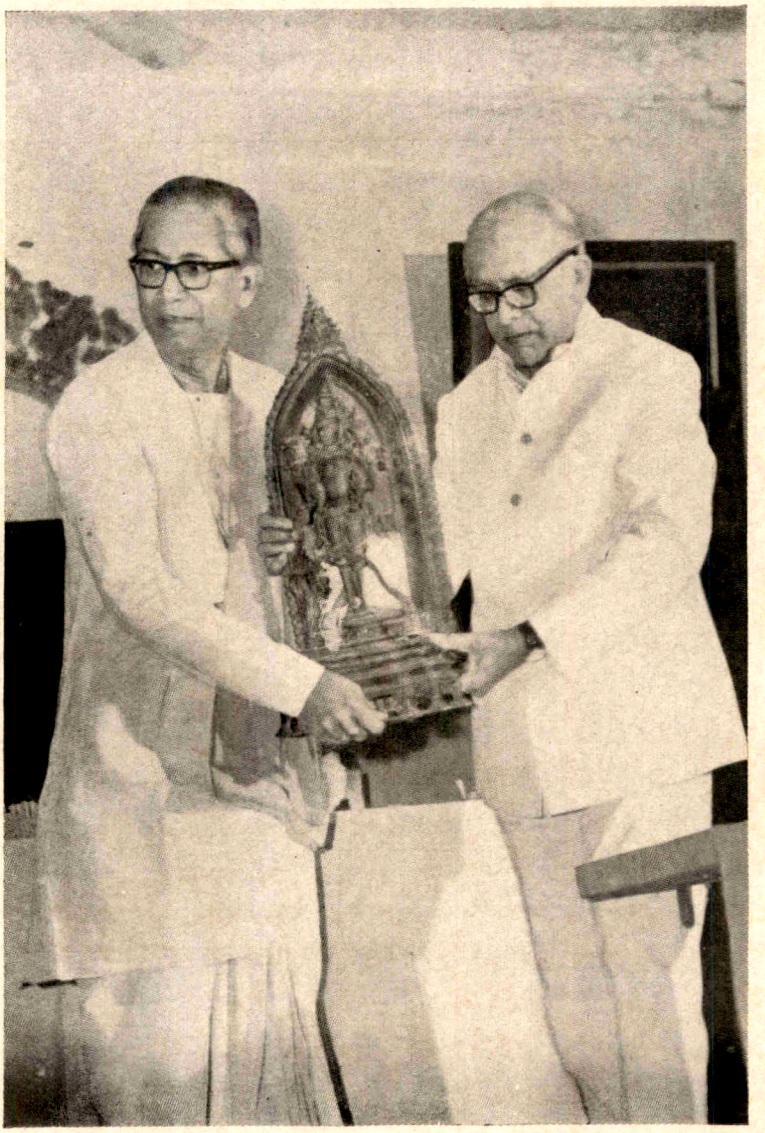

মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক বিষ্ণুমূর্তির সীলমোহরকরা আধার উন্মোচনের পর মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস ও পরিষৎসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার আধার হইতে বিষ্ণুমূর্তি উত্তোলন করিয়া সমবেত দর্শকগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতেছেন।

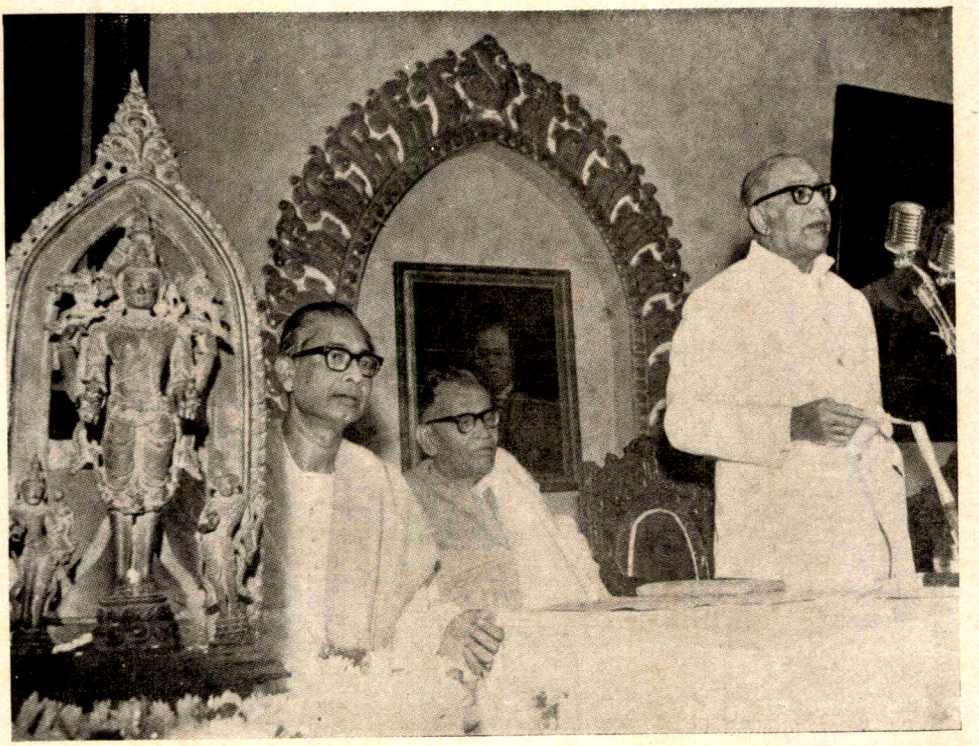

পরিষৎ মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস রমেশ-ভবনের সভাকক্ষে ভাষণ দিতেছেন। রাজ্যপালের পার্শ্বে পরিষৎ সভাপতি ও পরিষৎ সম্পাদক, শ্বেতপদ্মাসনে স্থাপিত বিষ্ণুমূর্তি, পশ্চাৎপটে পুণ্যশ্লোক রমেশচন্দ্র দত্তের তৈলচিত্র।

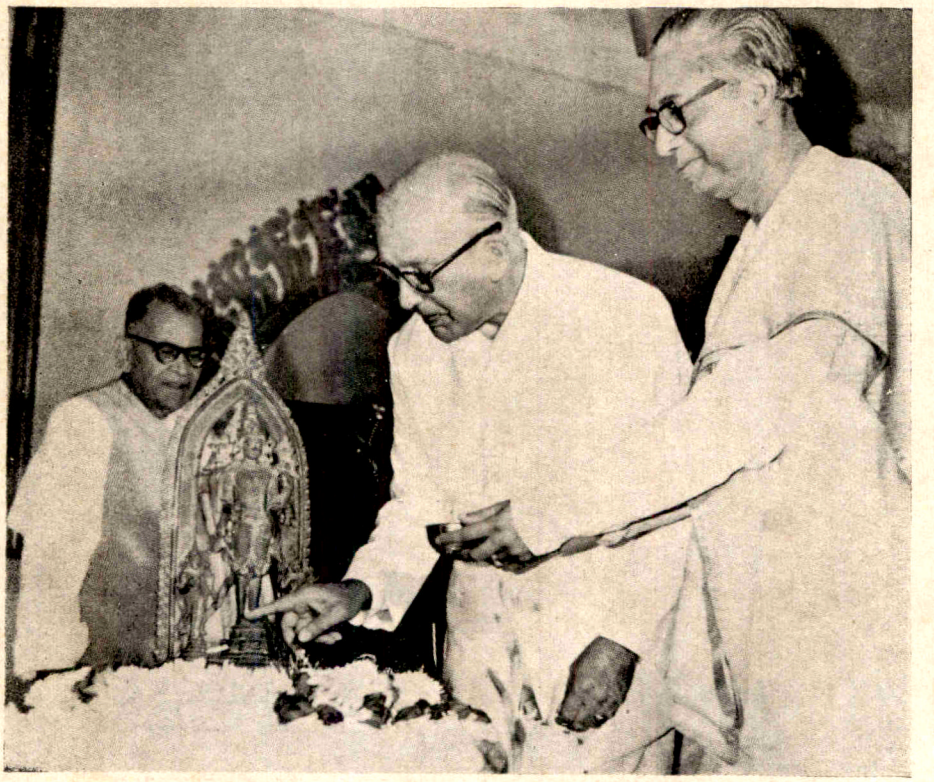

বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবের পর সভাকক্ষ ত্যাগের পূর্বে মাননীয় রাজ্যপাল রূপার বাটি হইতে শ্বেতচন্দন লইয়া বিষ্ণুমূর্তির চরণ চর্চিত করিতেছেন ও প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। বিষ্ণুমূর্তির পশ্চাতে জাতীয় আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যপালের পার্শ্বে পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার, পশ্চাৎপটে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের তৈলচিত্র।

বাঁকুড়া জেলায় তালডাংরা থানার হাড়মাসড়া গ্রামে খননকার্য্যের সময় প্রাপ্ত চতুর্ভুজা শক্তিমূর্তি। পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারের হস্তে হাড়মাসড়া গ্রামের যুবকগণ শ্রীপ্রতুলকুমার রায়, শ্রীসোমনাথ রায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় কর্তৃক ৯ চৈত্র ১৩৮১ (২৩ মার্চ ১৯৭৫) তারিখে প্রদত্ত।

[আলোকচিত্র : শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় হারানো বিষ্ণুমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ফ্রেব্রুআরি ১২, ১৯৭৫।

রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট্ দিয়াস মহোদয়ের ভাষণ।

আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য মজুমদার, অধ্যাপক কুমার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যবর্গ এবং বন্ধুগণ,

আজ সন্ধ্যায় এই ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। একাদশ শতাব্দীর যে ব্রোঞ্জ বিষ্ণুমূর্তি এখানকার সংগ্রহশালায় রক্ষিত ছিল, কিন্তু অপহৃত হয়ে সমুদ্রপারে চলে গিয়েছিল, সেটি পুনরুদ্ধারের পর আজ তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা-উৎসব।

সুতরাং এই উপলক্ষ্যটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। গুরুত্ব আছে, কারণ; ধর্ম ও হৃদয়ানুভূতির দিক্ থেকে মূল্যবান একটি মহার্ঘ সম্পদের পুনরুদ্ধার এবং সংগ্রহশালায় তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ল। গুরুত্ব আছে, কারণ বহু-আরাধ্য দেবতা আজ স্ব-গৃহে ফিরে এলেন। আমার সন্দেহ নেই যে এই পবিত্র সারস্বত মন্দিরের অনুরাগী সকলেই ঘটনাটিকে মহা আনন্দের বিষয় বলে গণ্য করবেন।

কি ক'রে এটি এবং আরও দু'টি মূর্তি অপহৃত হয়েছিল, কি ক'রে তাদের মধ্যে একটি মূর্তি ফিরে পাওয়া যায়, এবং বর্তমানে পুনরুদ্ধার করা যে ব্রোঞ্জ মূর্তিটি সংগ্রহশালায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি, এটিই বা কেমন করে উদ্ধার হ'ল, তার চমকপ্রদ নেপথ্যকাহিনী অধ্যাপক কুমার একটু আগেই আপনাদের শুনিয়েছেন। আরও বিস্তৃত বিবরণ আজ এই উপলক্ষ্যে পরিষৎ-প্রকাশিত পুস্তিকাখানিতে স্থান পেয়েছে।

আজ এই উপলক্ষ্যে সর্বসমক্ষে প্রথম অভিনন্দন জানানো কর্তব্য অধ্যাপক কুমারকে, বহু পরিশ্রম ও কষ্ট করে তিনি গবেষণা ও অনুসন্ধান করে এটি খুঁজে বার করেছেন, প্রথম সূত্র সন্ধানের পর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার অনুসরণ করেছেন, আর তারই ফলে এই অমূল্য সম্পদ্ আমরা ফিরে পেয়েছি। পরিষৎ সদস্যগণ, বস্তুতঃ সমগ্র দেশবাসী এই অমূল্য সম্পদ্ পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী।

দ্বিতীয়তঃ এই উপলক্ষ্যে আমি সাধারণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে; তাঁদের সহযোগিতা ও অনুগ্রহ না পেলে এই মহামূল্য সম্পদ্ উদ্ধার কোনদিন সম্ভব হ'ত না। বিশেষতঃ বস্টন চারুকলা সংগ্রহশালার তত্ত্ববিধায়ক

ডঃ ফণ্টেন এবং অধিকর্তা ডঃ ক্যপেলেব কাছে আমবা কৃতজ্ঞ। এই উদ্ধার-সম্পর্কিত তাঁদেব পত্রাবলীব ফটো-প্রতিলিপি পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাব অন্তর্ভুক্ত হযেছে। ব্রোঞ্জ মূর্তিটিব পুনঃ-প্রাপ্তিতে সহাযতাব জন্য বস্টন চারুকলা-সংগ্রহশালাব কর্তৃস্থানীয় এই দুই ব্যক্তির নিকট আমাদেব কৃতজ্ঞতা অপবিসীম।

আপনাবা ইতিপূর্বেই অবগত হযেছেন যে আমাদের তিনটি মূর্তি ছিল। পূর্বে একটির উদ্ধার হযেছিল, এখন একটিব হ'ল, তৃতীয় মূর্তিটি এখনও বযেছে কোথাও অজ্ঞাতবাসে। জানিনা তৃতীয় মূর্তিটি আবিষ্কাবেব জন্য অধ্যাপক কুমার তাঁব গবেষণাব ও অনুসন্ধানেব সূত্রজাল বিস্তার কবেছেন কিনা। দেশে বা বিদেশে কোথাও না কোথাও মূর্তিটি নিশ্চযই আছে। এই সুযোগে আমি উক্ত মূর্তিব বর্তমান মালিকেব কাছে আবেদন জানাই, তিনি তাঁব ন্যায্য কাজ করুন, মূর্তিটি এখানকাব সংগ্রহশালায ফিবিযে দিন। আমি নিশ্চিত যে কেউ যদি মূর্তিটির বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর পান তবে অনুগ্রহ ক'বে পবিষৎ কর্তৃপক্ষকে জানিযে দেবেন, যাতে সেই সূত্র ধবে তৃতীয় মূর্তিটিও ফিবে পাওযা যেতে পারে। এই মূর্তি আহবণ এবং পুনরুদ্ধাবেব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মূল্যবান শিল্পদ্রব্য নিযে চোবাই ব্যবসা এখনও চলছে এবং বেশী পবিমাণেই চলছে। বহু পুরাকীর্তি এবং শিল্প-সামগ্রী কোন না কোন বকম চোরা-পথে এদেশেব বাইরে চলে যাচ্ছে। এমন মাস যায না যখন মন্দির বা মিউজিযম থেকে কোন না কোন বস্তু চুবি যাবাব খবর আমরা কাগজে না পড়ি।

আমি এখানে দুটি মিউজিযম বা সংগ্রহশালাব—ভারতীয যাদুঘর ও ভিক্টোরিযা মেমোরিযাল সংগ্রহশালাব অধিপাল (Chairman), সে দুটি মিউজিযাম থেকেও চৌর্য ও অপহবণের ফলে কতকগুলি জিনিস আমবা হাবিযেছি। ক্রিষ্টী'ব বা সাদবি'র নিলাম-ঘরে ভারতেব মূল্যবান্ প্রত্নবস্তুর নিলামের খববও আমবা প্রাযই পড়ি, কিন্তু সেগুলির হস্তান্তরে কিছু কববাব ক্ষমতা নেই বলে নিজেদের বড অসহায বোধ কবি।

আমি আনন্দিত যে এ বিষযে ক্রমশঃ জনমত গড়ে উঠছে এবং যে সব জিনিস সমুদ্র-পারে চলে গিযেছে তাব পুনরুদ্ধাবে সরকাব উদ্‌যোগী হযেছেন। বস্তুতঃ আমাব ধারণা, এ ব্যাপার থামতে পাবে তখনই, যখন জনসাধাবণ আবও সতর্ক হবে, যখন জনমত দৃঢভাবে স্থিব করবে যে—প্রথমতঃ এ জাতীয মূল্যবান্ শিল্পদ্রব্যের আভ্যন্তবিক কেনা-বেচা চলতে দেওযা হবেনা, যদি কোথাও অবৈধ কেনা-বেচা হয তবে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে সে সংবাদ জানিযে দিতে হবে, শুধু তাই নয, বৈধভাবেও এ ধবণেব জিনিস বেসবকারী ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত হ'লে সেরূপ ঘটনা সংশ্লিষ্ট সরকাবী মহলেব নজবে আনা উচিত, মুখ্যতঃ মিউজিযম বা ঐ জাতীয প্রতিষ্ঠানেব গোচবে আনা উচিত, যাতে অপবকে বিক্রযেব পূর্বে সেখানকাব কর্তৃপক্ষ সেগুলি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানেব প্রথম সুযোগ পান।

মিউজিযম বা সংগ্রহশালাগুলিকে পুবাবস্তু ও শিল্পসামগ্রী কেনবার জন্য নির্দিষ্ট কিছু

অর্থ দেওয়া হয়। কাজেই এসব জিনিস কেনবার সুযোগ প্রথম তাঁদেরই পাওয়া উচিত।

এইসব শিল্প-সামগ্রী গোপনে বিদেশীদের হাতে চলে না যায়, এ বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। অনতিকাল পূর্বে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি, তাতে একজন বিদেশী আগন্তুক ঘোষণা করছেন যে তিনি প্রত্নবস্তু ও শিল্পসামগ্রী ক্রয়ে আগ্রহী। এইরূপ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের সতর্কতা এবং জনমত কার্যকর হ'তে পারে এবং আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি দেশের অভ্যন্তরে রক্ষিত হতে পারে।

আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশানুরাগী ব্যক্তিদের কর্তব্য উপযুক্ত একটি অর্থভাণ্ডারসহ জাতীয় 'ন্যাস' ট্রাস্ট্) গঠন করা যার উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের কাছ থেকে প্রত্নবস্তু, শিল্প-সামগ্রী, ঐতিহাসিক নথিপত্র, পুরাতন দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি পুরাকীর্তিসংগ্রহে উদ্যোগী হওয়া এবং সাধারণের সংগ্রহশালায় সেগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। এই ধরণের জাতীয় 'ন্যাস' (ট্রাস্ট) বার্শিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ইউরোপের নানাদেশে গঠিত হয়েছে।

মাস দুই আগে আমি মস্কৌতে গিয়েছিলাম। সেখানে কতকগুলি মিউজিয়মে আমি গিয়েছি এবং পূর্বতন শাসনকালের বহু মনোহর সম্পদ্ সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে দেখেছি। সেখানে ১৯১৭ সালে প্রচারিত লেনিনের একটি অনুশাসনে জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন বর্বরের ন্যায় ঐসব সুন্দর বস্তুর ধ্বংস সাধন না করে, কোন প্রাসাদ বা ভবন বিকৃত না করে, কোন শিল্পকীর্তি বা জাতীয় সম্পদ অপসারণ না করে, বরং সরকারী মিউজিয়মে প্রদর্শনের ব্যবস্থার জন্য যেন অনুরূপ জাতীয় সম্পদ্ তারা সরকারকে দিয়ে দেয়।

আমি আশা করি, চোরা-চালান কঠোরভাবে দমন করবার জন্য এবং প্রত্নবস্তু ও মূল্যবান শিল্প-সম্পদ্ ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিক্রয় সম্বন্ধে সরকারকে সংবাদ দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের অত্যাবশ্যকতা কেন্দ্রীয় সরকার এখন উপলব্ধি করছেন। আরও কয়েকটি বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। সরকারী বা বেসরকারী যে সকল প্রতিষ্ঠানে মূল্যবান্ বস্তু, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি বা ঐতিহাসিক নথিপত্রের সংগ্রহ আছে, তাদের হাতে যথোপযুক্তভাবে সম্পদ্ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য, সংগৃহীত দ্রব্যগুলির বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়ন, বিষয় নির্দেশ এবং সেগুলির আলোকচিত্র-গ্রহণের জন্য অর্থদানের প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কাল অন্তরে এই সমস্ত দ্রব্যাদির বিশেষত সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ও মিউজিয়মে রক্ষিত দ্রব্যাদি—প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়ে দেখা দরকার।

সংরক্ষণ ছাড়া আলোকচিত্র-সমন্বিত প্রত্যেকটি বস্তুর তালিকাও পণ্ডিত ও গবেষকদের, পক্ষে সমান আবশ্যক। এই তালিকাগুলি যদি হাল-তারিখী up-to-date) না হয় এবং

সর্বদা হাল-তারিখী করে রাখা না হয়, তবে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ও গ্রন্থাগারে যে মূল্যবান সম্পদ্ অনেক সময়ে লুকিয়ে থাকে, পণ্ডিত ও গবেষকদের পক্ষে তার হদিস পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। পুরোনো পুঁথি, পাণ্ডুলিপি এবং ঐতিহাসিক দলিল রক্ষার দিকে আমাদের আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে পুরাতন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বা তারও পূর্ববর্তী প্রাচীন কতকগুলি ঐতিহাসিক দলিল নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। হয়তো আরও কোন কোন রাজ্যে এমনিতরো ঘটনা ঘটেছে। আমি মনে করি, কি রকম দলিল রক্ষণীয়, সে বিষয়ে সরকারী নির্দেশ অবিলম্বে ঘোষণার প্রয়োজন।

কয়েকটি মিউজিয়ম, লাইব্রেরি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি সংযুক্ত, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা ন্যাস-রক্ষা, সংরক্ষণ, তালিকা-প্রস্তুতি এবং প্রত্যেক জিনিস মিলিয়ে দেখার ব্যাপারে আমাদের মিউজিয়মগুলির কার্যকলাপ ভালোভাবে তদারক করবার জন্য একটি জাতীয় কমিসন গঠনের আশু প্রয়োজন। আমি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে আরও সুপারিশ করি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য সম্প্রসারণের আবশ্যক, যাতে তাঁদের সংগৃহীত অমূল্য সম্পদ্‌গুলি তাঁরা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা যেন তাঁরা পান।

এই সন্ধ্যায় আমি আপনাদের আর বেশী সময় নিতে চাই না। সাহিত্য পরিষদে ব্রোঞ্জ বিষ্ণুমূর্তিটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান করছি, সেই কথাই আর একবার উল্লেখ করি। আশা করি, এই বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে পরিষদের অমূল্য উত্তরাধিকার ও রিক্থ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত মাননীয় রাজ্যপালের মূল ইংরেজী ভাষণটি ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস (USIS) ও ভয়েস অফ্ আমেরিকা (Voice of America) কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও শ্রীঅমিয়কুমার গাঙ্গুলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অনুবাদ : অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে
অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসব

পরিষৎ সভাপতির ভাষণ

(২৯ মাঘ ১৩৮১, বুধবার, ১২ ফেব্রুআরি ১৯৭৫)

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পাল-রীতির যে বিষ্ণুমূর্তি পরিষদের সংগ্রহশালা থেকে দশ বছর আগে চুরি গিয়েছিল এবং বিদেশে চোরাচালান করে ৫০ হাজার ডলারে, চার লক্ষ টাকায়, আমেরিকায় বিক্রি করা হয়েছিল, সেই অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারের পর আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিযাস মহোদয় আজকের এই শুভদিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সেই মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন।

এই উপলক্ষ্যে একখানি পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে মুদ্রিত হয়েছে, তাতে আমাদের মূর্তির ছবি আছে, মূর্তির সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, সেটি এই শুভদিনে আমি পরিষদের পক্ষ থেকে সাধারণ্যে প্রকাশ করছি এবং এই গ্রন্থের প্রথম কপিখানি মাননীয় রাজ্যপালকে পরিষদের পক্ষ থেকে সাদরে উপহার দিচ্ছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারকে অনুরোধ করছি তিনি স্বাগত ভাষণ পাঠ করবেন, পরিষদের সংগ্রহশালা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলবেন, এবং এই মূর্তির ইতিহাস, কি করে এটি আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে গেল তার বিবরণ এবং যেটা তিনি বলেননি—তাঁর নিজের আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও চেষ্টায়—এবং সেই সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়ার সহায়তা এবং তৎপরতায় অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি কিভাবে ফিরিয়ে আনা হল তা আজ সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্য। পরিষদের অপহৃত সম্পদ্ পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার গত তিন বৎসর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, নানা বিঘ্নবিপদ ও সমালোচনা তুচ্ছ করে অতন্দ্র চেষ্টা করেছেন তার জন্য কেবল মাত্র পরিষদের সদস্য নন, বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই মূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি নানা সূত্র ধরে অনুসন্ধান ও চেষ্টা করেছেন, আমাকে বার বার তিনি এ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তাঁর অনুমান ও অনুসন্ধানের বিষয়ে অবহিত করেছেন। তাঁর চেষ্টা—তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনা—আজ সফল হয়েছে, মূর্তি আজ আমাদের ঘরে ফিরে

এসেছে। বিভিন্ন মূর্তির ছবি তুলে আমার অনুমতি নিয়ে তিনি নানা জায়গায়, বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পাঠিয়েছেন এবং মূর্তি সন্ধান করে বের করার পর পরিষদের স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সমস্ত পুরাতন তথ্য ও দলিল নানা জায়গা থেকে আশ্চর্য্য ভাবে খুঁজে বের করে তিনি বস্টন মিউজিয়ম থেকে মূর্তিটি ফিরিয়ে আনার আয়োজনের পথ প্রস্তুত করেছেন, তার জন্য তিনি প্রকাশ্যে অভিনন্দনযোগ্য। তাঁকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করি। এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র, ফোটোগ্রাফ এবং তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি সহ তিনি ভারতের মূর্তি ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন এবং তাঁর অনুরোধ মত আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে একখানি পত্র দিই ভারতের প্রধানমন্ত্রী-রূপে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য। শ্রীমতী গান্ধী তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের প্রেরিত সমস্ত কাগজপত্র ফটোগ্রাফ ও দলিল-পত্র দেখে সহায়তা করেন, ওয়াশিংটনে আমাদের রাষ্ট্রদূতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন, বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চিঠি দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং আজ এই উপলক্ষ্যে সেকথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করি।

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সৌজন্যের জন্য, আমাদের মূর্তি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস পরিষৎ সম্পাদককে এ বিষয়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁকেও আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার মূর্তি ফিরিয়ে আনার সময় এবং পরিষদে মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কলকাতার পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ সহায়তা পেয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা পুলিসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

মূর্তি ফিরিয়ে আনার পর পরিষদের সংগ্রহশালায় যেখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার সেটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দরকারী কতকগুলি কাজ সম্পূর্ণ করিয়ে মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। আমাদের বাড়ি ভাঙা—তার প্রয়োজনীয় মেরামত করান হয়, ছাদের উপর দিয়ে সংগ্রহশালার বারান্দায় নামার সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্য বিস্তীর্ণ লোহার গ্রিল্ দিয়ে সে পথ আটকানো হয়, কোলাপসিবল্ গেট্ বসিয়ে সংগ্রহশালা সুরক্ষিত করা হয় এবং সংগ্রহশালার প্রত্যেকটি জানালা ও লোহার গরাদে পরীক্ষা করে সেগুলির পরিবর্তন ও সংস্কার করার পর মূর্তি পরিষদে পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পাদক করেন। এই অত্যাবশ্যক কাজগুলি সম্পূর্ণ করার পর মাননীয় রাজ্যপালের সময়মত আজ শুভদিনে এই মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী কালে মূর্তি রক্ষার দায়িত্ব শ্রীযুক্ত মদনমোহন

কুমারকেই দেওযা হযেছিল, আমার নির্দেশ মতই তিনি মূর্তি তাঁর বাড়িতে অষ্টপ্রহর সতর্ক ও সযত্ন প্রহরায রেখেছিলেন, মাননীয বাজ্যপালের নির্দেশে কলকাতা পুলিসের নিবাপত্তা-বাহিনী তাঁকে এ বিষযে সর্ববিধ সহাযতা কবেছেন। এই কথাগুলি আজ প্রকাশ্য ভারেই আমি বলছি এই কাবণে যে মূর্তি পুনরুদ্ধাবেব পর খবরের কাগজে নানা চিঠি বেরিযেছে নানা সন্দেহ ও সংশয প্রকাশ কবে, সম্পাদক তার কোনও জবাব দেননি, সব সমালোচনা সম্পর্কে তিনি নাবব ছিলেন।

ভারতেব বিভিন্ন সংগ্রহশালা, মন্দিব ও প্রকাশ্য স্থান থেকে বহু মূর্তি অপহৃত হযেছে তাদেব মধ্যে যেগুলি বিদেশে চোবাচালান হযে চলে গিযেছে এ পর্য্যন্ত সবকাবী বা বেসরকাবী উদ্যোগে তাব একটিও ভাবতে ফিরিযে আনতে পাবা যায নি। বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদের এই অমূল্য বিষ্ণুমূর্তি ভাবতে ফিবিযে আনার জন্য বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ আজ গৌববান্বিত। পবিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারেব অতন্দ্র চেষ্টায ও অক্লান্ত পবিশ্রমে সাগবপাব থেকে—বিদেশে নীত ও বিক্রীত—যে অমূল্য ভাবতীয প্রত্নসম্পদ্—সহস্র বর্ষ পূর্বের গৌডবঙ্গের পালবীতিব ধাতুময় বিষ্ণুমূর্তি—ভাবতে প্রথম ফিরে এল এবং বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদের সংগ্রহশালায পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল সেকথা বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদের তথা আধুনিক ভাবতীয ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষবে লিখিত হবার যোগ্য।

এখন আমি শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারকে অনুবোধ করছি তিনি সভায তাঁর স্বাগত ভাষণ পাঠ করুন॥

ইউনাইটেড স্টেটস ইনফবমেশন সার্ভিস (USIS) ও ভযেস অফ আমেবিকা (Voice of America) কর্তৃক টেপ বেকর্ডে গৃহীত ও শ্রীঅমিযকুমাব গাঙ্গুলীব সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদন

শ্রীমদনমোহন কুমার

আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠানে পূজনীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করে সমবেত সুধীবৃন্দের নিকট পরিষদের পক্ষ থেকে আমি বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধার সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি। সভাপতি মহাশয় নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি স্বাগত ভাষণ সুভাষ পাঠ করার জন্য। কিন্তু আজ সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় আমি স্বাগত ভাষণ লেখার অবসর পাইনি, লিখতে আরম্ভ করে অল্প একটু লেখার পর লেখা শেষ করতে পারিনি, তাই মুখেই বলছি, তার জন্য সভাপতি মহাশয়ের কাছে এবং আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সাহিত্য পরিষদের অধিদেবতা বঙ্গবাণীকে প্রথমেই প্রণাম জানাই। বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতির বিস্মৃত অবলুপ্ত পরিচয় পুনরুদ্ধারের জন্য গত ৮২ বছর ধরে যে সব মনীষী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যাঁদের স্বপ্নে সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রণাম জানাই। বঙ্গসংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা বঙ্গভূমির ষড়ৈশ্বর্য্যময় রূপ দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-রূপের বর্ণনা করেছিলেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়, বঙ্গভূমির সেই ষড়ৈশ্বর্য্যময় রূপ—"মা যাহা ছিলেন", "মা যাহা হইবেন"—সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতারা মাতৃভূমিতে দেখেছিলেন, তাই মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির পূজায় তাঁরা পরিষদ্-প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আত্মোৎসর্গ করে-ছিলেন। পরিষদের ৮২ বছরের ইতিহাসে তাঁদের স্বপ্ন ও সাধনা চিরদিন প্রেরণা যুগিয়েছে। এই জীর্ণ প্রাচীন গৃহে, স্বল্পালোকিত কক্ষে যখন আমরা কাজ করি তখন কত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় আমাদের চারপাশের মনীষী ও পূর্বসূরীদের এই প্রাচীন মর্মর মূর্তিগুলি, প্রলম্বমান এই পুরাতন তৈলচিত্রগুলি আমাদের প্রেরণা দেয়, তাঁদের সত্তা আমাদের কর্মশক্তিকে নীরবে স্পর্শ করে। আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠানে তাঁদের সকলের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

নমস্কার জানাই মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট্ দিয়াস্‌কে। তিনি যে কী অপরিসীম প্রেমের চোখে, ভালবাসার চোখে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে দেখেছেন, তা আপনারা অনেকেই জানেন না। পরিষদের প্রয়োজনে যখনই সভাপতি মহাশয় বা আমি তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি তাঁর সমস্ত কাজ ফেলে তিনি তখনই আমাদের সাহায্য করেছেন, এবং আজ যে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এর পিছনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট্ দিয়াসের তৎপরতা,

আনুকূল্য এবং সাহায্যই এটা সম্ভবপর করেছে। ছ'মাস আগে যেদিন মাননীয় রাজ্যপাল পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন সেদিন তিনি আমাদের চিত্রশালা (মিউজিয়ম) পুথিশালা ও লাইব্রেরির অমূল্য সম্পদ্ ও আর্থিক দুরবস্থা দেখে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা বোধ করেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে সেই আনন্দ ও বেদনা ঘোষিত হয়েছিল, অন্তরের প্রেরণায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, তিনি পরিষদের উন্নয়নের জন্য দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। আমরা সেই দশ হাজার টাকা দিয়ে কাজ শুরু করেছি। গত কয় মাসে আমরা কিছু কিছু দুরবস্থা দূর করতে পেরেছি, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের স্বল্প পরিসর কক্ষগুলিতে গত ৮২ বছর ধরে এত অমূল্য প্রত্নবস্তু ও বহুসম্ভার সংগৃহীত হয়েছে যে, তা এই স্বল্পায়তন কক্ষগুলিতে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অভাব স্থানের, অভাব অর্থের, অভাব বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের ও আধুনিক উপকরণের, অভাব আত্মনিবেদিত কর্মীর।

সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত সমস্ত মূর্তির, প্রত্নবস্তু ও পুরাকীর্তির এবং পুরাতন চিত্রগুলির বর্ণনাত্মক পরিচয় দিয়ে একটি ভাল ক্যাটালগ তৈরি করা প্রয়োজন। আমাদের মিউজিয়মে স্থানাভাবের জন্য বহু নিদর্শন পরিষদের বিভিন্ন স্থানে, খোলা বারান্দায়, সিঁড়ির নীচে ও উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। গত দু'বছর ধরে আমরা সেগুলিকে খোলা বারান্দা ও সিঁড়ির উপর ও নীচে থেকে সরিয়ে স্বল্পপরিসর কক্ষে তালা বন্ধ করেছি, সেগুলির প্রত্যেকটির বর্ণনাত্মক তালিকা ক'রে, সংক্ষিপ্ত পরিচয়-ফলক লিখে, মিউজিয়ামের জন্য প্রশস্ত স্থানের ব্যবস্থা ক'রে সাজিয়ে রাখা দরকার। নিজের দেশকে জানবার জন্যই দেশবাসীর চোখের সামনে সেগুলিকে তুলে ধরা দরকার। বিদেশী দর্শকের কাছেও বঙ্গ-সংস্কৃতির এই নিদর্শনগুলি সুসজ্জিত ক'রে দেখান দরকার।

আমাদের একটা মস্ত সুবিধা আছে। আমাদের ১৪ কাঠা জমি। পুণ্যশ্লোক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দান এই ভূখণ্ড, বঙ্গবাণীর পূজারীদের দানে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত, লালগোলার মহারাজা শ্রুতকীর্তি যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ও লক্ষ্মীর অন্যান্য বরপুত্রেরা বঙ্গবাণীর এই দেউল নির্মাণে মুক্তহস্তে সহায়তা করেছেন ; বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এই পরিষদের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন ; আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত মনীষী সম্পাদকরূপে এর কর্ণধার ছিলেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের মত অসাধারণ পণ্ডিত এর চিত্রশালা ও পুথিশালা সংগঠন করেছেন, ব্যোমকেশ মুস্তফী ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মত আত্মভোলা কর্মী নিজেদের সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্য উপেক্ষা করে পরিষদের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছে, পরাধীনতার শৃঙ্খলে সহস্র অসুবিধার মধ্যে তাঁরা যা করে গেছেন এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সম্পূর্ণ করার ভার দিয়ে গেছেন, তা পূর্ণ করার দায়িত্ব সমগ্র জাতির।

আমাদের এই ১৪ কাঠা জমির উপর ত্রিতল নির্মাণ আশু প্রয়োজন। প্রস্তাবিত

তৃতীয় তলাটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত (air-conditioned) করতে হবে, জীর্ণ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন চিত্রপট, মনীষীদের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি, ডায়ারি এবং অন্যান্য পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হলে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। তাহলেই আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্র, প্রাচীন শিল্পকর্ম, পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তুর যে অমূল্য সম্ভার—এক কথায় বঙ্গ সংস্কৃতির যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ্ এখানে দীর্ঘদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, যেগুলির পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত হয়নি সেগুলি—আমরা ভবিষ্যৎ কালের জন্য রেখে যেতে পারব, মিল্‌টনের ভাষায় **which posterity will not willingly let die,** আমাদের বংশধরেরা সেগুলির অপমৃত্যু ঘটতে দেবে না, পূর্বপুরুষের অমূল্য বিকৃত রূপে রক্ষা করবে।

রাজ্যপালকে ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ, তিনি সেই কাজে আমাদের সহায়তা করেছেন কিছুটা। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অনুরোধ নয়—আমাদের দাবী, জনসাধারণের দাবী—বাঙ্‌লা দেশের সাহিত্য-পরিষদ্‌কে তার পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেন সরকারের দাক্ষিণ্য ও আনুকূল্য থেকে আমরা বঞ্চিত না হই, কৃপণের মত মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে সাহিত্য পরিষদ্‌কে তাঁরা বিদায় না করেন। বাঙ্‌লার জনসাধারণ—ধনী দরিদ্র—তাঁরা অকৃপণ হস্তে দান করেছেন। আমার শিক্ষক ডক্টর সুকুমার সেন পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে সভাপতির ভাষণে একদিন বলেছিলেন "বাঙালী তার সিঁদুর-মাখানো লক্ষ্মীর ঝাঁপির মুদ্রাটুকু পর্য্যন্ত দিয়ে গেছে সাহিত্য পরিষদে রক্ষার জন্য।" আজকের দিনে সেই মহাপ্রাণতা দুর্লভ হয়েছে। তবুও আমরা জানি, জনসাধারণের সাহায্য পেলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে আমরা পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে একটি পরম শুভদিন। দশ বছর আগে পৌষ-সংক্রান্তির শীতের মধ্যরাত্রে, বৃহস্পতি বারে, এই বিষ্ণুমূর্তি এখান থেকে অপহৃত হয়েছিল। তারিখ ছিল ১৪ই জানুআরি, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। তারিখটি পরিষদের কার্য্য-বিবরণীর পুরাতন খাতায় ছিল। আমি কৌতূহলী হয়ে পুরানো পাঁজি ঘেঁটেছিলাম—পৌষ-সংক্রান্তির নিশুতি রাতে, বৃহস্পতি বারে, বিষ্ণুমূর্তি এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, আজ দশ বছর পরে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে, বাসন্তী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে পরিষদ্ মন্দিরে তাঁর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আজ বড় শুভ দিন, এবং এই দিনটি স্বয়ং রাজ্যপাল নির্বাচন করেছিলেন, আমরা করিনি। দশ বছর পরে হারানো মূর্তি আমরা ফিরে পেলাম, আমাদের পরম আনন্দের কথা। এই অমূল্য শিল্পকীর্তি চুরি গিয়েছিল আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য। আমাদের উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। ভিতর এবং বাহির,

দুই দিক থেকেই এই মূর্তি চুরির আয়োজন হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ কাহিনী প্রকাশ করার সময় এখনও হয়নি, এখনও একটি মূর্তি আমাদের ঘরে ফেরেনি, যথা সময়ে আমরা সমস্ত নেপথ্য-কাহিনী প্রকাশ করব। এই উপলক্ষে আমি তার আংশিক বিবরণ দিচ্ছি।

১৪ই জানুআরি ১৯৬৫-তে মূর্তিটি চুরি হবার ক'দিন পরে পরিষদের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। পুলিসে রিপোর্ট করার পর পুলিস যখন তৎপর হয় ও অনুসন্ধান শুরু করে তখন মূর্তিটি দীর্ঘকাল—পাঁচ বছর—কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে রাখা হয়। পাঁচ বছর পরে যখন জনসাধারণের চিরচঞ্চল স্মৃতি ব্যাপারটি ভুলে যায় এবং পরিষদ্-কর্তৃপক্ষ নীরব ঔদাসীন্যে নিশ্চেষ্ট হন, পুলিশের রিপোর্টটিও ফাইলবন্দী হয়ে যায়, তখন পুলিশ ও কাস্টম্‌সের চোখে ধুলো দিয়ে মূর্তিটি কয়েকটি হাত-ফেরত হয়ে সমুদ্রপারে চোরা চালান করা হয়। মূর্তিটি আমেরিকায় যায় এবং সেখানে ৫০ হাজার ডলারে—চার লক্ষ টাকায়—বিক্রীত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই—সাহিত্য-পরিষদের বহু মূর্তির ও পোড়ামাটির (terracotta) অলংকরণ ও শিল্পসামগ্রীর ফোটোগ্রাফ অবৈধভাবে, পরিষদের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে, অনুগ্রহভাজন বহু ব্যক্তি নিয়েছিলেন, সেই সব নেগেটিভ থেকে বহু কপি প্রস্তুত করে স্বদেশের ও বিদেশের শিল্প-'রসিক' ও পুরাকীর্তি-ব্যবসায়ী ও শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার –Curio and Art dealerদের—কাছে পছন্দ ও দরদস্তুরের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অবৈধভাবে ছবি তোলার ও নেগেটিভ নিয়ে যাওয়ার এই কাজ অত্যন্ত কঠোর হস্তে আমি দমন করেছি, তাতে জনপ্রিয়তা হারিয়েছি, নিন্দিত হয়েছি, বন্ধু শত্রু হয়েছেন, নানা আঘাত লাঞ্ছনা অপবাদ সয়েছি—পরিষৎ-সভাপতি সে-সব কথা জানেন। এই হারানো মূর্তি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন গত দু'বছর ধরে দেখেছি, স্বপ্ন যে সফল হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। প্রাথমিক চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, সূত্র সন্ধানের যখন পথ খুঁজে পেলাম না, তখন ভাবলাম যে-পথে গেছে অনুমান করছি সেই পথেই চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? সভাপতি মশায়ের কাছে আমার অনুমানের কারণগুলি জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে পরিষদের মিউজিয়মে যে বিষ্ণুমূর্তিগুলি আছে সেগুলির ছবি তুললাম, যে তিনটি মূর্তি হারিয়েছিল তার একটি আমরা পূর্বেই ফিরে পেয়েছি সেটিরও ছবি তুলি, যে-দুটি মূর্তির কোনও সন্ধানই পাচ্ছিলাম না, সে-দুটি মূর্তির আর্ট প্লেট art plate ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত স্বর্গত মনোমোহন গাঙ্গুলীর 'Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad' বইয়ে আছে এবং তারই মধ্যে পুনরুদ্ধার করা যে মূর্তিটি এই রাজ্যে সীলমোহর করা আছে—মাননীয় রাজ্যপাল যেটি এখন উন্মোচন করবেন—সেটির ছবি এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার Encyclopaedia Britannica-র ১৯৬১-র সংস্করণে

ভালো আর্ট পেপারে মুদ্রিত আছে; অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম সেখানে উল্লিখিত নেই। Encyclopaedia Britannica-র পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে এই ছবি খুঁজে পাইনি। আশ্চর্য্যের বিষয় পরবর্তী সংস্করণ ১৯৬৬-তে মুদ্রিত Encyclopaedia Britannica-য় এই ছবিটি নেই। ১৯৬৫-তে আমাদের মূর্তি চুরি গিয়েছিল। যাই হোক ১৯৬১-র ব্রিটানিকা থেকেও আমি এই ছবিটির ফোটো তোলাই। তারপর যা আমাদের ঘরে আছে আর যা আমাদের ঘরে নেই তার সব ছবিগুলি মিশিয়ে, পরিষদের সভাপতি মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে, বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত মিউজিয়ামে পাঠাই এবং মূর্তিগুলির অনুরূপ রীতির কোনও বিষ্ণুমূর্তি তাঁদের সংগ্রহে থাকলে তার বিবরণ জানাতে অনুরোধ করি—বিষ্ণুমূর্তি সম্বন্ধে একটি আলোচনা-নিবন্ধ প্রস্তুতের জন্য বিবরণ সংগ্রহ প্রয়োজন — তাঁদের জানাই। একমাত্র বস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্যের সঙ্গে জানালেন যে, প্রেরিত ছবিগুলির মধ্যে একটি মূর্তির অনেকটা অনুরূপ মূর্তি তাঁদের সংগ্রহশালায় আছে, তবে দুটির মধ্যে একটু পার্থক্যও আছে, তাঁদের বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে দুটি প্রণত ভক্তমূর্তি নেই—একটি প্রণত ভক্তমূর্তি আছে। যে বিষ্ণুমূর্তি আজ মাননীয় রাজ্যপাল এখানে উদ্‌ঘাটন করবেন তার পাদদেশে একটি প্রণত মূর্তি—"a small kneeling figure"—পক্ষবান্ গরুড়ের মূর্তি ছিল, সেটিকে বিক্রয়ের পূর্বে খুলে নেওয়া হয়েছিল বা পৃথক্‌ভাবে বিক্রয় করা হয়েছিল। বিষ্ণুমূর্তির দুদিকে দুটি দণ্ডায়মান পরিকর মূর্তি ছিল, সে দুটির মধ্যেও একটিকে সকেট socket খুলে আলাদা করা হয়েছিল। যিনি বিক্রি করেছিলেন তিনি whole saler পাইকারী ব্যবসায়ী কিনা জানিনা, তবে তিনি যে retailer খুচরা ব্যবসায়ী কোনও সন্দেহ নেই। তিনি খুচরো ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন। টুক্‌রো টুক্‌রো করে মূর্তিগুলিকে আলাদা করে বেচলে দাম বেশি পাবেন বলে, প্রথম মূর্তিটিকে খোলেন। তারপর পাদপীঠের অপর প্রণত ক্ষুদ্র মূর্তিটি—সেটির মাথার মুকুট আগেই একটু ভাঙা ছিল—খুলতে গিয়ে তার মাথার মুকুটটি ভেঙে যায়। যখন তিনি দেখলেন যে খুলতে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন খোলা বন্ধ করলেন। এক পাশের দণ্ডায়মান পরিকর মূর্তি fixed আবদ্ধ আছে, আর এক পাশের দণ্ডায়মান পরিকর মূর্তিটি বিচ্যুত, সৌভাগ্যক্রমে সেটিও আমরা পেয়েছি।

বস্টন মিউজিয়ম অফ্ ফাইন আর্টস আমাকে জানালেন যে তাঁরা মূর্তিটি ১৯৭০ সালে কিনেছেন। আমার খট্‌কা লাগলো। ১৯৬৫-তে চুরি হল, আর ১৯৭০-এ ওঁরা কিনলেন। বস্টন মিউজিয়ামের ১৯৭০, ১৯৭১-এর Annual Report বার্ষিক বিবরণ সংগ্রহ করে দেখলাম সেখানে মূর্তির ছবি বেরিয়েছে। মিলিয়ে দেখলাম সে ছবি আমাদের অপহৃত মূর্তির—পক্ষবান্ গরুড় কেবল উড়ে চলে গেছেন। ওঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে পত্রালাপ চললো, দাবি জানালাম ওঁদের কাছে। ওঁরা বললেন যে, মূর্তিটির ছবি দেখে তাঁরা "reputable dealer"-এর কাছ থেকে এই মূর্তি কিনেছেন; ১৯৩৩ সালে দিল্লী

থেকে প্রকাশিত একখানি বইযে এই মূর্তির ছবি আছে এবং সে বইযে বা প্রকাশিত ছবিতে কোথাও বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের নাম নেই, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের যদি কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকে তাহলে পুলিস-রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিল দিযে তা প্রমাণ কবতে হবে। ওঁদের কিউবেটর আমাকে লিখলেন :

"I wonder if we could ask you to provide us with a copy of the Police Report or other records or documents which would support your title to the object which clarify the circumstances of its disappearance."

ইতিমধ্যে এই মূর্তি ভারত অথবা বাংলাদেশ—India or Bangladesh—কোথাকার মিউজিযম থেকে অপহৃত, এ প্রশ্ন বস্টন মিউজিযম অফ্ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষেব কাছে জানিনা কাঁবা উত্থাপন করলেন। বস্টন মিউজিযামেব কর্তৃপক্ষ আমাব কাছে লিখিত পত্রে জানালেন : "rather confusing story about it having been stolen from an Indian or Bangladesh museum reached us recently"—এ প্রশ্নেও আবাব একটা সমস্যা বাড়লো।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পুলিস রিপোর্টেব যে কপি পরিষদের অফিসে ছিল তা কয়েক বছর আগেই অদৃশ্য হযে যায। সে-ফাইল বহু অনুসন্ধানেও আমবা খুঁজে পাইনি। কলকাতার পুলিস বিভাগে সন্ধান করেও কোনও পুলিস রিপোর্টের কপি বাব কবতে পারিনি। তাবপর ইউনাইটেড নেশনস্ এডুকেশন্যাল, সায়ান্টিফিক্ অ্যাণ্ড কালচাবাল অর্গানিজেসনে UNESCO-য এবং আন্তর্জাতিক পুলিস সংস্থায Interpol-এ অনুসন্ধান কবি। কোনও দেশের মূল্যবান্ সম্পদ বা প্রত্নবস্তু চুরি গেলে বা বিদেশে চালান হতে পাবে সন্দেহ হলে দেশ-বিদেশেব নানা প্রতিষ্ঠান ও সবকার থেকে এঁদের কাছে সংবাদ দেওযা হয এবং এঁরা এ-বিষযে নজর রাখেন বা অনুসন্ধান করেন। এই দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে জানা গেল যে এইরকম কোনও মূর্তি যে ভাবত থেকে চুবি গেছে বা বিদেশে চালান হযেছে এমন কোনও সংবাদ তাঁদেব কাছে নেই বা কোনও দিন সরকাবী বা বে-সরকারী কোনও সূত্রেই পৌঁছাযনি। বস্টন মিউজিযমেব কর্তৃপক্ষও ঐ দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থায অনুসন্ধান কবলেন এবং আমাকে লিখলেন যে : "An investigation of the Interpol and Unesco files revealed no information"—কি বিচিত্র অবস্থা, আশা-নিরাশা ও মানসিক উদ্বেগেব মধ্য দিযে আমাদের হারানো বিষ্ণুমূর্তি যে ফিরে পেযেছি তা ভাবলে আমাব নিজেবই বিস্ময লাগে। আজকে বিষ্ণুমূর্তি যে আমাদেব ঘরে এসেছেন, বিষ্ণু আসবেন বলেই এসেছেন, এর পিছনে আমাদেব কারুব কৃতিত্ব নেই। তাঁকে অপহরণ কবে কেউ পরিষদকে বঞ্চিত করতে পারে না। সাহিত্য-পবিষদ্ দবিদ্র হবে না, নিঃস্ব হবে না। আমার বুকের একটা মস্ত বড বল এই মূর্তিব অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাবে।

পুলিস রিপোর্ট যখন পাওয়া গেল না তখন স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রমাণের এবং মূর্তি যে ভারতের, বাংলাদেশের নয়, তা প্রমাণের জন্য পুরাতন নথিপত্র ও ধূসর পাণ্ডুলিপি ঘাঁটতে শুরু করলাম। বস্টন মিউজিয়মকে আমরা দেখালাম যে ১৯৩৩-এর ঢের আগে ১৯০৯ সালে এই মূর্তি সম্বন্ধে আমাদের হাতের লেখা জীর্ণ পুরাতন কার্য্যবিবরণীতে আমাদের স্বত্বের প্রমাণ রয়েছে। ফোটোস্ট্যাট কপি পাঠালাম সেই কার্য্যবিবরণীর, সঙ্গে তার ইংরেজি অনুবাদ। মুর্শিদাবাদের কান্দী সাগরদীঘীর কাছ থেকে এ মূর্তি পেয়েছিলেন স্বর্গত কিশোরীমোহন সিংহ। সাহিত্য পরিষদের পুরাতন সদস্য-তালিকায় তাঁর নাম আছে, এবং তিনি ইংরাজী ১৯০৫ সালে, বাঙ্‌লা ১৩১২ সালে কয়েক মাস—আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত—এখানে সহকারী সম্পাদক ছিলেন, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন সম্পাদক। কিশোরীমোহনের কাছ থেকে পরিষৎ সম্পাদক পুণ্যশ্লোক রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী এই মূর্তিটি এখানে নিয়ে আসেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তখনও পরিষদের চিত্রশালা বা মিউজিয়ম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা হয়নি, কিন্তু বাঙালী ধীরে ধীরে এখানে আপনা আপনিই মিউজিয়ম গড়ে তুলছিল। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের সামনে মূর্তি প্রদর্শিত হয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন মূর্তির প্রাথমিক পরিচয় সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। সেদিন যে-সব মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের স্বাক্ষরিত হাজিরা ও কার্য্যবিবরণ পরিষদের পুরাতন নাথপত্রে আছে। ৬৫ বছর আগেকার সেই পুরাতন নথি আমাদের স্বত্বস্বামিত্বের অন্যতম দলিল। একটানা ৩৮ বছর এই মূর্তি পরিষদের চিত্রশালায় ছিল, দেশ-বিদেশের নানা পুরাতত্ত্ববিদ্ শিল্পরসিক এর সৌন্দর্য্যে ও শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন তারিখে যে সমস্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেগুলিও আমাদের অনুকূল প্রমাণ। ৩৮ বছর পরিষদ্ মন্দিরে থাকার পর এই মূর্তি এখান থেকে বিলেতে যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে লণ্ডনে রয়্যাল একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের Royal Academy of Fine Arts-এর আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে International Art Exhibition-এ। সেখানে এক লক্ষ টাকা নাকি তখন এই মূর্তির দাম উঠেছিল। আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিষদের ১১শ শতকের বিষ্ণুমূর্তি, বিদেশের বাজারে এর দাম যাচাইয়ের পর পরিষদের বিষ্ণুমূর্তি তিনটির উপর লোকের দৃষ্টি পড়ল। বিদেশী কাগজে প্রকাশিত প্রদর্শনী-সংক্রান্ত বিবরণ খুঁজে তার ফোটোস্ট্যাট কপি নিয়ে, পরবর্তীকালে Statesman পত্রিকায় সাহিত্য পরিষদের সম্পদ্-সম্ভার বিষয়ে সচিত্র নিবন্ধে বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশিত ছবিসহ কাটিং ও Photostat Copy, এবং মূর্তি চুরি যাওয়ার কয়েকদিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পরিষদের মূর্তি চুরির খবর এবং তার পরে প্রকাশিত একটি editorial বা সম্পাদকীয় নিবন্ধ খুঁজে বের করে তার ফোটোস্ট্যাট কপি ও ইংরেজি অনুবাদ করে আমাদের স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণ

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরি, দেখাই যে, ১৯৩৩-এর ঢের আগে থেকে, ১৯০৯ থেকে আমাদের Title ও আজ থেকে ৬৫ বছর আগেকার Title, যে মূর্তি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তা আমাদেরই মূর্তি, চোরাই মূর্তি তাঁদের প্রদর্শনশালায় রয়েছে একথা তাঁদের জানাই, এবং যে 'reputable dealer' বিখ্যাত শিল্প-বিক্রেতার কাছ থেকে তাঁরা কিনেছেন তাঁর নাম-ঠিকানা "একান্ত গোপনীয় তথ্য" হিসেবেই আমাকে জানাতে অনুরোধ করি। কারণ এই জাতীয় পর্বিলকদের চেনা দরকার এবং দেশের লোককে চিনিয়ে দেওয়া দরকার। এঁর বা এঁর সহযোগীদের ও সম্পর্কিত ব্যক্তিদের চিরদিনের মত আমরা সাহিত্য পরিষদে ঢোকা বন্ধ করব এবং ভারতের সমস্ত মিউজিয়মে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের দ্বারস্থ হব।

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ অসামান্য সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের মূর্তি আমাদের হাতে ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হলেন এবং আমাকে লিখলেন যে যে বিক্রেতার মারফৎ তাঁরা মূর্তি কিনেছিলেন তাঁর নাম-ধাম-পরিচয় জানার অধিকার আমার আছে "With regard to the identity of the dealer through whom we purchased this object, we certainly feel you have every right to this information" এবং সেই বিক্রেতা—'a man of fine reputation and integrity'—স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করবেন এবং কীভাবে মূর্তি তাঁর হস্তগত হয়েছিল আমার কাছে ব্যাখ্যা করবেন। ইতিমধ্যে মূর্তি হস্তান্তর বিষয়ে সকল পক্ষের স্বার্থরক্ষা ক'রে—"which would protect the interests of all concerned" - একটি আইনগত চুক্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও মিউজিয়ম অফ্ ফাইন আর্ট্স্, বস্টন-এর মধ্যে সম্পাদনের জন্য তাঁরা প্রস্তাব করলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হলাম। কিন্তু পরিষদের আর্থিক অবস্থায় বস্টনে গিয়ে মূর্তি গ্রহণ করা এবং বিমানে সে মূর্তি কলকাতায় আনার ব্যয় বহন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে আর্থিক সম্বল আমাদের ছিল না। তাই উভয় পক্ষের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর বস্টন মিউজিয়ম মূর্তিটি বস্টন থেকে ওয়াশিংটনে তাঁদের খরচে আনবেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত সেটি গ্রহণ করবেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত সেটি গ্রহণ করা "shall operate as a full discharge and release to the Museum by the Parisad" এই শর্ত স্থির হয়। ওয়াশিংটন থেকে ইনসিওরেন্স করে বিমানে এই মূর্তি ভারতে আনার বিমান ব্যয় বহন করাও পরিষদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমেরিকায় তখন এই মূর্তির বাজার দর ৭৫ হাজার ডলার ৬ লক্ষ টাকা), বস্টন মিউজিয়ম assessor-কে দিয়ে মূল্য নিরূপণ করে বস্টন থেকে ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত ঐ মূল্যে মূর্তি ইনসিওরেন্স করে পাঠান। যাই হোক, বস্টনের আইনজ্ঞদের রচিত ও প্রেরিত চুক্তিপত্রটি কলকাতায় আইনজ্ঞদের অনুমোদন

করিয়ে আমি স্বাক্ষর ও সীলমোহর করে পাঠিয়ে দিই। সেই চুক্তিপত্রের ফোটোস্ট্যাট কপি photostat copy আজকে এই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছে, ভবিষ্যতে ভারত অথবা বাংলাদেশ—"India or Bangladesh"—কার মূর্তি এই নিয়ে যেন আর প্রশ্ন না ওঠে। তারপর এ বিষয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে সমস্ত চিঠিপত্র correspondence-এর কপি ও পরিষদের ১১শ শতকের তিনটি বিষ্ণুমূর্তির দু-কপি করে ছবিতে স্বাক্ষর ক'রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে মূর্তি ভারতে আনার ব্যবস্থা এবং ওয়াশিংটন থেকে ভারত পর্য্যন্ত ইনসিওরের ব্যয় ও বিমানে পাঠাবার ব্যয় বহনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করা স্থির করি। পরিষদের সভাপতি ভারতের জাতীয় আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখে একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আমার পত্রসহ সমস্ত কাগজপত্র, ফোটোগ্রাফ ও চুক্তিপত্রের নকল তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ও সাহায্যের অনুরোধ করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাঁর ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে আমাদের জানান যে, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত স্বর্ণ সিংকে এবং আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলকে এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর মাদাম ফণ্টেনকে Jan Fontein-কে তিনি ধন্যবাদ-জ্ঞাপক একটি চিঠিও পাঠাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লম্বলট্ দিয়াস ১২ই জুলাই ১৯৭৪ রাজভবনে পরিষৎ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনাকালে সমস্ত কাগজপত্র দেখে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। ১৯শে জুলাই বস্টন থেকে বিষ্ণুমূর্তিটি ওয়াশিংটনে, চুক্তিপত্র অনুসারে, Indian Embassy-তে আনা হয় এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি এন কাওলের হাতে অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে সেখানে একটি ছোট অনুষ্ঠান হয়—আমেরিকার সংবাদ-পত্রগুলিতে তার বিবরণ বহুল প্রচারিত হয়।

১০ই আগস্ট ১৯৭৪ রাত্রে, জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে, অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি সমুদ্রপার থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার একখানি বিমানে স্বদেশ যাত্রা করবেন দিনস্থির করি। এই দিনটি পরিষৎ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ভারতে আর কারুর কাছে প্রকাশ করা হয়নি। ১১ই আগষ্ট সকালের প্লেনে আমি দিল্লী যাব পালাম বিমান-বন্দরে বিষ্ণুমূর্তি গ্রহণ করার জন্য, এই আয়োজন হয়। আমার যাত্রার কয়েক ঘণ্টা আগে শেষ রাতে নূতন দিল্লী থেকে প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের ডিরেক্টর শ্রীসারদাপ্রসাদ হাইদর ট্রাঙ্ক টেলিফোনে আমাকে জানান যে বিষ্ণুমূর্তি আসছেন না, ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, এয়ার ইণ্ডিয়ার পাইলটরা হঠাৎ ধর্মঘট করেছেন। কলকাতা থেকে বিমানে দিল্লী যাত্রা বাতিল করে আমি কলকাতায় এয়ার ইণ্ডিয়ার রিজিওন্যাল ম্যানেজার শ্রী এইচ. ডি. বিলিমোরিয়ার মারফৎ

ন্যু ইয়র্কে টেলেক্স করে এয়ার ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করি, মূর্তি ওয়াশিংটনে Indian Embassy-তে থাকবে, বিদেশী কোনও বিমানে আনা হবে না, পাইলটদের ধর্মঘট মিটলে এবং এয়ার ইণ্ডিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলে বিষ্ণুমূর্তি ওয়াশিংটন থেকে ন্যু ইয়র্ক আনা হবে এই সিদ্ধান্ত জানাই। ওয়াশিংটনে Indian Embassyর এডুকেশন মিনিস্টার শ্রীযুক্ত ইনাম রহমানকে এ বিষয়ে সংবাদ পাঠাই। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি॥'

ইতিমধ্যে মূর্তি কেন আনা হচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে ও সন্দেহ প্রকাশ করে স্থানীয় সংবাদপত্রে কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পার্লামেণ্টেও এর তরঙ্গ পৌঁছোয়। ৩রা আগষ্ট ১৯৭৪ নূতন দিল্লী থেকে একটি Express State Telegram পাই :

"Parliament Question due for answer in Rajya Sabha on 7th August 74 reads :

(a) Whether it is a fact that the Bronze Idol stolen from the Bangiya Sahitya Parisad by some was sold for Rupees 3·75 lakhs to the Boston Museum of Fine Arts,

(b) If so what steps Government have taken to get back the Idol, and

(c) The number of pieces stolen from the Museum during the years 1970-71, 1971-72 and 1973-74.

Please write all details to enable us to answer Parliament Question."

এ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিই এবং পূর্ণতর বিবরণ মূর্তি ঘরে ফিরলে প্রকাশ করা হবে সবিনয়ে জানাই। কোনও বিদেশী বিমানে এই অমূল্য মূর্তি ভারতে আনার আমরা পক্ষপাতী ছিলাম না; নিরাপত্তার নানা প্রশ্ন মনে জাগছিল। তিন মাসেরও উপর প্রতীক্ষার পর এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমান চলাচল স্বাভাবিক হলে ওয়াশিংটন থেকে নূতন দিল্লী পর্যন্ত ৭৫ হাজার ডলারে (৬ লক্ষ টাকা) ইনসিওরেন্স করে মূর্তি ওয়াশিংটন থেকে ন্যু ইয়র্ক আনা হয়, এবং এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে নূতন দিল্লী পাঠান হয়। ১১ই অক্টোবর ডিরেক্টর জেনারেল অফ্ আর্কিওলজি নূতন দিল্লী থেকে আমার বাড়ির ঠিকানায় আমাকে একখানি Express State Telegram পাঠান :

"Vishnu Image reaching Delhi from New York by Air India Flight No 110 on Sunday Thirteenth October 05 45 Hours (.) Please reach Delhi and take delivery at Palam Airport",

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের তৎপরতায় ১১ই তারিখের জরুরি স্টেট টেলিগ্রাম ১৫ই অক্টোবর ডেলিভারি হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের ডিরেক্টর শ্রীসারদাপ্রসাদ হাইদর নূতন দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে অতি প্রত্যূষে সুপ্রভাত জানিয়ে মূর্তি আসার সংবাদ আমাকে জানান এবং আমি নূতন দিল্লী না পৌঁছান পর্য্যন্ত মূর্তি ন্যাশনাল মিউজিয়মে রাখা হবে স্থির হয়। পূজার মরশুমে দিল্লীগামী কোনও প্লেনে তখন আসন নেই, মাননীয় রাজ্যপালের সহায়তায় সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের আসন ব্যবস্থা হয়, আমি নূতন দিল্লী গিয়ে মূর্তিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করি, অন্তর্বর্তী সময়টুকু মূর্তি নূতন দিল্লীতে ন্যাশনাল মিউজিয়মে রক্ষিত হয়। পূর্ব রাত্রিতে রাজভবন থেকে মাননীয় রাজ্যপালের সহ সচিব শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রেরিত টেলেক্সে আমার যাত্রার সংবাদ পেয়ে নূতন দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের লিয়াসোঁ কমিশনার ডক্টর নীতীশ সেনগুপ্ত আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেন। তাঁর সঙ্গে ডিরেক্টর জেনারেল অফ্ আর্কিওলজি ডক্টর এম. এন. দেশপাণ্ডের কাছে যাই, ডক্টর দেশপাণ্ডে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "ভারত থেকে অপহৃত হয়ে বিদেশে চলে যাওয়া মূর্তি পুনরুদ্ধার হয়ে ভারতে এই প্রথম এলো, এর পূর্বে আর কোনও হারানো মূর্তি ভারতে ফিরে আসেনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে ও আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।" তিনি আমাদের নিয়ে ন্যাশনাল মিউজিয়মে আসেন। ন্যাশনাল মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ অভিনন্দন ও প্রাথমিক আলোচনার পর আমার কাছে প্রস্তাব করেন, ভারতীয় শিল্পকলার এই অমূল্য নিদর্শনটি নূতন দিল্লীতে ন্যাশনাল মিউজিয়মে রাখার জন্য, সারা বিশ্বের টুরিস্ট ও শিল্প-রসিকদের সমাগম সেখানে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যের স্বীকৃতি সহ পরিচয়-ফলক দিয়ে একটি পৃথক্ কাঁচের আধারে তাঁরা মূর্তি রাখবেন। আমি সবিনয়ে হাসতে হাসতে বলি: "আমাদের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, আপনাদের প্রাসাদ, মূর্তি এখানে সুদৃশ্য আধারে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত থাকবে নিশ্চয়ই, তবে সাহিত্য পরিষদের রত্ন পরিষদের দরিদ্র কুটিরেই আপনাদের শুভেচ্ছাসহ নিয়ে যাই। ভারতবর্ষ ছেড়া কাঁথায় মুড়ে কোহিনূর রাখে, আমাদের দরিদ্র কুটিরেই এই রত্ন আমরা সযত্নে রাখবো।" মূর্তি গ্রহণ করার পর সারারাত উত্তেজনায় আনন্দে ঘুমুতে পারিনি। বঙ্গভবনের একটি বিলাস-বহুল কক্ষে পাশের শয্যায় শয়ান—সীলমোহর-করা বাক্সে রক্ষিত—বিষ্ণু মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে। সীলমোহর-করা বাক্সবন্দী বিষ্ণু চোখের সামনে অপরূপ প্রসন্ন হাস্যে বার বার ভেসে উঠেছেন।

পরদিন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আনুকূল্যে বিশেষ বিমানে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ মূর্তি নিয়ে কলকাতায় ফিরি। মূর্তি গ্রহণ করার পরই পূর্বদিন সন্ধ্যায় রাজভবনে মাননীয় রাজ্যপালকে টেলেক্সে খবর দিই, দমদম বিমান ঘাঁটিতে তাঁর গাড়ি এবং নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনী প্রস্তুত ছিলেন। মূর্তি প্রথমে রাজভবনে নিয়ে যাই, সেখান থেকে রাজ্যপালের নির্দেশে সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে নিয়ে আসি। আগের দিন রাতেই রাজ্যপালের নিকট

থেকে সংবাদ পেয়ে পরিষৎ সভাপতি জাতীয় আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ সদস্যদের নিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন, আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে মূর্তি তুলে দিই, তিনি চন্দন-কাঠের ধূপদানিতে একগুচ্ছ সুরভি ধূপ জেলে বহু আকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য দেবতাকে অভ্যর্চনা করেন।

আজ সেই বিষ্ণুমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাননীয় রাজ্যপালের পুণ্যহস্তে। এই সীলমোহর-করা আধারের চাবিটি একটি সীলকরা পৃথক বাক্সে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কাওল পাঠিয়েছেন, আমার কাছে গচ্ছিত সেই সীলমোহর-করা চাবিটি মাননীয় রাজ্যপালের হাতে আমি তুলে দিচ্ছি, তিনি আধার উন্মোচন করলে আমরা সবাই সে মূর্তির প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে ধন্য হব। এই সঙ্গে একটি সীলকরা খামে রক্ষিত অপহৃত মূর্তির একখানি স্বাক্ষরিত ছবিও রাজ্যপালের হাতে তুলে দিচ্ছি—এই ছবির একখানি স্বাক্ষরিত কপি মাননীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রক্ষিত আছে, একখানি স্বাক্ষরিত কপি ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি এন কাওলের কাছে রক্ষিত আছে এবং একখানি স্বাক্ষরিত কপি এতদিন আমার কাছে রক্ষিত ছিল। মূর্তির আধার উন্মোচনের পর এই সীল-করা ছবি খুলে তার সঙ্গে আমাদের ফিরে পাওয়া বিষ্ণুমূর্তি সর্বসাধারণ্যে মিলিয়ে দেখে নেওয়া হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তার ন্যাস রক্ষা করেছে, তার দায়িত্ব পালন করেছে তা প্রমাণিত হবে।

পরিশেষে একটি কথা আপনাদের জানানো দরকার। বিদেশী সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে, কোনো মূল্য না নিয়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে মূর্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদের সম্পদ্ আমরা ফিরে পাবো, মূল্য দিয়ে কেন কিনবো? তবে এই সঙ্গে আরও একটি সংবাদ আপনাদের গোচরে আনি। যে বিক্রেতা চার লক্ষ টাকার এই মূর্তি বিক্রি করেছিলেন—তিনি সমগ্র টাকা বস্টন মিউজিয়মকে ফেরৎ দিয়েছেন এবং বস্টন মিউজিয়মকে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি 'অজ্ঞাত' ("anonymous") থাকতে চান। বস্টন মিউজিয়ম আমাকে লিখেছেন যে, তিনি এসে ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আমরা আজও তাঁর প্রতীক্ষা করছি। জানি না তিনি আসবেন কিনা।

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা অশেষ ঋণী, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের সহৃদয়তা সৌজন্য ও সহায়তার জন্য তাঁদের সাধুবাদ দিই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট্ দিয়াস, শ্রী টি. এন. কাওল এবং পরিষদের সভাপতি ভারতের জাতীয় আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তাও অশেষ চেষ্টার জন্যই আজ এই অমূল্য সম্পদ্ আমরা ফিরে পেলাম, সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সমবেত সুধীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁদের আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

আপনারা যাঁরা আজ সন্ধ্যায় এই শুভ উৎসবে এসেছেন তাঁদের সকলকে আমার প্রণাম ও নমস্কার নিবেদন করি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি আপনাদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে গৌরবোজ্জ্বল করুক, এইটুকুই আজকের দিনে আমার প্রার্থনা ॥ *

*ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস (U S I S) কর্তৃক গৃহীত টেপ রেকর্ড হইতে—U S I S-এর সিনিয়র এডিটর শ্রীঅমিয়কুমার গাঙ্গুলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সুহৃদ্বর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ, পি-এইচ্. ডি.

১৯১০-১১ সাল। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম এ. পড়ি। এম. এ. কোর্সে তখন ছিল আটটি পেপার। এর ছয়টি সকলকেই পড়িতে হইত। বাকী দুটি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি বাছাই করিয়া নেওয়া চলিত। আমার নির্বাচিত বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন জে. এন. দাসগুপ্ত—অক্সফোর্ডের ছাত্র—চিরকাল ইংলণ্ডের ও ইউরোপের ইতিহাস পড়াইয়াছেন। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের কিছুই তিনি জানিতেন না। তবুও তিনিই খানিকটা পড়াইতেন। আর সংস্কৃতের অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী বাকিটা পড়াইতেন। নীলমণিবাবু আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুইজনেই ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইতেন এবং অনেক দিন তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করেন।

ক্লাসে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়াইতে পড়াইতে নীলমণিবাবু শাস্ত্রী মহাশয় ও রাখালদাসের প্রসঙ্গ তুলিতেন। প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা পাঠে রাখালদাসের অসাধারণ দক্ষতার কথা তাঁহার কাছেই প্রথম শুনি। এম. এ. পাশ করার পরে যখন আমি প্রাচীন ভারতে ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি তখন তিনি ঐ দুইজনের কাছে আমাকে পরিচয়পত্র দেন। আমি প্রথমে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—'রাখাল ব্লক সাহেবের কাছে শিখেছে। তুমি ওদের সঙ্গে দেখা কর।'

এইভাবে রাখালদাসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার বাড়িতে গিয়া দেখি—পরণে সুন্দর কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলে-করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী এবং গলায় কোঁচানো চাদর—এক যুবক একটি খুব তেজী ঘোড়া জুতিয়া নিজেই গাড়ি হাঁকাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'একটা নতুন ঘোড়া কিনেছি। তাকে সায়েস্তা করতে হবে—তাই গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছি।'

ইহার পরও কয়দিন রাখালদাসের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। কথাবার্তা কি হয়েছিল তাহা আজ আর মনে নাই। কিন্তু তাঁহার বাবুয়ানি পোশাকের স্মৃতিটিই মনে আছে।

তারপর একদিন কলিকাতার সিনেট হাউসে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা। সেখানে ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা দুইজনেই আজ পরলোকে। সুতরাং কি ঘটনাচক্রে সেখানে দেখা—সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রসঙ্গ বিশেষ কোন কারণে আমি সবিস্তারে বর্ণনা করিতে চাই না। মোটের উপর সেদিন আমরা তিনজনে ভারতের

প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিযাছিলাম। তখন এ বিষযেব চর্চা খুব বেশী ছিল না—আলোচনা কবার লোকও বেশী ছিল না। সুতরাং আমাদেব তিন জনেরই এই বিষযে আগ্রহ থাকায, আলোচনা খুব জমিযা উঠিল। তাহাব পবও বাখালদাসেব সঙ্গে কযেকদিন দেখাশোনা ও নানা আলোচনাব মধ্য দিযা আমাদের পবিচয় আরও নিবিড ও ঘনিষ্ঠ হইযা ওঠে।

ইহার পর সরকারী চাকুরি পাইয়া আমি ঢাকায চলিয়া গেলাম। ঢাকায ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ ছিল। আমার উপর ভার ছিল সেই শিক্ষকদের ইতিহাস শিক্ষা দেওযা এবং কি ভাবে ইতিহাস পডাইতে হইবে তাহাই শিক্ষা দেওযা। এ কাজ আমার ভাল লাগিত না। আমি অবসর মত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে পডাশোনা করিতাম।

এই সময রাখালদাসের প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস প্রকাশিত হইল। ঢাকাতে তখন 'প্রতিভা' নামে একখানি মাসিকপত্র ছিল। সম্পাদক ছিলেন অবিনাশ মজুমদার। তিনি এই গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমার উপর দিলেন। মনের মত একটা কাজ পাইযা খুব উৎসাহে এই বই পডিতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, পরের ভুল ধরিবার প্রবৃত্তিটা খুবই প্রবল। রাখালদাসের বাঙ্গালার ইতিহাস খুব মনোযোগ দিয়া পডিলাম এবং অনেকগুলি ভুল বাহির করিলাম। যতদূর মনে পডে 'প্রতিভা' পত্রিকার পর পর দুই কি তিন সংখ্যায় আমার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইল। রাখালবাবু তখন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সুতরাং আমার প্রত্যেক উক্তিটির স্বপক্ষে যথাসাধ্য যুক্তি ও নজির দেখাইলাম। ওই কারণেই সমালোচনা সুদীর্ঘ হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকের প্রশংসাও করিযাছিলাম এবং খুব বিনয সহকারেই ভুলত্রুটিগুলির উল্লেখ করিযাছিলাম।

সমালোচনা প্রকাশিত হইবার পর ভয হইল যে রাখালবাবু হয়ত আমার উপর খুব রাগ করিবেন। ভরসার মধ্যে ছিল এই যে ইহার পূর্বে রাখালবাবুব সঙ্গে যে অল্প আলাপ আলোচনা হইযাছিল তাহাতে আমরা দুইজনেই ঐতিহাসিক মতামত প্রকাশেব ব্যাপারে নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও স্বাধীন আলোচনাব প্রযোজনীয়তা স্বীকাব কবিয়াছিলাম। কিন্তু তবু ভয় একেবারে ঘুচিল না।

মনের এই অবস্থা লইযাই ছুটি উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলাম। কযেকদিন পরেই সুহৃদ্বর শ্রীকালিদাস নাগের সঙ্গে দেখা। রাখালদাসের সম্বন্ধে আমাব যে স্মৃতি তাহার সহিত কালিদাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জডিত। এই জন্য তাঁহাব সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানেই বলিয়া রাখি। কালিদাস নাগ আমার চেযে বযসে কিছু ছোট। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ অনুরাগ থাকায আমার ও রাখালদাসের সঙ্গে তাঁহার পবিচয। ক্রমে এই পরিচয় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পবিণত হয। কালিদাস ছিলেন মিষ্টভাষী, বিনযনম্র স্বভাবের লোক—পরবর্তীকালে রাখালবাবুর সঙ্গে কাহারও কলহ হইলে মিটাইবার

জন্য আমরা তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতাম। রাখালদাসও কালিদাসকে খুব স্নেহ করিতেন। কালিদাস আমার ভবানীপুর বাসার কাছেই থাকিতেন। তাঁহার বাসস্থান ছিল আলিপুরের চিড়িয়াখানা। পাছে কেহ ইহার অসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন সেইজন্য বলিয়া রাখা ভাল যে কালিদাসের মামা ছিলেন চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ এবং ইহার মধ্যে তাঁহার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাসভবন ছিল। কালিদাস নাগ সেখানেই থাকিতেন।

কালিদাস নাগের কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তাঁহার সহিত রাখালদাসের কি কথাবার্তা হইয়াছিল জানি না। কালিদাস খুব প্রফুল্ল মুখে আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে রাখালদাস সমালোচনা পড়িয়া রাগ করেন নাই বরং তাঁহার বহু ভুলত্রুটি দেখাইবার জন্য তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কালিদাস বলিলেন যে ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিজে তাঁহার নূতন বই 'প্রাচীন মুদ্রা'র পাণ্ডুলিপি আমাকে দিবেন এবং আমি উহার ভুলত্রুটি যত দেখাইতে পারিব তিনি ততই খুশী হইবেন।

আমার বুকের মধ্য হইতে একটা গুরুতর ভার নামিয়া গেল। সত্য সত্যই রাখালবাবু নিজে আসিয়া ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে রাখিয়া গেলেন এবং আমিও বিশেষ মনোযোগের সহিত উহা পড়িয়া আমার মন্তব্য সহ তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, রাখালবাবুর লেখায় এত ভুলচুক কেন থাকিত—যদিও ইহা তখন জানিতাম না, পরে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম।

রাখালবাবু ছিলেন খুব আয়েষী লোক। নিজের হাতে প্রায় কিছুই করিতেন না। চাকরে জামাকাপড় পরাইয়া দিত, জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিত। খাওয়ার পরে আর একজনে হাতে জল ঢালিয়া না দিলে তিনি মুখ ধুইতে পারিতেন না। লেখার বেলায়ও তাই। অফিস হইতে ফিরিবার সময় তাঁহার টাইপিস্ট ভূদেববাবুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি ফিরিতেন। জলযোগান্তে এক আরাম কেদারায় শুইয়া তিনি গড়গড়ায় তামাক টানিতেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিয়া যাইতেন আর ভূদেববাবু লিখিয়া লইতেন। কঠিন শব্দ হইলে রাখালদাস বানান করিয়া বলিতেন। তাঁহার ইতিহাস, উপন্যাস সবই যে এইভাবে লেখা, রাখালবাবু নিজেই তাহা আমাকে বলেন। পরে দুই একবার এই দৃশ্য নিজেও দেখিয়াছি। এইভাবে লেখায় যে অনেক ভুলচুক থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। এই লেখা দেখিয়া সংশোধন করিবার লোকও তখন বিশেষ মিলিত না। সুতরাং এই সংশোধন ব্যাপারের মধ্য দিয়াই আমার সঙ্গে রাখালবাবুর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল।

১৯১৪ সালে আমি ঢাকার চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দিই। ইহার পর তিন চার বৎসর রাখালবাবুও কলিকাতায় ছিলেন। সুতরাং পূর্বেকার ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তখন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা চর্চা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে আট দশ জনকে লইয়া একটি বিশিষ্ট মণ্ডলী গঠিত হইল। এই দলটি ধীরে ধীরে আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। রীতিমত কোন সভা করিয়া বা নিয়মাবলী তৈরি

করিয়া ইহার সৃষ্টি হয় নাই। ইহার পর চল্লিশ বৎসরেরও বেশী কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেকটা অস্পষ্ট হইলেও এই দলের স্মৃতিটি এখনও মনে জাগিয়া আছে। রাখালবাবুর বাড়িতেই এই দলের বেশি বৈঠক বসিত, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া দলের অন্য কয়েকজনের বাড়িতেও আমরা মিলিত হইতাম। দলের মধ্যে ছিলেন ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায়, তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সুরেন্দ্রনাথ কুমার, রাখালবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামদাস সেনের পুত্র বোধিসত্ত্ব সেন কালিদাস নাগ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি। হেমবাবু ছিলেন রাখালবাবুর আন্তরিক সুহৃদ্ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল এবং এই জন্যই পুত্র চারুচন্দ্রকে উক্ত ইতিহাস পড়াইয়াছিলেন। ননীগোপাল মজুমদারও কিছুদিন পরে এই দলে ভর্তি হইয়াছিলেন, তিনি তখন সংস্কৃত কলেজে আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। রাখালবাবুর বাড়িতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। রাখালবাবু তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন—একজন budding Archaeologist. রাখালবাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

রমাপ্রসাদ চন্দ কলিকাতায় আসিলে মাঝে মাঝে এই দলের বৈঠকে যোগ দিতেন। আরও কয়েকজন মাঝে মাঝে আসিতেন। কথা-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি প্রথমে রাখালবাবুর বাড়িতেই দেখি। তখন তিনি কেবল রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। আর দুইজন লোকও এই দলের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। একজন রাখালবাবুর অফিসের স্টেনোগ্রাফার ভূদেববাবু, আর একজন সাহিত্য পরিষদের রামকমলবাবু।

সিমলা স্ট্রীটে রাখালবাবুর বাড়িতে বহু সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হইয়াছি। মিষ্টান্নের ব্যবস্থা যে প্রচুর পরিমাণে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। রাখালবাবু লোককে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন এবং তাহার জন্য ব্যবস্থাও করিতেন রাজসিক ভাবেই। ইহার বহু দৃষ্টান্ত এখনও মনে আছে। রাজসিক জলযোগ ছাড়াও মাঝে মাঝে রীতিমত নৈশভোজের ব্যবস্থা থাকিত।

এই বিবরণ হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে ভূরি ভোজনই এই দলটির একমাত্র কার্য্য ও কাম্য ছিল। বস্তুত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সকলেরই একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল এবং তাহার জন্য কিছু কিছু গঠনমূলক কার্যও আমরা করিয়াছি। এ বিষয়ে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি ইহার কর্ণধার। পরিষদের সংলগ্ন 'রমেশ-ভবনে' একটি চিত্রশালা এখন মূল্যবান্ সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু তখন যে সমুদয় প্রাচীন মূর্তি ও মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার কোন তালিকা বা বিবরণ ছিল না। এইটি

সংস্কারের ভার ত্রিবেদী মহাশয় রাখালবাবুর হাতে দিলেন। রাখালবাবুও আমাদের কয়েক জনকে লইয়া মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলেন। প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তিগুলি কাল ও শ্রেণী অনুসারে সাজাইয়া তাহার যথাযথ তালিকা ও বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিষয়ে রাখালবাবুই ছিলেন আমাদের নেতা। তাঁহার উপদেশ ও নির্দেশ মতই আমরা চলিতাম। পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যও আমাদের সহায়তা করিতেন।

কিন্তু ক্রমে একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইল। তখনকার দিনে একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস চর্চার ধার ধারিতেন না। কিম্বদন্তী, কুলশাস্ত্র প্রভৃতির প্রতি তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ইহাদের সাহায্যে তাঁহারা অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিত সমাজে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বেশ অর্থও উপার্জন করিতেন। এইরূপ ঐতিহাসিকেরা কিরূপ প্রণালীতে বড়লোক বশ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একদিন বড়লাট লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। বলা বাহুল্য এই সম্পর্কে অনেক নামজাদা লোকেরও সমাগম হইয়াছিল। আমার উপর ভার ছিল, মূর্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার।

লর্ড কারমাইকেল কিছু কিছু ব্যাখ্যা শুনিয়া অন্যদিকে গেলেন।

একটু পরেই রাধাচরণ পাল আসিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পালের পুত্র ও কলিকাতা পৌরসভার একজন প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। আমি কিছু বলিবার আগেই একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক তাঁহাকে বলিলেন, "এই দেখুন আপনার পূর্ব-পুরুষের কীর্তি।" অর্থাৎ বাংলার পাল সম্রাটেরা রাধাচরণ পালের পূর্ব-পুরুষ, যেহেতু উভয়েরই উপাধি 'পাল'। সুতরাং পালযুগের মূর্তি প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন রাধাচরণ পালের পূর্ব-পুরুষেরই কীর্তি।

পাল মহাশয় শুনিয়া ত মহা খুশি। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ঐতিহাসিক তখনকার ধনী ও সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের (নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পিতা) বাড়িতে উপস্থিত। ঐতিহাসিক বলিলেন—"এইবার আপনাদের প্রাচীন বংশের সন্ধান মিলেছে। আপনার পূর্ব-পুরুষেরা যে কত বড় রাজা ছিলেন এতদিনে তা' টের পাওয়া গেল।" এই ঐতিহাসিক বহু কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং আদিশূর সম্বন্ধে বহু তথ্য জাহির করেন। যখন নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে তাঁহার কোন তথ্য ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইত তখন তিনি অমনি আর একখানি কুলশাস্ত্র আবিষ্কার করিতেন—তাহাতে ঐ নূতন তথ্যটি যথাযথভাবে লিখিত থাকিত। অনেকেরই সন্দেহ ছিল যে কুলশাস্ত্রের পুঁথি জাল হইত। নূতন লেখা পুঁথিকে কি প্রণালীতে অতি প্রাচীন জীর্ণশীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথিতে পরিণত করা যায় একবার এক ভদ্রলোক তাহা আমার নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি এরূপ বহু পুঁথি জাল করিয়াছেন।

রাখালবাবু ইতিহাসের এই কদর্য কলঙ্ককে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

আমাদেব দলের মধ্যেও এ বিষযে খুব উৎসাহেব সঞ্চাব হয। কিন্তু যে প্রাচীন ঐতিহাসিক এই দোষে বিশেষভাবে দোষী বলিযা বাখালবাবু তাঁহাদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবেন তাঁহাবা তখন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সাহিত্য পবিষদে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতিও তাঁহাদেব পক্ষে। সুতবাং প্রথমে বাদানুবাদ ও পবে তুমুল কলহ আবম্ভ হইল। সেই দিনকাব সে সব বাক্‌বিতণ্ডা কিরূপ তাণ্ডবে পর্যবসিত হইযাছিল এবং বন্ধুবিচ্ছেদ ও সাহিত্য পবিষদেব ভিত্তি শিথিল কবিবাব উপক্রম কবিযাছিল তাহা আজ সবিস্তাবে উল্লেখ কবিবাব প্রযোজন নাই। মোটেব উপর বাখালবাবুব ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব দলেব উপব সাহিত্য পবিষদের কর্মকর্তাবা বিষম চটিয়া গেলেন। আমবাও কিছুদিন পরিষৎ হইতে দূবে বহিলাম।

এই সংঘর্ষেব ফলে একদিকে যেমন পবিষদেব প্রধান নাযকেবা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন অন্যদিকে তেমনি বাজসাহীর ববেন্দ্র পবিষদেব দল আমাদেব সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই দলেব তিনজন কর্ণধাব ছিলেন—অক্ষযকুমাব মৈত্রেয, শবৎকুমাব বায ও রমাপ্রসাদ চন্দ। পরে বাধাগোবিন্দ বসাকও এই দলে যোগ দেন। কোন ব্যক্তিগত কাবণে বাখালবাবুব ও এই দলের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু কুলশাস্ত্রেব জালিযাতিব বিরুদ্ধে যখন বাখালবাবুব নাযকতায আমাদেব সঙ্গে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব গোলযোগ বেশ তীব্র আকাব ধাবণ করিযাছে তখন আমাদেব সঙ্গে ইঁহাদেব মিলন ঘটিল। একজন প্রবীণ ও প্রাচীন ঐতিহাসিকেব বিরুদ্ধে গোপনে একটি ষড়যন্ত্র হইল। তিনি একখানি কুলশাস্ত্রেব একটি কি দুইটি শ্লোকেব সাহায্যে একটা খুব বড বকম তথ্যেব আবিষ্কাব কবেন। যখন তাঁহাকে ঐ পুঁথি দেখাইতে বলা হইল, তিনি জবাব দিলেন যে নডাইলের নিকটবর্তী একটি দুরধিগম্য গ্রামে ঐ পুঁথি আছে—কিন্তু পুঁথিব মালিক (এক বিধবা ব্রাহ্মণী তাহা কিছুতেই হাতছাডা কবিবেন না। ববেন্দ্র সমিতি তাঁহাদেব এক পণ্ডিতকে পাঠাইযা ঐ পুঁথি হইতে প্রযোজনীয অংশ নকল কবিযা আনিলেন। দেখা গেল যে পূর্বেব উপরের শ্লোকগুলি ঠিকই আছে, কিন্তু যে শ্লোকেব উপর নির্ভব কবিযা পূর্বোক্ত প্রবীণ ঐতিহাসিক এক অভিনব মৌলিক তথ্যেব আবিষ্কাব ঘোষণা কবিযাছিলেন তাহাব কোন সন্ধানই মিলিল না। আমবা ইহা গোপন বাখিযা পবিষদেব কর্তৃপক্ষকে বলিলাম যে, প্রকাশ্য এক সভায এই বিষযে আলোচনা কবা হউক। প্রবীণ ঐতিহাসিক সম্মত হইলেন। সভার দিনও নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু কার্যকালে ঐতিহাসিক মহাশয বেমালুম গা ঢাকা দিলেন। এই রূপে বিনা যুদ্ধেই আমাদেব জয হইল।

এই সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিভাগেব অধ্যক্ষ পণ্ডিত স্পুনাব পাটনাব খননকার্য করিতেছিলেন। তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে পাটনাব ধ্বংসাবশেষ আলোচনা কবিযা সিদ্ধান্ত কবিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আবম্ভ কবিযা ভাবতে জবথুস্ত্রীয ধর্মাবলম্বী পাবসীক (অথবা ইরাণীয) সভ্যতাই ভারতে প্রবল ছিল—এমন কি গৌতম বুদ্ধও ইবাণীয ছিলেন ইত্যাদি।

সুতরাং ভারতে ঐ যুগকে জরথুস্ত্রীয় যুগ বলাই সঙ্গত। রাখালবাবু তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করেন। সুতরাং আমাদের দল হইতে প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করা সঙ্গত হইবে না। সেইজন্য 'Nimrod' (নিমরোদ) এই বেনামীতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তখন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল দুইজনেই কলিকাতায় ছিলেন। দুই জনেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু কতকগুলি কারণে রাখালবাবুর সহিত ভাণ্ডারকরের বিষম মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা যে কত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাতে তাহা টের পাইলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি ভূরিভোজের ব্যবস্থাটা বরাবরই আমাদের দলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ রাখালবাবুই ইহার ব্যবস্থা করিতেন। একবার আমার বাড়িতে সকলের নৈশভোজনের ব্যবস্থা হইল। আমি ভাণ্ডারকরকেও নিমন্ত্রণ করিলাম। যথাসময়ে সকলেই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাখালবাবু আসিয়া যেই শুনিলেন যে ভাণ্ডারকরকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে অমনি বলিলেন ভাণ্ডারকর আসিলে তিনি আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করিবেন না। বন্ধুরা সকলেই বুঝাইলেন—কিন্তু রাখালবাবু কিছুতেই গোঁ ছাড়িলেন না। আমার তখনকার অবস্থা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। আমি অগত্যা হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের শরণাপন্ন হইলাম। আমাদের দলের মধ্যে তিনিই রাখালবাবুর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহাকেই রাখালবাবু কিছুটা সমীহ করিতেন—ইহা আমি জানিতাম। সুতরাং তাঁহাকে বলিলাম যেভাবেই হউক আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আমি তখন ভবানীপুরে থাকিতাম। যে কোন মুহূর্তে ভাণ্ডারকর আসিতে পারেন—তাহা হইলে একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হইবে। হেমবাবু রাখালবাবুকে লইয়া বাহির হইয়া হরিশ মুখার্জী রোডে গেলেন। সেখানে অনেক রকম বুঝাইলেন এবং সর্বশেষে বলিলেন যে রাখালবাবু যদি আমাকে এইরূপ অপদস্থ করেন তবে তিনি আর কখনও তাঁহার বাড়িতে জলগ্রহণ করিবেন না। যাহা হউক কোন রকমে তিনি রাখালবাবুকে রাজি করাইয়া সঙ্গে নিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ভাণ্ডারকর আসিয়া রাখালবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা বলিলাম, তিনি এখনও আসেন নাই। একটু পরেই হেমবাবু ও রাখালবাবু ফিরিলেন। আশ্চর্যের বিষয় রাখালবাবু এমন স্বাভাবিকভাবে ভাণ্ডারকরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন যেন উভয়ের মধ্যে কোন গোলমালই নাই। তারপর খুব আনন্দের মধ্যে আহার-পর্ব শেষ হইল। যতীন রায় ২৯টি হাঁসের ডিম খাইলেন (তখনও বাড়িতে মুরগীর ডিম চালু হয় নাই)। হেমবাবু দেড় সের দই খাইলেন। এই রকম এক একটি আহার্য বিষয়ে এক একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইহা আমাদের সকলের জানা ছিল। রাখালবাবুর বাড়ির খাওয়াতেই তাহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম। কে কোন্ জিনিস কত বেশি খায়

রাখালবাবুর তাহা মুখস্থ ছিল এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা থাকিত। এই জন্য আমাদের কাহারও বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকিলেও খুব অসুবিধা হইত না।

রাখালবাবু যে কেবলই বাড়িতেই খাওয়াইতেন তাহা নহে। বেল-পথে ভ্রমণের সময়েও এদিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একবার পাটনায় কোন সম্মেলন উপলক্ষে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। রাত্রে খাওয়ার পরে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পৌঁছিয়া জয়সোয়ালের বাড়িতে উঠিব এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং সঙ্গে খাবার লইবার কোন ঝঞ্ঝাটের বালাই ছিল না। হাওড়ায় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় রাখালবাবু, আমি, যতীন রায়, রামকমলবাবু ও আর একজন এবং পার্শ্বের কামরায় আরও দুই তিন জন ছিলেন। রাখালবাবুর সঙ্গে দেখিলাম দুইটি বড় ঢাকা ডেক্‌চি। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার মধ্যে কি? তিনি বলিলেন—ও জয়সোয়ালের জন্য কিছু মিঠাই। রাত্রে উপরের বাঙ্কে ঘুমাইয়া আছি, অকস্মাৎ রাখালবাবুর চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। আমার উদ্দেশ্যে কয়েকটি অশ্লীল সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই যে ডেক্‌চিতে আড়াই সের মাংসের কোপ্তা ছিল—যতীন রায় টের পাইয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে—পরে আরও দুই একজন যোগ দিয়াছে এবং ডেক্‌চি খালি হইতে বেশি দেরি নাই, সুতরাং তাড়াতাড়ি আমি যদি নামিয়া না আসি তবে আমার ভাগ্যে পড়িবে শূন্য। নামিয়া দেখিলাম, তখনও মহানন্দে ভোজন-পর্ব চলিতেছে। আমিও যোগ দিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই বৃহৎ ডেক্‌চি একেবারে খালি হইল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম। তখন রাত্রি দুইটা।

পরদিন দুপুরে জয়সোয়ালের বাড়িতে খাইতে বসিয়া এত বেশি খাওয়া আরম্ভ হইল যে দেখিতে দেখিতে ভাত, রুটি সব শেষ হইয়া গেল। ভয়ে জয়শোয়াল বেচারা মহা লজ্জিত হইল। কিন্তু রাত্রে ডবল বন্দোবস্ত হইল এবং বহু খাবার নষ্ট হইল।

এই প্রসঙ্গে পুণায় নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য সম্মিলনীর (All India Oriental Conference) প্রথম অধিবেশনের কথা মনে পড়িতেছে। রাখালবাবু তখন পুণায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা। কিন্তু কোন কারণে তিনি সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়া করিয়া অধিবেশনে যোগদান না করিয়া পুণার বাহিরে চলিয়া গেলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আমরা অনেকে এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলাম। আমরা ডেলিগেটদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা ছিল খুব খারাপ। প্রথম দিন আমাদের পেটই ভরিল না। প্রৌঢ় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, অন্য কোন ব্যবস্থা না করিলে তো আর প্রাণ বাঁচে না। আমি (এবং আর একজনও আমার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু কে, তাহা ঠিক মনে নাই) রাখালবাবুর বাড়ির সন্ধানে চলিলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। চাকর বলিল, বাবু বাড়ি নাই। তাহা জানিতাম—সুতরাং

রাখালবাবুর বড় ছেলে তুলসীকে (তখন ছেলেমানুষ—সে অল্প দিন পরেই মারা যায়) বলিলাম—'তোমার মাকে বল দরজার আড়ালে দাঁড়াতে—অনেক কথা আছে।' রাখাল বাবুর স্ত্রী আমাদের দলের সকলকেই বেশ জানিতেন। কিন্তু কখনও আমাদের সামনে আসিতেন না। তিনি দরজার ওপাশে আসিয়া দাঁড়াইবার পর আমি তাঁহাকে সব অবস্থা খুলিয়া বলিলাম এবং পরদিন দুপুরে তাঁহার ওখানে খাইতে আসিব তাঁহাও জানাইলাম।

ছেলের মারফৎ তিনি জানাইলেন যে সেই রাত্রেই যেন আমরা তাঁহাদের বাড়িতে খাই। আমি বলিলাম—তাহাতে অনেক অসুবিধা হইবে। পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলাম।

পরদিন খুব ভোরে, তখনও আমাদের ভাল করিয়া ঘুম ভাঙে নাই, আমরা বিছানায় শুইয়া আছি। দরজায় দুমদাম শব্দ আর অশ্রাব্য গালাগালি। ব্যাপার বুঝিতে দেরি হইল না। দরজা খুলিয়া দেখি স্বয়ং রাখালবাবু। তিনি সম্ভবতঃ পুণার কাছেই কোথাও ছিলেন—আমাদের খবর পাইয়াই রাতারাতি ফিরিয়াছেন। তাহার পর রোজ তাঁহার বাড়িতে ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা। অধিবেশন শেষ হইবার পরও আমাকে কয়েক দিন তাঁহার বাড়িতে থাকিতে হইল। তিনি কিছুতেই আসিতে দিলেন না।

আমি পুণার কাছাকাছি অনেক ঐতিহাসিক স্থান এমন কি শিবাজীর দুই একটি দুর্গও দেখিবার সুযোগ পাইলাম। ওদিকে বোম্বাই হইতে মাছ ও টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতা হইতে মিষ্টান্ন আনিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

পুরাতত্ত্বের প্রতি রাখালবাবুর একটি সহজাত আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল। একদিন কলিকাতায় জাদুঘরে তাঁহার অফিস ঘরে গিয়া দেখি দেয়ালে একটি ছোট প্রাচীন লেখের প্রতিলিপি টাঙানো। আর রাখালবাবু গভীর অভিনিবেশ সহকারে সেটা দেখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন যে এই লিপিটি তক্ষশিলায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অক্ষরগুলি অপরিচিত—প্রাচীন ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী নয়। পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির নমুনা পাইলে হয়ত পড়িতে পারিতাম। কিন্তু যে সব বইয়ে এই সব অক্ষরের নমুনা আছে তাহার অনেক বই-ই এখানে পাওয়া যায় না। কদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই। রাখালবাবুর অনুমান খুবই ঠিক ছিল। কারণ এই লিপিটি আরামীয় অক্ষরে লেখা অশোকের লিপি। কিছুদিন পরে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার করেন। প্রয়োজনীয় বইগুলি এদেশে পাওয়া গেলে রাখালবাবুই হয় ত ইহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন।

মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল প্রাচীন চিত্রলিপিযুক্ত সীল বা মুদ্রা এবং অন্যান্য জিনিস পাওয়া গিয়াছিল এদেশে উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে তাহার প্রাচীনত্ব এবং পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধের কথা রাখালবাবু সঠিক ধরিতে পারেন নাই। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংস আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁহারই এবং ইহার জন্য

প্রত্নতত্ত্ব জগতে তাঁহাব নাম চিবস্মবণীয হইযা থাকিবে। কিন্তু ইহার যথাযথ প্রকৃতি নির্ধাবণ কবিবার গৌরবও বিদেশী পণ্ডিতেবাই অর্জন করিযাছেন। আমার বেশ মনে আছে কলিকাতাব বাড়িতে বসিযা বাখালবাবু আমাকে ইহাব কতকগুলি নিদর্শন দেখাইযা বলিযাছিলেন যে এ যাবৎ ভাবতে প্রাচীন যুগেব যে সব নিদর্শন বাহিব হইযাছে এগুলি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং অনেক বেশি প্রাচীন। কিন্তু প্রথমে ইহাব বেশি আর তিনি অগ্রসব হইতে পারেন নাই।

রাখালবাবু কিভাবে মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কাব কার্যে ব্রতী হন সে সম্বন্ধে তাঁহাব নিকট যাহা শুনিযাছি তাহাই লিখিতেছি। বিশেষ কাবণে কিছু কিছু বাদ দিযা লিখিতে হইতেছে। কারণ এই কাহিনীব দুইজন প্রধান নায়কই আজ পরলোকগত এবং আমার বিশেষ বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ঘটনাটা একটু গোড়া হইতেই আবম্ভ কবিতে হয। পূর্বেই বলিযাছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডাবকব ও রাখালবাবুব মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য ছিল। কি কারণে ইহার আরম্ভ হয সঠিক বলিতে পারি না। 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' পত্রিকায কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয ও ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওযায উভযেব মধ্যে অসদ্ভাব বাড়িযা ওঠে। 'কাশিমের মার্কা' নামক প্রবন্ধ ইহাব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগেব একখানি প্রস্তর-দ্রব্যে কযেকটি অক্ষর দেখিযা ভাণ্ডারকব অনুমান করিযাছিলেন এগুলি অতি প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরের নিদর্শন। কিন্তু ঐ লেখাটি বস্তুতঃ জাদুঘবেব কর্মচারী 'কাশিম' নামক একজনের খোদিত একটি ইংরেজী তারিখ উল্টা করিযা ধবিযা পড়িবাব ফলেই বিপত্তি ঘটিযাছিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিযা ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয এবং তাঁহাকে শিক্ষিত সমাজে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টাব কোন ত্রুটি হয নাই। বাখালবাবু নিজেব নামে কিছু লিখিতেন না বটে, কিন্তু এই লেখাগুলি যে তাঁহারই প্রেরণা ও চক্রান্তের ফল, এ সম্বন্ধে ভাণ্ডাবকবেব মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আমাবও এ বিষযে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষযে আমাব কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। কারণ রাখালবাবু এক বিষযে খুব উদার ছিলেন। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে কাজ করি সুতরাং এই সমুদয ব্যাপারে আমার কোন প্রকার যোগাযোগ থাকিলে আমার ক্ষতি হওযার সম্ভাবনা। এই জন্য রাখালবাবু বিশ্ববিদ্যালয সম্পর্কিত কোন ব্যাপাবে আমাকে দলে টানিতেন না এবং যাহাতে আমাব নাম কোন রকমে ইহার সহিত জড়িত না হয তাহাব সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। আমিও এই সমুদয ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে অনিচ্ছুক ছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল প্রকার আলোচনা ও ষড়যন্ত্র হইতে দূরে থাকিতাম। কিন্তু তথাপি বন্ধু-বান্ধবদের নিকট যেটুকু শুনিয়াছি তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে ভাণ্ডাবকরের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের

পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণের মূলে ছিলেন রাখালবাবু। 'কাশিমের মার্কা' প্রবন্ধ বাহির হইবার পূর্বেই রাখালবাবুর মুখে কাশিমের গল্প শুনিয়াছিলাম এবং তিনি ভিন্ন জাদুঘরের এই সকল পুরনো কথা আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রাখালবাবুর সহিত ভাণ্ডারকরের যখন এই প্রকার অহিনকুল সম্বন্ধ তখন রাখালবাবু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিমচক্রের (Western Circle) অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া পুণায় গমন করেন। ভাণ্ডারকরের বাড়িও পুণায় এবং তিনিও রাখালবাবুর পূর্বে উক্ত পশ্চিমচক্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাখালবাবু পুণাতে যাইয়া ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু সন্ধান করিয়া বাহির করেন। ক্রমে তাঁহার অফিসের লোকেরা টের পাইল যে রাখালবাবু ভাণ্ডারকরের প্রতি বিশেষ বিরূপ। ইহার ফলে সর্বত্র যাহা হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। রাখালবাবুর অধীনস্থ কর্মচারীরা উপরিওয়ালাকে খুশি করিবার জন্য ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক রকম কুৎসা তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিল। একজন বলিল যে ভাণ্ডারকর যখন অধ্যক্ষ ছিলেন তখন সিন্ধু প্রদেশের একটি পুরাতন ধ্বংস সম্বন্ধে ভারত সরকার হইতে এক চিঠি আসে। তাহাতে নির্দেশ ছিল যে তিনি যেন উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া একটা রিপোর্ট দেন। কিন্তু ঐ ধ্বংসাবশেষ যেখানে, সেখানে যাওয়া এবং থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এত কষ্টকর ছিল যে ভাণ্ডারকর মূল ধ্বংসগুলি না দেখিয়াই লোকের মুখে খবর লইয়া একটা রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। রাখালবাবু এই খবর শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। ইহা সত্য হইলে যে ভাণ্ডারকরের মারণাস্ত্র তাঁহার হাতে আসিবে ইহা বুঝিতে তাঁহার দেরি হইল না। সুতরাং রাখালবাবু অবিলম্বে ঐ ধ্বংস দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাই বিখ্যাত মহেনজোদড়ো এবং এই ভাবেই ঘটনাচক্রে রাখালবাবু এই ধ্বংসস্তূপের আবিষ্কার করেন। স্থানটি যে খুব দুরধিগম্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাখালবাবু নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে কয়দিন তিনি কেবল উটের মাংস খাইয়াই ছিলেন।

ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত সংবাদপত্রের মারফৎ আন্দোলন এবং মহেনজোদড়ো অভিযান—এ দু'য়ের মধ্যেই ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার প্রকৃত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে একটি সতেজ প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির পরিচয়ও ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাখালদাসের স্বভাব ও চরিত্রের অনেক দোষ ছিল কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে মেকি জিনিস তিনি কোন দিনই সহ্য করেন নাই। তিনি বরাবরই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত কারণে এই প্রতিবাদ কখনও কখনও অসংযত ও রূঢ় আকার ধারণ করিলেও সেই সময়কার বাংলাদেশে এইরূপ নির্ভীক আলোচনার প্রয়োজন ছিল। বাংলা দেশের ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে তখন কিরূপ মেকি চলিত আজকালকার তরুণ ঐতিহাসিকেরা তাহার সঠিক ধারণা করিতে পারিবেন না। বাংলাদেশে পরবর্তী কালে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে

ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি যে অনেকাংশে উন্নতি লাভ করিয়াছে—তাহার মূলে রাখালবাবুর দান উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারে তাঁহার এই মনোবৃত্তির প্রথম পরিচয় পাই—সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে তার বহুদিনকার পরের আর একটি কথা লিখিতেছি।

কাশীপ্রসাদ জয়সোওয়ালের সহিত রাখালবাবুর ও আমাদের দলের কিরূপ সৌহার্দ্য ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণায়ও ব্যারিস্টারী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। অর্থাৎ তিনি একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে ঠিক করিয়া যে কোন প্রকারে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। স্বপক্ষের প্রমাণগুলি অতি রঞ্জিত ও বিপক্ষীয় প্রমাণগুলি কূটতর্কের সাহায্যে হেয় প্রতিপন্ন করিবার দিকে তিনি খুব যত্নশীল ছিলেন। কলিকাতার জাদুঘরে পাটনা হইতে সংগৃহীত দুইটি মূর্তি ছিল (সম্ভবতঃ এখনও আছে)। এগুলি মৌর্য যুগের যক্ষমূর্তি বলিয়াই পরিচিত ছিল। মূর্তিগুলির পিঠের উপর কয়েকটি অক্ষর খোদিত ছিল। জয়সোওয়াল তাহা পাঠ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে এ দুইটি শিশুনাগবংশীয় দুই রাজার মূর্তি। কিন্তু তাঁহার পাঠ ও লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কেহই বড় একটা গ্রাহ্য করিলেন না। রাখালবাবু প্রাচীন লিপি পাঠে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন—এ বিষয়ে তাঁহার মতামতের উপর সকলেরই বিশেষ আস্থা ছিল। জয়সোওয়াল তাঁহাকে ধরিলেন। কিন্তু তিনি বন্ধুর সঙ্গে একমত হইতে পারিলেন না।

একদিন জয়সোওয়াল আমাকে ও একজনকে (যতদূর মনে পড়ে কালিদাস নাগকে) সঙ্গে লইয়া জাদুঘরে গেলেন। খুব গোপনে তাঁহার মূল্যবান্ আবিষ্কারের কথা জানাইলেন। আমাকে ঐ অক্ষরগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ইহাতে যে শিশুনাগ-বংশীয় রাজার নাম পড়িয়াছেন তাহা ঠিক কিনা। অনেকক্ষণ দেখিয়া বলিলাম যে অক্ষরগুলি এত অস্পষ্ট যে নিশ্চিতরূপে কোন পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—তবে উহা যে অতি প্রাচীন তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। তারপর আমি বলিলাম যে এ বিষয়ে রাখালবাবুই বড় অভিজ্ঞ। তাঁহাকে দেখাইলেই তো সব গোল মিটিয়া যায়।

জয়সোওয়াল স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু না বলিলেও তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল যে রাখালবাবুর সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছে এবং তিনি একমত না হওয়াতেই জয়সোওয়াল আমাদিগকে স্বীয় দলভুক্ত করার চেষ্টায় ছিলেন।

পরে কয়েক বৎসর পর্যন্ত জয়সোওয়ালের এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক হয়। কিন্তু রাখালবাবু বন্ধুত্বের খাতিরে কখনও জয়সোওয়ালের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হাতীগুম্ফায় খারবেলের লিপি পাঠ সম্বন্ধেও রাখালবাবু জয়সোওয়ালের অনেক উদ্ভট মতের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাখালবাবু প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালেখ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।

শিল্পকলা বিষয়েও তাঁহার অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে। পূর্ব-ভারতে মধ্য-যুগের ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ এখনও পণ্ডিতগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া থাকে। শকাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত ও বহুল তথ্যপরিপূর্ণ প্রবন্ধ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রথমে সুধীসমাজে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে।

তিনি বহু প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন মুদ্রার যথাযথ বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। কেবল হিন্দু-যুগের নহে, মুসলমান-যুগের লিপি ও মুদ্রা বিষয়েও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাংলাভাষায় এই সকল বিষয় আলোচনা করা তাঁহার একটি বিশেষ কৃতিত্ব।

হিন্দু ও মুসলমান যুগের বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ভারতের প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধেও তিনি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যেও তাঁহার বহু দান আছে। পাষাণের কথা, শশাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ইতিহাসের মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

একদিকে তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও আয়েষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসংখ্য রচনাবলী ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য কঠোর শ্রমের বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা হয়।

প্রাচীন যুগের কোন চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে তাঁহার যেন একটা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। ঢাকা নর্থব্রুক হলের নিকটস্থ ডালবাজারের মন্দিরে চণ্ডীমূর্তি বহুকাল অবধি শহরের একটি জনবহুল স্থানে অবস্থিত। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ন্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক ঢাকাতেই বরাবর বাস করিয়াছেন এবং তিনিই রাখালবাবুকে ওখানে লইয়া যান। কিন্তু রাখালবাবু মাত্র কয়েক মিনিট দেখিয়াই উহার পাদপীঠে যে লক্ষ্মণ সেনের লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা আবিষ্কার করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করিবার সময় তিনি এরূপ বহু আবিষ্কার করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি নিজেই গল্প বলিয়াছেন যে অনেক সময় প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা বা ধ্বংসের অনুসন্ধানে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া গিয়াছেন। অথচ দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার বাবুগিরি দেখিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হইত। আমি যখন ঢাকায় ছিলাম তখন কয়েকবার তিনি সরকারী পরিদর্শনের কাজে ওখানে গিয়াছেন। বরাবরই তিনি আমার বাড়িতে উঠিতেন। প্রতিবারই সরকারী চাকর এবং তাঁহার গোয়াদেশীয় পাচক সঙ্গে নিতেন তাঁহার সঙ্গে মালের বিরাট লটবহর যাইত ক্যাম্পখাট, বন্দুক, ৫/৬ টা হ্যারিকেন, বিছানা বাক্স তৈজসপত্র প্রভৃতি এত যাইত যে গরুর গাড়ি ছাড়া তাহা লইয়া যাওয়া যাইত না। ইহার অধিকাংশ জিনিসই যেমন যাইত সেই অবস্থায়ই ফিরিয়া আসিত, প্যাক খুলিবারও দরকার হইত না।

আহারের পর তাঁহার হাতে চাকরে জল ঢালিয়া না দিলে চলিত না। প্যাণ্টালুনের বোতাম বা জুতার ফিতা তিনি নিজে লাগাইতে পারিতেন না, চাকরে লাগাইয়া দিত। অগুণতি কাপড়-চোপড় যাহা তাঁহার সঙ্গে আসিত সকলই চাকরের জিম্মায় থাকিত। তিনি উহার কোন খবরও রাখিতেন না। তিনি ঢাকা হইতে আশেপাশে নানা জায়গায় যাইতেন, বাহিরে রাত্রিবাস করিতেন না। তথাপি এরূপ সম্ভাবনা হইতে পারে মনে করিয়া পুরাপুরি ক্যাম্পের সরঞ্জাম লইয়া ঢাকায় আসিতেন। তাঁহার ধুতি-চাদর, গিলে-করা পাঞ্জাবী, কোট-প্যাণ্ট সবই বেশ মূল্যবান্ ছিল। তিনি কোঁচানো কাপড় পরিতেন। নচেৎ ধুতি পরিবার পর চাকরকে কোঁচা ঠিক করিয়া দিতে হইত। একবার নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় আমাদের কয়জনকে লইয়া নাটোরে গিয়াছিলেন। রাজবাড়িতে সকল ব্যবস্থাই রাজোচিত। যে কয়জন লোক ছিল, প্রতিদিন রাজবাড়ির পুকুর হইতে ততগুলি রোহিত মৎস্য ধরা হইত—যাহাতে প্রত্যেকের পাতে একটি করিয়া মাছের মুড়া দেওয়া যায়। এই অনুপাতে থাকা খাওয়া, শোওয়ার সকল ব্যবস্থা। একদিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন —আমাদের কাহারও কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা। রাখালবাবু বলিলেন—"মহারাজ, নিজ হাতে কাপড়ের কোঁচা ঠিক করিয়া দিতে পারি না—তাহাতেই একটু মুশকিলে পড়িয়াছি।"

রাখালবাবুর পিতা ধনী ছিলেন। রাখালবাবুও বাল্যকাল হইতেই বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হইয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি অর্থাভাবে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। আরও নানা-প্রকার অশান্তিও তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। নানা কারণে তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চাকুরি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু ঐ পদের মর্যাদা থাকিলেও বেতন খুব বেশি ছিল না। এই সমুদয় ছাড়াও ব্যক্তিগত অনেক কারণে তাঁহার শেষ জীবন খুব অশান্তিপূর্ণ ছিল। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যেও অনেকের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। রাখালবাবুর ঐতিহাসিক প্রতিভা তাঁহাকে চিরদিন কীর্তিমান্ করিয়া রাখিবে। কিন্তু বন্ধুবৎসল রাখালদাসের স্মৃতি আমার মত অল্প কয়েকজনের মনেই এখনও জাগরূক আছে। অদূর ভবিষ্যতে তাহা সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হইবে। সেই জন্যই পুরাতন স্মৃতি মন্থন করিয়া কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিলাম।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত এই স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রাখালদাসের নবতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। রাখালদাসের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, আলোকচিত্র, চিঠিপত্র, তাঁহার পুনার বাসভবনের ফটোগ্রাফ, তাঁহার লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং তাঁহার পত্নী কাঞ্চনমালা দেবীর রচনাবলীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বিভিন্ন রচনা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়।

—পরিষৎ-সম্পাদক।

রাখাল-স্মৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাখালদাসের কাছে আমি ভাইয়ের মত স্নেহ পেয়েছি। তাঁকে বড ভাইয়ের মতই দেখেছি এবং তিনি আমার সঙ্গে বহু বিষয়ে অগ্রজের মতই ব্যবহার করেছেন। নিজের কাজেও তাঁর কাছ থেকে আমি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে একটা বেদনা জাগে যে তিনি জীবনের সর্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে যেতে পারেননি—তাঁব আগ্রহ ছিল, বিশ্বাসও ছিল যে মহেন-জো-দডোর ভগ্নাবশেষের তিনি আবিষ্কার কবেন তার লিপির পাঠোদ্ধার তিনি করে যেতে পারবেন। এই সম্বন্ধে একটা ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত লাগে—তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, "ওরে, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ৪৭ বৎসর বয়সে পডেই আমি মহেন-জো-দড়োর মুদ্রার লিপি পডতে পারব।" তিনি ৪৫ বৎসর বয়সেই নিজের জীবনের আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে দেহরক্ষা করেন। যদি ইহলোকের আরব্ধ কাজের জের পরলোকেও চলে, তাহলে তাঁর সেই সাধনা, সেই প্রারব্ধ কর্ম আমাদের চোখের অন্তরালে পরলোকে সম্পূর্ণ হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে।

রাখালদাসের সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করতে আরম্ভ করে প্রথমেই একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাই যে এই প্রসঙ্গ ঠিকমত সন তারিখেব হিসেব ধরে করতে পারব না। রাখালদাসের সম্বন্ধে টুকরো-টাকরা ছোট-খাট অনেক কথা মনে জাগছে কিন্তু সময়ের হিসেব করে, পরম্পরা বজায় বেখে হয়ত সব বলতে পারব না। মানুষ রাখালের কথাটাই বেশির ভাগ মনের মধ্যে জাগছে, আর আমার কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক, গবেষক আর রসস্রষ্টা রাখালেব চেয়ে মানুষ রাখালই যেন বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কবে, কোন বছর রাখালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তা মনে নেই। খুঁজে হিসেব করে সেকথা বাব করতে হয়। তবে মনে হয় ইংরাজী ১৯১৬ কি ১৯১৭ সালের দিকে কোন সময়ে। তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্ণধার, বোধ হয় সভাপতি ছিলেন। আমি সে-সময় সাহিত্য পরিষদের কাজে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছি। তখন আমাকে বোধহয় ছাত্র-সভ্যদের অধ্যক্ষ করা হয়েছিল। কোন প্রতিষ্ঠানে থেকে যতটুকু সাধ্য তাতে কাজ করে যাবার চেষ্টা করতুম, "ভাত খাই, কাঁসি বাজাই" নীতিতে দলাদলি থাকলে যথাসম্ভব তা এডিয়ে চলবার চেষ্টা করতুম। ঐ সময় দেখেছিলুম যে পরিষদের নীতি আর পরিচালনা নিয়ে প্রবীণে আর নবীনে একটা মতানৈক্য আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলেন প্রবীণের দলে,

শাস্ত্রীমশাইকে কেন্দ্র করে। নবীনের দলে ছিলেন রাখালদাস, স্বনামধন্য অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষানেতা ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বহরমপুরের ৺বোধিসত্ত্ব সেন, কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক সুরেন্দ্রনাথ কুমার, অধ্যাপক ডাঃ সুশীলকুমার দে। এঁরা ছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাঃ যদুনাথ সরকারও নবীনের দলে ছিলেন। এ ছাড়াও দু'চার জন ছিলেন—তাঁদের নাম মনে পড়ছে না।

তবে সম্ভবতঃ নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঔপন্যাসিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তবে রাখালদাসের মত এঁরা ততটা সক্রিয় ভাব প্রকট করেন নি। আমি মোটামুটি ভাবে নবীনদের দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিলেও এই ব্যাপারে নিজের মানসিক রুচি অন্য রকম থাকায় তেমন বড় অংশ নিতে পারিনি। তারপরে ১৯১৯ সালে ডাঃ সুশীলকুমার দে আর আমি—দু'জনে ইউরোপে যাত্রা করি। সুশীলবাবু আমার মাস কয়েক আগে চলে যান। এই ইউরোপ-প্রবাসের জন্য তিন বৎসর রাখালের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু রাখালের প্রতি আমার মনে সাহিত্য পরিষদের দলাদলির অস্বস্তিকর ও ক্লিষ্ট পরিবেশের মধ্যেও একটা কেমন আকর্ষণ এসে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে নানাবিষয়ে এঁদের স্পষ্টবাদিতা—যা মনে হ'ত এঁরা সোজাসুজি বলতেন—ঢেকে ছেপে কথা কইতেন না। আর একটা জিনিস ছিল যে এঁদের ভাষার বাঁধন ছিল না—কথাবার্তা এবং রসিকতা ভাষার শ্লীল-অশ্লীলের ঊর্ধ্বে অতিক্রম করত। সেই কারণেই এঁদের কথাবার্তায় রসের উৎস উচ্ছ্বসিতভাবে দেখা দিত। অবশ্য সে রস ছিল শ্রেষ্ঠ রস—আদি রস—"রসানাম্ আদিঃ শ্রেষ্ঠঃ।" এ বিষয়ে রাখালদাসের সঙ্গে পাল্লা দিতেন বোধিসত্ত্ব—দু'জনেই মুর্শিদাবাদের এবং দু'জনেই বাল্যবন্ধু। অনুজকল্প আমরা একটু আলগোছে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতুম। রুচিবাগীশেরা হয়ত এই জন্য রাখাল ও তাঁর দলের ওপর চটতেন কিন্তু আমার মনে হয়ত একটু প্রচ্ছন্ন প্রাকৃতজনোচিত মনোভাব থাকার দরুণ কোন ক্ষোভ বা বিরাগের কারণ পেতুম না।

১৯১৯-২২ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে গুরুকুল বাস করে আমি ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে রাখালের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। তিনি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করতেন—প্রাণ দিয়ে তিনি নিজের কর্তব্য পালন করতেন—যা ছিল ব্যবসায় তাই হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে ব্যসন। এ রকম ইতিহাসের রসে মসগুল মানুষ আমি কখনও দেখিনি। তাঁর কাজের মধ্যে যেটা গবেষণার দিক—যে দিকে ছিল তথ্য আহরণ করা, আবিষ্কার করা আর তথ্যের ব্যাখ্যা করা প্রধান কাজ, সেদিকে তিনি ছিলেন অনবদ্য। আর তাঁর কাজের মধ্যে যেটা ছিল পরিকল্পনার দিক, বৈষয়িক দিক, শুনেছিলুম সেদিকে তাঁর কতকগুলি গলদ দেখা দিয়েছিল। সকলেই আমরা জানি যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে ধরাবাঁধা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা যায় না—তাঁদের একটু নিয়মের অবহেলা মেনে নিতেই হয়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন সার জন মার্শল এবং মার্শল সাহেব ছিলেন গুণজ্ঞ—তিনি গুণী এবং বিদ্বানের কদর ও সম্মান জানতেন। সেই জন্য শুনেছি রাখালের কতকগুলি আবিষ্কারের আর অন্য কাজে তিনি এত খুশি ছিলেন যে তাঁর কর্ম-বিভাগের বৈষয়িক দিকে রাখালের দোষত্রুটি তিনি উপেক্ষা করতেন—মার্জনা করতেন। সে সব ইতিহাস নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই কথার অবতারণার এই উদ্দেশ্য যে রাখালের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব এত উচ্চস্তরের ছিল যে অন্য কোন অসঙ্গতি সেখানে নাগাল পেত না।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় রাখাল অনেক নূতন কথা বলে গিয়েছেন। আর তাঁর গবেষণা যে এক একটা মনোগ্রাফ বা নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি প্রত্যেকটি মূল্যবান্। প্রাচীন তাম্রপট্ট ও শিলালেখের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার, প্রাচীন সংস্কৃত ফার্সি পুঁথিপুস্তক ঘেঁটে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাষণ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, শিল্পকলার কথা, এসব ত তাঁর নখদর্পণগত ছিল, ইতিহাসের উপাদানকে নিয়ে তিনি যেন ছিনিমিনি খেলতে পারতেন। তাঁর গুরু শাস্ত্রী মশাই যাকে "পাথুরে প্রমাণ" বলতেন, রাখালদাস ছিলেন সেই "পাথুরে প্রমাণ" প্রয়োগের ওস্তাদ। নীরস ইতিহাস হস্তামলকবৎ তাঁর করতলগত ছিল। এর চেয়েও বড় কথা—তিনি সেই ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাঁর প্রতিভা ছিল একাধারে ভাবয়িত্রী অর্থাৎ critical আর কারয়িত্রী অর্থাৎ creative। রাখালের কাছে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরেজ একপত্রী পণ্ডিত ভিনসেণ্ট স্মিথ-এর লেখা দেখেছিলুম—তিনি রাখালের লেখা "বাঙ্গালার ইতিহাস" বাঙ্গালা ভাষায় দেখে আফ্‌শোষ করেছিলেন যে তিনি বাঙ্গালা জানেন না বলে এই বই কাজে লাগাতে পারছেন না—কিন্তু তিনি মনে করেন যে এই বই পড়বার জন্যই বাঙ্গালা ভাষা শেখা যেতে পারে, তবে তিনি অনেক বুড়ো হয়ে পড়েছেন, নতুন করে বাঙ্গালা শেখা কাম্য হলেও তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। এই রকম উক্তি থেকেই রাখালের গবেষণা কার্য্য যা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ইংরেজীর মাধ্যমেই পড়েছিলেন তার সম্বন্ধে নিজের আস্থা জ্ঞাপন করেন। "বাঙ্গালার ইতিহাস" মোগলযুগের আরম্ভ পর্যন্ত যা তিনি দুই খণ্ডে প্রকাশ করে যান তা তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। এ ছাড়া তাঁর কতগুলি বড় বড় বই আছে।

তাঁর প্রাচীন বাঙ্গালার আর সেন যুগের শিল্প সম্বন্ধে বইখানি প্রকাশ করে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিজেদেরই গৌরব বর্ধন করেছেন। তাঁর "উড়িষ্যার ইতিহাস" সম্বন্ধে বিরাট বইখানি উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে একটা মার্জনীয় গর্ববোধ স্থাপিত করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি সিন্ধু প্রদেশে মহেন্‌-জো-দড়োর ভগ্নাবশেষের আবিষ্কার। আর এই আবিষ্কারের জন্য তাঁর নাম ভারতবর্ষে ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই আবিষ্কারকে revolutionary বা ক্রান্তিকারী বলা চলে। মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারের পূর্বে প্রাচীন ভারতের মানুষের হাতের কাজ, শিলালেখ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ওদিকে কিছু পাওয়া যায়নি। ভারতের ঐতিহাসিক যুগ—পাথুরে প্রমাণের যুগ ছিল মৌর্যযুগ থেকে। মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারের ফলে যেন এক লাফে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পাথুরে প্রমাণ চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে গিয়ে পৌঁছল।

রাখালদাসের মহেন-জো-দড়ো আবিষ্কার ঘটেছিল নিতান্ত আকস্মিক ভাবে—অনপেক্ষিত ভাবে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে গ্রীক ইতিহাসে তিনি পড়েছিলেন যে আলেকজন্দার ভারত আক্রমণ করে পূর্বপাঞ্জাবে এসে থেমে গেলেন। ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঢুকতে তিনি সাহস করলেন না। তার দু'টো কারণ ছিল—১. তাঁর সৈন্যরা বহুদিন ধরে দেশ ছেড়ে এসে বিদেশ-বিভুঁয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল—তারা আর নতুন অজানা দেশে যেতে অস্বীকার করলে, রণমুখো সেপাই হয়ে গেল ঘরমুখো। ২. তারপর আলেকজন্দার খবর পেলেন যে পূর্বভারতে প্রাচ্য বা 'Prosioi' জাতি বাস করে—যুদ্ধে তারা ছিল দুর্ধর্ষ আর তাদের সৈন্যও ছিল অজস্র। এই দুই কারণে তাঁর গঙ্গার দেশে আসা আর হ'ল না, তিনি ফিরে যাবার মতলব করলেন। যাবার আগে তিনি বিপাশা নদীর তীরে পাথরের বড় বড বারোটি বেদী তৈরী করলেন—তাঁর গ্রীক দেবতাদের উদ্দেশ্যে। তারপর তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব হয়ে, সিন্ধু প্রদেশ হয়ে ব্যাবিলনের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এখন রাখালের আগ্রহ হ'ল এই বিরাট বেদীগুলির তিনি ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করতে পারেন। সেইজন্য তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব থেকে মজা নদী সরস্বতীর খাদ ধরে, যে নদী 'বিনশন' অর্থাৎ রাজস্থানের মরুভূমিতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই নদীর খাদ ধরে সিন্ধু প্রদেশে এসে উপস্থিত হলেন। এইখানে লারকানা জেলায় সিন্ধু নদীর ধারে মহেন্-জো-দড়োর সুউচ্চ টিলা দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হ'ল এ জায়গা আগে কেউ খুঁড়ে দেখেনি। এখানে চাই কি নতুন কিছু পাওয়া যেতে পারে। তিনি খননকার্য্য আরম্ভ করলেন, আর তার পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে মহেন্-জো-দড়োর প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষের আবিষ্কার করলেন। রাখালদাস নিজের জ্ঞানগোচর মত এই ভগ্নাবশেষের বিভিন্ন স্তরের একটা তারিখ স্থির করলেন। এই আবিষ্কারের অনেক ফটো নিলেন আর যথারীতি সরকারীভাবে তাঁর প্রধান সার জন মার্শল (Sir John Marshall)-এর কাছে প্রতিবেদন পেশ করলেন। সার জন মার্শল এই আবিষ্কারের মূল্য তখনই বুঝতে পারলেন। ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসে প্রত্নবস্তু খ্রীষ্টপূর্ব সাত শ' আট শ'র ওদিকে যে কিছু ছিল তা' বহুকাল ধরে কেউ জানত না। কিন্তু এখন থেকে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে জর্মান প্রত্নতাত্ত্বিক Schliemann (শ্লীমান) এশিয়া মাইনর-এ প্রাচীন ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তাতে করে গ্রীকসভ্যতার আধার স্বরূপ আরও প্রাচীনতর একটি সভ্যতার স্তর সম্বন্ধে আমরা

প্রথম জানতে পারলুম। শ্লীমানের এই আবিষ্কার গ্রীকজাতির প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় যুগান্তর এনে দিলে। Mycenae (মাইসিনী) বা Mukenai (মুকেনাই) এবং Tiryns (তিরিন্‌স) নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। Crete (ক্রীট) দ্বীপে Knossos নগরের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সার আর্থার ইভান্‌স (Sir Arthur Evans) বার করলেন—গ্রীসের ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০/৮০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-এর দিকে পৌঁছে গেল। Schliemann-এর আবিষ্কারের মত রাখালদাসের মহেন্‌-জো-দড়ো আবিষ্কার এই রকম চমকপ্রদ ব্যাপার ছিল, Sir John Marshall Schliemann-এর সঙ্গে রাখালদাসের তুলনা করে ইউরোপে প্রচার করলেন। কিন্তু রাখালের হাত থেকে এই এতবড আবিষ্কারটা খনন কার্য্যের দ্বারা সম্পূর্ণ করবার ভার তিনি নিজেই নিলেন এবং রাখালদাসের প্রাথমিক কৃতিত্বের কথাটা একটু সংক্ষেপে নমো নমো করেই সেরে দিলেন। রাখালের যে আশা ছিল, এই আবিষ্কার নিজে সম্পূর্ণ করবেন, সেটার যোগাযোগ হ'ল না—তিনি পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতে বদলী হলেন। তবে সার জন মার্শল-এর মত লোকের হাতে পড়ায় মহেন-জো-দড়ো নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা আর গবেষণা সার্থক ভাবেই হয়েছিল। সার জন মার্শল বিরাট কয়েক খণ্ডে এই মহেন্‌-জো দড়োর প্রত্নকথা খুব পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিয়ম ছিল যে কর্তৃপক্ষের হুকুম না হলে কোনও অধস্তন কর্মচারী কোন আবিষ্কার বা গবেষণা তাঁর নিজের কৃতিত্ব হলেও প্রকাশ করতে পারতেন না। সুতরাং এই নিয়মে রাখালদাসের মুখ বন্ধ হ'ল, এই গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর যা বক্তব্য তা বলবারও তাঁর পথ রইল না। এই অবস্থা রাখালদাসের পক্ষে যে বিশেষ অস্বস্তিকর ছিল. তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। তখন তিনি কলকাতায় সিমলা স্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্বভারতে আর কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতায় Indian Museum-এ। এটা আমার বিলাত থেকে ফিরে আসবার, ১৯২২ সালের পরের কথা। তখন মহেন-জো-দড়োর নাম সমস্ত সভ্যজগতে ছড়িয়ে গিয়েছে। আমরা রাখালের বাসায় এসে প্রায়ই আড্ডা দিতুম। যারা যারা আসতুম, তাদের সকলের নাম মনে পড়ছে না। তবে বন্ধুবর কালিদাস নাগ আসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসতেন। বন্ধুবর শিশির-কুমার ভাদুড়িও আসতেন। আমার বোধ হয় রমেশ মজুমদার মশাইও আসতেন। আমার কাজের প্রতি রাখালের আস্থা পেতুম এই ভাবে। তিনি আমাকে একদিন বললেন, "দেখ্‌ সুনীতি, এরা তো আমাকে মহেন্‌-জো-দড়ো সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করতে দেবে না। এ সম্বন্ধে তোর কিছু লিখতে বাধা নেই। আমি তোকে সমস্ত মাল-মশলা দিচ্ছি, ছবি দিচ্ছি, তুই এই বিষয়ে কিছু লেখ আর এ সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তাও তুই প্রকাশ করে দে। এইভাবে ভবিষ্যতের জন্য একটা record থাকুক।"

আমি তাতে সানন্দে রাজী হলুম, তবে একটু ভয়ে ভয়ে। কারণ আমার আলোচ্য

বিষয় ছিল ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব নয়। তবুও আমি রাখালকে বললুম, "দাদা, তোমার যা যা বক্তব্য, সেগুলি যথাযথ তোমার বক্তব্য বলেই দেব। তবে এই আবিষ্কার বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে কতকগুলো কথা মনে জাগছে ভাষাতত্ত্বকে আশ্রয় করে, সেগুলো আমি আমারই বক্তব্য বলে দিতে চাই।" তাতে রাখাল পূর্ণ সম্মতি দিলেন, আর বললেন, "বেশ ত, আমি ত এই চাই তোর কাছ থেকে।"

তারপর রাখালের দেওয়া উপাদান নিয়ে Modern Review-তে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ বার করলুম। তার নাম দিলুম্ "Dravidian Origins and the Beginning of Indian Civilization"। তাতে মহেন্-জো-দড়ো আর ভারতের অন্য জায়গার প্রাগার্য্য জাতিদের সঙ্গে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের Aegean জাতির সঙ্গে একটা যোগ অনুমান করি, আর ভারতের দ্রাবিড় জাতি এই Aegean জাতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত, একথা কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক আর অন্য প্রমাণের বলে স্থাপিত করবার চেষ্টা করি। রাখালের প্রসাদে আমার লেখা এই প্রবন্ধটি মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারের সম্বন্ধে একটি প্রথম যুগের প্রবন্ধ, আর, বোধ হয়, কোন ভারতবাসীর লেখা প্রথম প্রবন্ধ। আমি বেশ গুছিয়ে রাখালের আবিষ্কারের কথা এতে লিখে দিই। এই প্রবন্ধ পরে ইউরোপে নানা স্থানে আলোচিত হয়। পারী (Paris) সোসিয়েতে আসিয়াতিক-এ অধ্যাপক Sylvan Levi এই সংখ্যার Modern Review কয়েক কপি আনিয়ে একটি বিশেষ অধিবেশনে এই প্রবন্ধের আলোচনা করেন। কিছু কাল পরে Sir John Marshall-এর বড় বই বেরুবার আগে জর্মান প্রাচ্যবিদ্যা সভার পত্রিকায় এক জার্মান পণ্ডিত মহেন্-জো-দড়োর উপরে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বোধ হয় জর্মান ভাষায় এটি ছিল প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি প্রমাণপঞ্জী হিসেবে মহেন্-জো-দড়ো সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত যা কিছু বেরিয়েছে তার খবর তিনি যতটা পেয়েছিলেন তার উল্লেখ করে দেন। আমার প্রবন্ধের খবর তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি দেখবার সুযোগ তাঁর হয়নি। আর আমার পদবীটাও তিনি সঠিকভাবে জানতে পারেননি। সেইজন্য তিনি আমার প্রবন্ধের লেখক হিসেবে আমার নাম দেন S. K. Chaunjee রূপে, আর 'চাউনজি' শব্দের বন্ধনীর মধ্যে ছাপিয়ে দেন (Chatterji ?) —খুব সম্ভব কোন হাতের লেখা 'নোট' থেকে 'Chatterji'র 't' দুটির মাত্রা পড়ে যাওয়ায় ও 'er'কে 'n' রূপে পড়ায় এই নামের বিকার।

রাখাল এই প্রবন্ধ দেখে খুবই খুশী হন, এটা আমার কাছে একটা বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা। আমি বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর—আর এই প্রবন্ধ লেখবার পর তিনি আমাকে একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রেণীতে গ্রহণ করলেন। কত সন্ধ্যা তাঁর বাসা বাড়িতে আমি কাটিয়ে এসেছি—তাঁর সরস গল্পের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্যনীতি প্রভৃতি কত বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া ছিল মনের রসায়ন স্বরূপ। নতুন কিছু না কিছু তিনি প্রায়ই আমাকে

বলতেন—এমন সহজ সাবলীল ভাবে যে তাতে ভারী জিনিসও হাল্‌কা হয়ে দেখা দিত। রাখালদাস তখন বহুমূত্রে ভুগছিলেন এবং এই ব্যাধিই কয়েক বৎসর পরে তাঁর কালস্বরূপ হয়েছিল। তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মত starch অর্থাৎ শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য, যেমন ভাত আলু আর চিনি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আর তিনি যথাসম্ভব মাংস খেয়েই থাকতেন। রাখাল একটু ভোজনবিলাসী ছিলেন, আর যারা খাইয়ে লোক হয় তারা খাওয়াতেও ভালবাসে। এই জন্য রাখালের আতিথ্যও ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর নিজের এক বহুদিনের পুরাতন গোয়ানী রাঁধুনী ছিল—কোঙ্কনীভাষী খ্রীষ্টান—মাংস রান্নায় সে ছিল ওস্তাদ আর রাখাল সকাল সন্ধ্যায় তারই রান্না খেতেন—আমাদেরও তাঁর এই রাঁধুনীর রন্ধনকলার সঙ্গে বহুবার পরিচয় হয়েছিল। তবে সাধারণতঃ তাঁর বৈঠকখানায় বসে আমরা চা, পাঁপর ভাজা, মুড়ি, কড়াই ভাজা, কখনও কখনও মিঠাই খাবার সন্দেশ—লঘু জলপানই করতুম। রাখালের গর্ব ছিল যে তাঁর পূর্বপুরুষ আওরঙ্গজেব বাদশাহের কাছ থেকে কিছু জমিদারী পেয়েছিলেন।

ইতিহাস-চর্চা প্রসঙ্গে মুসলমান যুগের কথা আলোচনা করবার জন্য তিনি কিছুটা ফার্সীও শিখেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের বাদশাহী আর নবাবী আমলের কিছুটা হাওয়া তাঁর মনে বইত। মোগলাই আদব-কায়দা, রীতরসম্, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বন্ধুবর শিশিরকুমার ভাদুড়ি যখন 'আওরঙ্গজেব' অভিনয় করেন, রাখাল তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সতেরোর শতকে মোগল আর রাজপুত পোশাক-পরিচ্ছদ কায়দা-কানুন সম্বন্ধে শিশির ও তাঁর দলকে তালিম দেন। নিজের হাতে 'আওরঙ্গজেব শিশিরের' মাথায় মোগলাই পাগড়ি বেঁধে দেন। মোগল দরবারের 'কুর্নিশ' কি রকম হ'ত তা শিখিয়ে দেন। এই কুর্নিশের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। বাদশাহের সামনে ঝুঁকে মাটিতে ডান হাত ঠেকিয়ে তবে সেই হাত কপালে ছুঁতে হত, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ কানের উপরে পাগড়ি ছুঁয়ে থাকতে হ'ত। এই কুর্নিশের ইতিহাস তিনি একদিন আমাদের শুনিয়েছিলেন। একবার আকবরের বড় ছেলে সেলিম, যিনি পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হয়েছিলেন, দরবারে তাঁর মহামহিম পিতাকে যথারীতি কুর্নিশ করছিলেন। সে সময় পর্যন্ত বাঁ হাত দিয়ে পাগড়ি ছোঁবার রীতি ছিল না। কিন্তু শাহজাদা সেলিম যখন ডানহাত ভূমে ঠেকিয়ে আর মাথা নুইয়ে ডানহাত দিয়ে যখন মাটি স্পর্শ করছিলেন তখন তাঁর মনে আশঙ্কা হ'ল, মাথার পাগড়ি বুঝি আল্‌গা হয়েছে, পড়ে যেতে পারে। দরবারে এরূপ ঘটনা একটা বড় দরের বেয়াদবী হবে। সেই জন্য যুবরাজ সেলিম বাঁ হাত দিয়ে পাগড়ি চেপে ধরলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে ভূমিস্পর্শ করে যথারীতি মাথায় ঠেকালেন। এই নতুন ভঙ্গীটুকু আকবর বাদশাহের কাছে বেশ ভাল লাগল, আর সেই থেকে তিনি নিয়ম করে দিলেন যে দরবারী কুর্নিশ এই ভাবেই করতে হবে। তিনি এইরকম নানান্ খুঁটিনাটি জানতেন আর বেশ চিত্তাকর্ষক ভাবে বলতেন

আর প্রয়োগও করতেন।

যদিও রাখালদাস মহেন্-জো-দড়ো সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য নিজের কথায় বলবার সুযোগ পেলেন না তাতে তিনি দমেন নি। মহেন্-জো-দড়ো আর হরপ্পাতে যে সমস্ত মুদ্রা বা শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল তাতে যে লিপি ছিল তার পাঠোদ্ধার তখনও কেউ করতে পারেননি, এখনও পর্য্যন্ত কেউ পারেননি। এই লিপি পড়বার জন্য অনেকে আগ্রহান্বিত হলেন। রাখালদাস এই লিপি উদ্ধারের কাজে মেতে গেলেন। তবে তিনি ছিলেন নিছক পণ্ডিত—আন্দাজী অনুমান খণ্ডের উপর দিয়ে চলতে চাইতেন না। এই লিপির পাঠোদ্ধার করবার জন্য তিনি মধ্যপ্রাচ্যের আর পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের যত প্রাচীন আর অপ্রাচীন লিপি ছিল, যেগুলির সঙ্গে মহেন্-জো-দড়োর লিপির সাদৃশ্য বা সংযোগ থাকা সম্ভবপর ছিল, সেই সব লিপি বিষয়ে বড় বড় প্রামাণিক বই আনিয়ে সেই সব লিপির গভীর চর্চা আরম্ভ করে দিলেন। এই জন্য তাঁকে বিস্তর অর্থব্যয় করতে হয়েছিল, সময় দিতে হয়েছিল প্রচুর আর পরিশ্রমও করতে হয়েছিল অগাধ। ভারতের এই প্রাচীন লিপির উদ্ধারের চেষ্টা তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসরের প্রধান কর্ম হয়ে উঠেছিল।

ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠীর পুনরুদ্ধারে রাখাল ছিলেন একপত্রী পণ্ডিত। আর সে বিষয়ে তাঁর গুণপনা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরাই বুঝবেন, কিন্তু তিনি এর চাইতেও আরও বড় ছিলেন। তিনি যে কেবল তথ্যের মধ্যেই ডুবে ছিলেন তা নয়, তথ্যের অন্তরালে যে রস ছিল মানবিকতাকে অবলম্বন করে তার তত্ত্বও তাঁর কাছে চাপা ছিল না। তাঁর প্রতিভা যে কেবল factual অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ আর বস্তু-আশ্রয়ী ছিল তা নয়, উপরন্তু তিনিও ছিলেন রসের ক্ষেত্রে দ্রষ্টা আর স্রষ্টা। রসসৃষ্টিকার্য্যে তিনি নিজের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আর শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রাখালদাসের হাতে ভারতবর্ষে এক নতুন মর্য্যাদা পেয়েছে। 'ময়ূখ', 'ধর্মপাল', 'অসীম', 'শশাঙ্ক', 'করুণা' প্রভৃতি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের আর তার নতুন পটভূমিকার এত পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে তাঁর আগে ভারতবর্ষে আর কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে বসেন নি। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'কে (১৮০১) বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। আর রামরাম বসুর অর্ধশতাব্দী আগে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল'ও ছিল তখনকার কালের উপযোগী ছন্দোবদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের লেখা 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'-ও (১৮৬৯) বাঙ্গালার এক আদি ও প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিন্তু এই বইয়ে লেখক একটু অতিরিক্ত কল্পনারই আশ্রয় নিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ রস-রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর এঁদের বই (-ঐতিহাসিক আর সামাজিক উপন্যাস দুই-ই) ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎ ভাষায় অনূদিত হয়ে সেই সব ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এঁদের ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রাচীনের যথাযথ প্রতিফলনের চেষ্টা আছে, আর সে চেষ্টাকেও সে

যুগের কথা ধরলে সার্থক বলতেই হয়। এঁদের বইয়ে কিন্তু ইতিহাস ব্যাপারটা গৌণ, মুখ্যবস্তু হচ্ছে ঘটনার সমাবেশ আর চরিত্রচিত্রণ। রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে যেভাবে প্রাচীন সামাজিক বাতাবরণকে জিইয়ে তুলেছেন, তা অদ্ভুত—তাঁর পূর্বে আর কেউ এবিষয়ে এতটা সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। রাখালদাস আরও পরবর্তীকালের পূর্ণতর তথ্যসম্ভার নিয়ে ইতিহাস আলোচনার আধারভূমিতে দাঁড়িয়ে যে ক'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তা একাধারে উপন্যাস আর ঐতিহাসিক চিত্র। তাঁর কতকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে—আর শুনেছি আরও অন্য দুই একটি ভারতীয় ভাষাতেও হয়েছে। তাঁর 'প্রাচীন মুদ্রা' নামে ঐতিহাসিক গবেষণামূলক বইয়ের মতনই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমেও বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর sense of history অর্থাৎ ইতিহাস-বোধকেও মার্জিত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে তাঁর লেখা আর দু'খানি বইয়েরও উল্লেখ করতে হয়। একখানি হচ্ছে 'হেমকণা' আর একখানি 'পাষাণের কথা'। এ জিনিস হচ্ছে বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে সম্পূর্ণ নোতুন। মানুষের ঐতিহাসিক প্রগতির মূক দর্শক ও জড়ের মুখ দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ইতিহাসের ঘটনাবলী চিত্রপটের মত প্রকাশিত করে দেবার এই এক নতুন ভঙ্গী রাখালদাস বাঙ্গালী পাঠকের সামনে এনে দিলেন।

রাখালদাসের সহধর্মিণী কাঞ্চনমালা দেবীও কতকগুলি উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনা করে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে কাঞ্চনমালা দেবীর নামও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, আর এই লেখক-দম্পতির কৃতিত্বের উল্লেখ এক সঙ্গে সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

"মুখেন মারিতং জগৎ"—রাখালদাস অনেক সময়ে কথাবার্তায়, আলাপে-আলোচনায়, সুরুচি-কুরুচি ও সুনীতি-দুর্নীতি সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট মত অকুণ্ঠিত ভাষায় জোর গলায় বিঘোষিত করতেন, আর যাঁরা এই সব বিষয়ে একটু সঙ্কোচ অনুভব করতেন তাঁর ভাষা আর প্রকাশ-ভঙ্গীতে তাঁরা ভয় পেয়ে যেতেন, কারণ তিনি মৌখিক আলোচনায় রুচিবাগীশদের চটাবার জন্যই বেশি করে unconventional অর্থাৎ গতানুগতিকতার বিরোধী হয়ে উঠতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আভ্যন্তর চিন্তাধারায় সম্পূর্ণরূপেই এর বিপরীতই ছিলেন। সাহিত্যে বিষয়বস্তু আর প্রকাশভঙ্গী নিয়ে তিনি পূর্ণভাবে ছিলেন নীতিনিষ্ঠ আর শালীনতাধর্মী। আমাদের যৌবনকালে বাঙ্গালাদেশে একটু আচমকা অতি আধুনিক সাহিত্যের একটা নতুন ধারা এসে পড়ল। একটু উত্তরকালে 'শনিবারের চিঠি'র দল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমার মনে হয় রাখালদাসই এ বিষয়ে বাঙ্গালী সাহিত্যিক আর সাহিত্য-রসিকদের সতর্ক ও সচেতন করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই শতকের তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা সাহিত্যও যে পথে চলছিল তার একটু খোঁজ নিলেই এ বিষয়ে রাখালদাসের আলোচনার ধারা আর তার মূল্য বুঝতে পারা যাবে। সে প্রসঙ্গের অবতারণা করবার সময় ও শক্তি দুই-ই উপস্থিত

লেখকের নেই। তবে 'সাহিত্যে পরকীয়াবাদ'-এর বিরুদ্ধে সামাজিক তথা সাহিত্যিক নীতি-পক্ষপাতী রাখালের অভিযানের কথা না বললে রাখালদাসের চরিত্রের একটা গভীর দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয় না।

আমি নিজে রাখালকে যতটুকু দেখেছি তাঁর দোষত্রুটি সত্ত্বেও মোটের উপর তাঁকে একজন good man অর্থাৎ যাকে বলে খাঁটি মানুষ বলে মানতে হয়। রাখালের মধ্যে ছিল একটা এমন সরল ও অমায়িক ভাব, এমন একটা গুণগ্রাহিতা, যে গুণগ্রাহিতার মধ্যে অহমিকার লেশমাত্র ছিল না—সেটি সকলকেই মুগ্ধ করত। তিনি তাঁর অনুজকল্পদের দোষত্রুটিও দেখাতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু তাঁর ভাল মনে হত, তার তারিফ করে সেটুকুকে বাড়িয়ে দিয়ে উৎসাহ দিতেন প্রচুর। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। রাখালের তিরোধানের পরে একবার আমি আজমেরে গিয়েছিলুম। সেখানে রাজস্থানের বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইনি তখন প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক প্রবীণ। এঁকে এক কথায় 'রাজস্থানের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' বলতে পারা যায়। প্রাচীন আর মধ্যযুগের রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে ইনি সার্থক গবেষণা করেছেন, আর বহু প্রাচীন লেখের সম্পাদনা করে তা থেকে ঐতিহাসিক তথ্য বার করে দিয়ে গিয়েছেন। অনেক বৎসর হয়ে গেল ইনি দেহরক্ষা করেছেন। হিন্দী ভাষায় ভারতীয় লিপিবিদ্যা সম্বন্ধে এঁর একখানি প্রামাণিক আর বেশ বড বই আছে। রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যের অনেক লুপ্তকথা ইনি বার করেছেন, অনেক জটিল তথ্যের সমাধান করে দিয়েছেন। এঁর পাণ্ডিত্যের কথা আর ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানতুম। আজমেরে যখন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, তখন আমাদের দলে যতদূর মনে হচ্ছে বন্ধুবর ডক্টর কালিদাস নাগও ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নলিপি আর ঐতিহাসিক লেখ ইত্যাদির আলোচনার কথা উঠল। ওঝাজী আমাদের কাছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর রাখালদাসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তিনি হিন্দীতেই কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, 'রাখালদাসের সম্বন্ধে একটি ঘটনা আপনাদের বলি, তাইতে আপনারা বুঝবেন লোকটির পাণ্ডিত্য যেমন ছিল অসাধারণ চরিত্রমাধুর্যও তেমনই ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।' ওঝাজী একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন—যথারীতি তিনি চৌরঙ্গীতে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভবনে পদার্পণ করে আর এর প্রত্নতত্ত্ববিভাগে প্রাচীন মূর্তি, লেখ ইত্যাদি যেখানে রক্ষিত হয়ে আছে সেই ঘরগুলিতে তন্ন তন্ন করে নিজের অভ্যাস-মত দেখতে থাকেন। শিলালেখগুলি যে ঘরে রক্ষিত আছে সেখানে তিনি আসেন। কতকগুলি শিলালেখ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল হয়, আর অন্য কতকগুলি তাম্রপট্ট আর অন্য লেখ যা গ্যালারিতে তখন প্রদর্শিত ছিল না, সেগুলির সম্বন্ধেও তাঁর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে। তিনি দেখলেন যে একটি মোটা বাঙ্গালীবাবু কোট প্যাণ্টালুন আর টাই এঁটে সেই গ্যালরিগুলির পর্যবেক্ষণ করছেন—সঙ্গে আছে উর্দিপরা আরদালী আর কেরানী। অনুমানে বুঝলেন যে ইনি 'মিউজিয়ামের

কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হবেন। কোথায় কি আছে তাঁর জানা সম্ভব। ওঝাজী এগিয়ে এসে তাঁকে দুই একটা লেখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তাতে ঐ সাহেবী পোশাকে বাঙ্গালীটি বিশেষ সৌজন্য সহকারে তিনি যা যা দেখতে চান তাঁকে দেখিয়ে দিলেন আর ওঝাজীর সঙ্গে আলাপে তিনি বুঝতে পারলেন যে ওঝাজী এসব বিষয়ে বেশ ভালো করে চর্চ্চা করেছেন। অনেকক্ষণ এইভাবে তাঁদের দু'জনের বিদ্যার আলোচনা করবার পর এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি ওঝাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বে দেখছি প্রকাণ্ড পণ্ডিত। বাঙ্গালাদেশের শিলালেখ প্রভৃতিরও এত খবর রাখেন, দয়া করে আপনার পরিচয়টি আমাকে দেবেন? কার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করে আমি ধন্য হলুম?"

ওঝাজী এই সৌজন্যপূর্ণ আর বিনীত ভাবের কথা শুনে নিজের নাম বললেন। নাম শুনেই সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙ্গালী সাহেবটি ঝুঁকে প্রণাম করে দু'হাত দিয়ে ওঝাজীর পদধূলি নিলেন আর বললেন, "আপনি আমার গুরু, আমাকে আপনার পদধূলি দিন।" ওঝাজী আশ্চর্য্য হয়ে হাঁ হাঁ করে তাঁকে বারণ করবার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য এই বাঙ্গালী সাহেবটি ছিলেন রাখালদাস। তিনি ওঝাজীকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর বই আর লেখা পড়ে তিনি রাজস্থানের অনেক নোতুন তথ্য জেনেছেন আর ওঝাজীর দৃষ্টিভঙ্গী আর আলোচনা-পদ্ধতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। আর এই হিসাবে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। দ্রোণে একলব্যে মিলন হল এবং এতে দ্রোণ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ যাচ্ঞা করলেন না। প্রচুর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। পরে যখন রাখালদাস প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চাকরি ছেড়ে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আর সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপক হন তখন গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝাজী নিজের পুত্র রমেশচন্দ্রকে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখালদাসের শিষ্যত্ব করবার জন্য কাশীতে পাঠিয়ে দেন। আর রাখালদাসও যথাশক্তি গুরুপুত্রকে বিদ্যাদান করে ওঝাজীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় দেন।

এই হচ্ছে মানুষ রাখালদাসের চরিত্রের একটু পরিচয়। এখন তাঁর তিরোধানের প্রায় আটাশ বৎসর পরে যখন তাঁর কথা মনে হয় তখন বেশি করে অনুজকল্প বলে আমাকে আকুল করে তাঁর ব্যক্তিত্ব আর স্নেহপ্রবণ হৃদয়, তাঁর একটা সহজ সৌজন্য। নানান দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি একটা পুরো মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিত্ব মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত হয়ে যায়। আর সেই ব্যক্তিত্বের গৌরব যারা দেখেছে তাঁর তিরোধানের পরে তার আর কিছুই অবশেষ থাকে না, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে, তাঁর অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উৎস থেকে যে তথ্য আর রস দিয়ে গিয়েছেন তা চিরকাল যতদিন মানসিক সমাজে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার আদর থাকবে ততদিন লুপ্ত হবার নয়।

---

২৯ চৈত্র ১৩৮১ (১২ এপ্রিল ১৯৭৫) পরিষদ্ মন্দিরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধের এই পুরাতন পাণ্ডুলিপিটি প্রদর্শিত হয়। রাখালদাসের মৃত্যু ১৯৩০ খ্রীঃ, সুনীতিকুমারের পাণ্ডুলিপিটির রচনার তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

—পরিষৎ-সম্পাদক

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

তেইশ বৎসর পূর্বে আমি 'ইতিহাস' পত্রিকায়[১] 'ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। কিয়ৎকাল পরে ঐ পত্রিকায় আমার স্বর্গীয় সহপাঠী চারুচন্দ্র দাশগুপ্তের 'মুদ্রাতত্ত্ববিদ রাখালদাস'[২] এবং আমার 'রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস'[৩] সংজ্ঞক আরও দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার প্রথম প্রবন্ধটির উপসংহারে বলা হইয়াছিল, "রাখালদাসের ন্যায় কৃতী বাঙ্গালীর জীবন ও অবদান বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা হয় নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার অন্যতম সুহৃদ্ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মজুমদার স্বর্গীয় বন্ধুর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, রাখালদাস সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির উহাই একমাত্র উপজীব্য। উল্লিখিত ভূমিকার শেষদিকে লেখক ভবিষ্যতে রাখালদাসের বিস্তারিত জীবনী আলোচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আশা এ পর্যন্ত ফলবতী হয় নাই। রাখালদাসের বন্ধুবর্গের মধ্যে মজুমদার মহাশয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ প্রভৃতি আরও অনেকে জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলে রাখালদাসের সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাহিনী প্রকাশ করিলে স্বর্গীয় ঐতিহাসিকের বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক ঘটনা অনুসন্ধিৎসু নবীনদিগের জানিবার সুযোগ হয়।" আজ দেখিতেছি নাগমহাশয় এবং সে-যুগের আরও অনেকে আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মজুমদার মহাশয় আজও আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদিগের আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন। কিন্তু তিনি এখন বৃদ্ধ। সুতরাং রাখালদাস সম্পর্কে লিখিবার দায়িত্ব আমাদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাচীনকালের ভারতীয়গণ তাঁহাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পুরাতন শিলালেখ, তাম্রশাসন ও মুদ্রাদির সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টা সূচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থসমূহেরও বিশ্লেষণ চলিতে থাকে। ক্রমে মৃত্তিকা খনন করিয়া ভারত সংস্কৃতির বিলুপ্ত নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার ও সেগুলি সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথমদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কার্যে ব্রতী ছিলেন। ক্রমে ভারতীয় পণ্ডিতেরাও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। যে সকল ভারত-সন্তান এই প্রশংসনীয় কার্যে জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় বাঙালী ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ।

রাখালদাসের কর্মজীবন বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত না করিয়া পারি না। ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে আর কাহাকেও এইরূপ অল্পসময়ে এত অধিক রচনা প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। রাখালদাস বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পুরাতন লেখাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পনিদর্শনের মূল্য-বিচার, লেখমুদ্রাদির সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন যুগের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা, খনন দ্বারা প্রাচীনযুগের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার ও উহার সংরক্ষণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পটভূমিকায় মনোরম উপন্যাস প্রণয়ন—এইরূপ নানা ধরণের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। যে মোহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ মানব সভ্যতার জন্মভূমি হিসাবে ভারতকে আজ মিশর, মেসোপোটামিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত এক পংক্তিতে দাঁড় করাইয়াছে, উহার প্রতি রাখালদাসই সর্বপ্রথম জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মোহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারকে পুরাবিদ্ রাখালদাসের কীর্তিস্তম্ভ বলা যাইতে পারে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল (বাংলা ১২৯২ সালের ১লা বৈশাখ) মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরে রাখালদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী দাদাপাড়া গ্রামের এক ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। কলিকাতায় হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া মতিলাল বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মতিলালের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী আটটি সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া ছিল। এই শিশুই পরবর্তীকালের স্বনামধন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখালদাসের প্রথম জীবন অতিরিক্ত ভোগবিলাসের মধ্যে কাটিয়াছিল। ধনী পিতার দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া বাল্যকালে তাঁহার আদর যত্নের সীমা ছিল না। পিতামাতার কাছে তাঁহার নানারকমের অসঙ্গত আবদারও প্রশ্রয় পাইত। ইহার ফলে রাখালদাস প্রথম জীবনে সংযম শিক্ষার সুযোগ পান নাই। এই শিক্ষার অভাব পরিণামে তাঁহার অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়াছিল।

কিশোর বয়সেই রাখালদাসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পনর বৎসর বয়সে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল হইতে মাসিক পনর টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি এনট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরই উত্তরপাড়ার জমিদার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কাঞ্চনমালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কাঞ্চনমালা বিদুষী ও গুণবতী ছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার রচিত 'শনির দশা' উপন্যাস খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়

এবং তিনি নানা বৈষয়িক গোলমাল ও মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিব্রত হন। তাঁহার প্রথম পুত্র অসীমচন্দ্র এই সময়ে জন্ম গ্রহণ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অদ্রীশচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল।

কৈশোরেই রাখালদাসের হৃদয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইবার সুযোগ ঘটে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ. পড়িবার সময় তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে রাখালদাস তাঁহার প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই সময় থিওডোর ব্লক সাহেব ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত কলিকাতার ভারতীয় প্রদর্শশালায় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শাখার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। রাখালদাস ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রায়ই প্রদর্শশালায় যাতায়াত করিতেন। এই সূত্রে সুপণ্ডিত ব্লক সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও সৌহৃদ্য জন্মে। ব্লক সাহেব প্রাচীন হিন্দু যুগের এবং পরবর্তী মুসলমান আমলের শিলালেখাদি পাঠে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার সাহচর্য ও শিক্ষায় রাখালদাস শীঘ্রই প্রাচীন লিপি পাঠে দক্ষতা অর্জন করেন। ব্লক সাহেবকেও তিনি তাঁহার অন্যতম গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। The origin of the Bengali Script সংজ্ঞক গ্রন্থটি রাখালদাস তাঁহার প্রত্নলিপিতত্ত্ব-শিক্ষার এই দুই গুরুর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্বেই রাখালদাস প্রাচীন লেখ ও মুদ্রা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, তন্মধ্যে গয়া জেলার অন্তর্গত গুরপাতে প্রাচীন কুক্কুটপাদ বিহারের অবস্থান নির্ণয় বিষয়ক রচনাটি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়[৪] প্রকাশিত হয়। মালয় উপদ্বীপে অবস্থিত কতকগুলি মৃণ্ময় ফলক এবং শক-কুষাণদিগের মুদ্রা সম্পর্কে তাঁহার অপর দুইটি প্রবন্ধ ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্রিকাতে[৫] প্রকাশিত হইয়াছিল। রাখালদাসের এই সময়ের রচনাবলীর মধ্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে Indian Antiquary (Bombay) তে প্রকাশিত[৬] ভারতীয় ইতিহাসের শক-কুষাণ যুগ সম্বন্ধীয় পঞ্চাশপৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট প্রবন্ধটি তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাচীন পণ্ডিত Vincent A. Smith তাঁহার Early Histroy of India সংজ্ঞক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ঁক শক-কুষাণ ইতিহাস সম্পর্কে যুবক রাখালদাসের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ, পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্বেই রাখালদাসের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, অনেকেই তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে আহ্বান

করিতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ প্রদর্শশালার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি উহার পুরাতত্ত্ব শাখার বস্তুসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই সময় Stapleton সাহেব তাঁহার আবিষ্কৃত সমাচার দেবেব ঘুঘরাহাটী তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারভার রাখালদাসের হস্তে ন্যস্ত করেন। ইতিমধ্যে আফ্‌গানিস্থানের আমীর কলিকাতা অবস্থানকালে এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতিকে পরীক্ষার জন্য কতকগুলি প্রাচীন অঙ্কচিহ্ন-যুক্ত মুদ্রা দিয়াছিলেন। ঐ গুলির পরীক্ষার ভারও রাখালদাসের উপর অর্পিত হয়। ঐ সময় রাখালদাস ২২।২৩ বৎসরের যুবক এবং দুইটি পুত্রের পিতা। এই অবস্থায় এত অল্প বয়সে এতখানি খ্যাতি লাভের সৌভাগ্য ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় রাখালদাসের অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলির বিষয়বস্তু ছিল—মথুরা হইতে প্রাপ্ত শক-কুষাণ যুগের লেখাবলী, প্রাচীন সপ্তগ্রাম, আসামের লেখযুক্ত কামান, প্রথম কুমারগুপ্তের লেখদ্বয় এবং লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাখালদাস কলিকাতার ভারতীয় প্রদর্শশালায় পুরাতত্ত্ব শাখার জনৈক সহকারী নিযুক্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কর্ম্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন সর্বাধ্যক্ষ সার জন মার্শাল সাহেব রাখালদাসকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ঐ বিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উচ্চপদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিলেন। রাখালদাসের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমচক্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত করেন। পরবর্তী ছয়বৎসরকাল রাখালদাস তাঁহার পুণাস্থিত কার্যালয় হইতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কার ও সংরক্ষণে অদম্য উৎসাহের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তৎকালীন বম্বে প্রেসিডেন্সীর কীর্তিচিহ্নগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হয় এবং উহা সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এই সময়ের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি বাদামি, ত্রিপুরী ও ভুমারার মন্দিরাদি সম্বন্ধে কয়েকখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শীতকালে রাখালদাস সিন্ধুদেশের লারকানা জেলার মোহেনজোদরো অর্থাৎ মরার ঢিপি নামক স্থান পরিদর্শন করেন এবং ঐ স্থানের মৃত্তিকাস্তূপসমূহে খননকার্য আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয়, শীঘ্রই গরম পড়িয়া যাওয়ায় এবং ঐ কার্যের জন্য উপযুক্ত অর্থ নির্দিষ্ট না থাকায় খননকার্য বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু সামান্য খননের ফলে রাখালদাস সেখানে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতির যে নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন উহা হইতেই তিনি মোহেন্‌জোদরোর গুরুত্ব এবং প্রাচীনত্ব বুঝিতে পারিলেন এবং ফলে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষ ঐ স্থানে ক্রমাগত খননকার্য চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মহেন্‌জোদরোতে চার পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের গৌরব যে

মূলতঃ রাখালদাসের প্রাপ্য মার্শাল সাহেব তাঁহার Mohenjo-daro and the Indus Civilization সংজ্ঞক সুবিখ্যাত গ্রন্থে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, The site had long been known..... ; but it was not till 1922, when Mr R D Banerji started to dig there, that the prehistoric character of its remains was revalued..... His primary object was to lay bare the Buddhist remains, and it was while engaged on this task that he came by chance on several seals..... Mr. Banerji himself was quick to appreciate the value of his discovery .....With the hot season rapidly approching, Mr. Benerji's digging was necessasily very restricted, and it is no wonder, therefore, that his achievements have been put in the shade by the much bigger operations that have since been carried out. This does not, however, lessen the credit due to him.. .. nothing whatever was then known of the Indus civilization. ....Nevertheless, Mr. Banerji divined, and rightly divined, that these earlier remains must have antedated the Buddhist structures, which were only a foot or two above them, by some two or three thousand years That was no small acheivement.. .. Mr Banerji's work of Mohenjo-daro ... was carried through in the face of very real difficulties, due in part to lack of adequate funds, in part to the hardship inseparable from camp life in such a trying climate [১০]

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কারের ব্যাপারে রাখালদাস যেন একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। যেখানে অপরে কোন মূল্যবান দ্রব্যের অস্তিত্ব সন্দেহ করিত না, সেরূপ স্থান হইতেও তিনি অনেক সময় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুসমূহ আবিষ্কার করিতেন। কেবল যে মোহেন জো-দরো আবিষ্কারেই তাঁহার এই সূক্ষ্মানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। গয়া, ঢাকা প্রভৃতি কতিপয় স্থানেও তিনি অদ্ভুত ভাবে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রাচীন লেখ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের ব্যাপারেও রাখালদাস কখনও কখনও এই সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি ক্ষীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আবিষ্কৃত প্রমাণ হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ২৮৩ সংবৎসরের পটিয়াকেল্লা শাসনের তারিখে গুপ্তাব্দের ব্যবহার, ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যারম্ভ প্রভৃতি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইলেও সত্যের নিকটবর্তী দেখা গিয়াছে। যেমন উড়িষ্যার ভৌমকরবংশের ব্যবহৃত সংবৎসরের আরম্ভ তিনি ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছিলেন। ইহা

প্রকৃত তারিখ অর্থাৎ ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের খুবই নিকটবর্তী। অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাখালদাসের কোন কোন সিদ্ধান্ত অসার প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন তাঁহার মতে খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ ধর্মপালের পরবর্তী সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ এবং ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শেষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে রাখালদাসকে নিজের ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিতেও দেখা গিয়াছে। যেমন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার-দেবের তাম্রশাসনসমূহকে তিনি প্রথমে জাল মনে করিতেন, কিন্তু পরে এই মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

মোহেন-জো-দরোতে অবস্থানকালে রাখালদাসকে যে শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, উহার ফলে পুনায় ফিরিয়া তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং বাধ্য হইয়া এক বৎসরের ছুটি লন। ইহার অল্পকাল পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র অসীমের মৃত্যুতে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রাখালদাস পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বচক্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে কলিকাতায় আসেন। অতঃপর তিনি উত্তরবাংলার রাজশাহীজেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরে খননকার্য আরম্ভ করেন। এই স্থানে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের যে সকল প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও কৃতিত্ব অনেকখানি রাখালদাসের প্রাপ্য।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভরণ-পোষণের জন্য সামান্য কিছু পেনশন দিয়া রাখালদাসকে সরকারী কার্য হইতে অপসৃত করা হয়। জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত ভেড়াঘাটের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির হইতে একটি মূর্তি অপসারণের অভিযোগে প্রথমে তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে কর্মচ্যুত করা হয়। এই অভিযোগ প্রমাণিত না হইলেও অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হইল। অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম-দক্ষতার অধিকারী হইয়াও এইরূপে রাখালদাস অদূরদর্শিতা এবং দুরদৃষ্টবশতঃ নিগৃহীত হইলেন। তিনি বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার পাইয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার মাতামহীর সম্পত্তিও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। কিন্তু রাখালদাসের অমিতব্যয়িতার জন্য সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রাজকীয় চালচলনের কথা পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাচীন কর্মচারীর মুখে শুনিয়াছি। যখন টাকায় আধমণ-একমণ চাউল পাওয়া যাইত সেই সময়ে রাখালদাস রেলষ্টেশনের কুলীকে দশটাকা বখশিস করিতেন। তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের সহিত সমান চালে চলিতেন এবং সাহেবের মুখের উপর ফুক করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। এদিকে মার্শাল রাখালদাসের পাণ্ডিত্যকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। শুনিয়াছি, তিনি যখন জানিলেন যে, চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের পুরোহিত রাখালদাসের নামে আদালতে নালিশ করিয়াছেন এবং বুঝিলেন যে রাখালদাসকে রক্ষা করা তাঁহার হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন অসহায়ভাবে কেবল বলিয়াছিলেন, Poor Mr. Banerji ! Poor Mr. Banerji !

কর্মচ্যুত হইয়া রাখালদাস অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি দুরারোগ্য ব্যধিতেও ভুগিতেছিলেন। এই দুর্দিনে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের পরামর্শে উড়িষ্যার ইতিহাস বিষয়ক বিরাট গ্রন্থখানি লিখিয়া তল্লব্ধ অর্থে তাঁহাকে কোনরূপে সংসার চালাইতে হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্বানুরাগী মহারাজ এই গ্রন্থের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন এবং 'প্রবাসী' সম্পাদক স্বনামখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার প্রকাশনার দায়িত্ব লন। যে অবস্থায় রাখালদাস এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, দুরবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই উহা লিখিবার ভার তৎপ্রতি অর্পিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সে সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন রাখালদাস। কারণ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস ও তাম্রশাসনাদি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়া ঐ অঞ্চলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একমাত্র পুরাতত্ত্ব বিভাগের এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা সংজ্ঞক পত্রিকাতেই তিনি উড়িষ্যার আটটি তাম্রশাসন এবং বহু সংখ্যক গুহালেখ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যা সম্পর্কে তিনি অপর যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিহার-উড়িষ্যা-গবেষণা-সমিতির পত্রিকা এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকাতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান্।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রাখালদাসকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক নিযুক্ত করায় তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থকষ্টের উপশম হইয়াছিল। কিন্তু বিলাস এবং অপব্যয়ে অভ্যস্ত রাখালদাস এই আয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ দুঃখশোকে তাঁহার শরীর মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (বাংলা ১৩৩৭ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার) একমাত্র জীবিত পুত্র অদ্রীশকে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলিয়া মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে রাখালদাস কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীখানি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। রাখালদাসের এই শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

রাখালদাসের অগণিত প্রবন্ধ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা, বিহার রিসার্চ সোসাইটীর পত্রিকা, Epigraphia Indica, লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, Indian Antiquary, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম ভাগ, ১৩২১ সাল, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪ সাল) ও 'প্রাচীন মুদ্রা' (১৩২২ সাল) ব্যতীত 'পাষাণের কথা', 'শশাঙ্ক', 'করুণা', 'ধর্মপাল', 'অসীম', 'ময়ূখ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস-রচিত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে The Palas of Bengal (1915), The Origin

of the Bengali Script (1919), The Temples of Siva of Bhumara (MASJ, No 16, 1924), Bas-reliefs of Badami (MASJ, No 25, 1928), History of Orissa Vol. I, 1930, vol. II, 1931), The Haihayas of Tripuri and their Monuments (MASJ, No 23, 1931), The Age of the Imperial Guptas (1933), Eastern Indian School of Medieval Sculpture (1933) এবং Prehistoric, Ancient and Hindu India (1934) বিখ্যাত।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্বল্প-পরিসর কর্ম-জীবনে রাখালদাস যে বিভিন্ন বিষয়ে এত অধিক রচনা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতের মতৈক্য না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে তদীয় রচনাবলীতে অশেষ অধ্যবসায়ে সংগৃহীত বহু মূল্যবান্ তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাকে স্বভাব-সিদ্ধ বিলাসিতা ও অসংযমের চাপে পীড়িত দেখা যায়। শোনা যায়, অনেক সময় তিনি স্বয়ং লেখনী চালনা না করিয়া মুখে মুখে রচনা করিয়া যাইতেন এবং অপর কেহ তাহা শুনিয়া লিখিয়া লইত। ইহা অবশ্য তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং বিষয়বস্তুর উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকারের সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু এইরূপ রচনায় গ্রন্থকারের সাবধানতা, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও পাণ্ডিত্যের সম্যক্ পরিচয়ের অভাব থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। যেমন ধরুন, একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, "৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজ জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পুত্র ধ্রুবধারাবর্ষ তখনও সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।"[১১] অথচ যে 'জৈন হরি-বংশে'র ভিত্তিতে একথা বলা হইল, তাহাতে আছে যে, ৭০৫ শকাব্দে বা ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য এই শ্রীবল্লভ কৃষ্ণ-রাজের প্রথম পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ অথবা দ্বিতীয় পুত্র ধ্রুব ধারাবর্ষ, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু অসাবধানতাজনিত ভুলটি এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। যাহা হউক, এইরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাসে অধিক দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ গ্রন্থ-খানি তিনি ব্যাধি ও দারিদ্র্য-পীড়িত অবস্থায় তাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থটি তিনি ভালরূপে সংশোধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, রাখালদাসের গবেষণাত্মক রচনায় কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ অসাবধানতার পরিচয় মিলিলেও, তাঁহার রচনাবলীর নিকট ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের অপরিমেয় ঋণের কথা ভুলিলে চলিবে না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব-শিক্ষার্থীদিগের জন্য রচিত রাখালদাসের 'প্রাচীন মুদ্রা' প্রকাশের সময় বাংলা ভাষা দূরের কথা ইংরেজীতেও এইরূপ গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। দুই খণ্ডে

রচিত তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। এই গ্রন্থে বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান আমলের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি ইংরেজীতে রচিত হইলে গ্রন্থকারের খ্যাতি ও অর্থলাভ অনেক অধিক হইত, সন্দেহ নাই। অসাধারণ মাতৃভাষা-প্রীতি রাখালদাসকে গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় রচনা করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা দেশের প্রাচীন ও মধ্য যুগেব ইতিহাস রচনায় রাখালদাসের ন্যায় অপর কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগের সহিত কেবল উহার দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত রামাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 'গৌড়রাজমালা'ব তুলনা চলিতে পারে, তৎকাল-প্রচলিত আর কোন গ্রন্থের সহিত উহার তুলনা চলে না। এই সময়ের মধ্যে বাংলার যে সকল প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্য কাণ্ড' (১৩২১ সাল) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাতেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে কুলপঞ্জীর মূল্য বিচারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। সুতরাং চন্দ মহাশয় ও রাখালদাস বাংলার ইতিহাস চর্চায় নবযুগের সূচনা করনে, বলিতে হইবে। এই দুই জনের মধ্যে বাংলার ইতিহাসে রাখালদাসের গবেষণার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তা ছাড়া ধর্মপালের তারিখ প্রভৃতি দুই একটি বিষয়ে রাখালদাসের মতামত চন্দ মহাশয়ের মতামত অপেক্ষা প্রমাণসহ বলিয়া দেখা গিযাছে। রাখালদাসের ধর্মপালের তারিখ বিষয়ক অভিমত এই সময়ে প্রকাশিত The Palas of Bengal গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানিও বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত প্রাচীন বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে প্রথম দিকের বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাচীন বাংলার সহিত সম্পর্কিত রাখালদাসের অপর দুইখানি পুস্তক—The Origin of the Bengali Script এবং Eastern Indian School of Medieval Sculpture.

উপরে আমরা রাখালদাসের প্রথম যৌবনে রচিত শক-কুষাণ আমলের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ব্যতীত তাঁহার গুপ্ত যুগের ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ভারতবর্ষ, উড়িষ্যার ইতিহাস, হৈহয়-কলচুরিবংশের ইতিবৃত্ত ও সে যুগের মন্দিরাদি, বাদামির ভাস্কর্য-শিল্প, ভূমারার শিবমন্দিরাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। রাখাল-দাসের উড়িষ্যার ইতিহাস কেবল মাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত নহে, উহাতে ইংরেজাধিকার কাল পর্যন্ত উড়িষ্যার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাখালদাস ব্যতীত অপর কেহ উড়িষ্যার মত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জনপদের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের প্রথম দিকের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ। এই বিরাট গ্রন্থে কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও ইহা উড়িষ্যার ইতিহাস চর্চায় যুগান্তর আনিয়াছে। উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দু ও মুসলমান আমলের ইতিহাস, লেখমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-শিল্প, ভাস্কর্যরীতি সম্পর্কিত তাঁহার অগণিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে

রাখালদাসের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং অনুসন্ধিৎসার ব্যাপকতা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই বলিয়া আমরা বলিনা যে, রাখালদাস ভারতীয় সাংস্কৃতিব সর্বক্ষেত্রেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। যেমন ধরুন, তাঁহার গুপ্তযুগ সম্পর্কিত গ্রন্থখানিতেও সে যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা নাই।

রাখালদাসের বাংলার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'পাষাণের কথা'র নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগ, শশাঙ্ক ও ধর্মপালের রাজত্বকাল এবং মুঘল আমলের পটভূমিকায় তিনি যে উপন্যাস-গুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় রাখালদাসের পূর্বে ও পরে হিন্দু ও মুসলমান আমলের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু রাখালদাসের ঐ জাতীয় উপন্যাসের কাছে সেগুলি নিতান্ত নিষ্প্রভ। তাহার কারণ এই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা তাঁহাকে উপন্যাসগুলিতে যুগোপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতাদিগের মধ্যে এই প্রাচীন আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে আর কেহ রাখালদাসের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রতিভা ব্যতীত রাখালদাস অপূর্ব সংগঠনশক্তির অধিকারী ছিলেন। বম্বের Prince of Wales Museum-এর পুরাতত্ত্ব শাখাটি তিনিই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান তাঁহার সহযোগিতায় বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছিল। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির শাসনাবলী এবং সাহিত্য পরিষদের লেখমালার তালিকা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন।[১৭] তাঁহার চেষ্টায় সাহিত্য পরিষদের অনেক সংস্কার সাধিত হয়। এই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ও হরপ্রসাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

উপরে আমরা সংক্ষেপে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ও কৃতিত্বের বিষয় আলোচনা কবিলাম। কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁহার চবিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যে কেহই রাখালদাসের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও আতিথেয়তাব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কলি-কাতায় অবস্থানকালে তাঁহার গৃহে রোজ সন্ধ্যাবেলা সুপণ্ডিত বন্ধুবর্গের শুভাগমন হইত এবং নানা বিষয়ে আলোচনা চলিত। রাখালদাস ও তাঁহার গৃহিণী সাগ্রহে বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা করিতেন এবং সানন্দে তাঁহাদিগকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া গৃহে ফিরাইতেন।

পাদটীকা

১। ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র-কার্ত্তিক, ১৩৫৯ সাল, পৃষ্ঠা ১২-২২।

২। ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন-বৈশাখ, ১৩৬৩-৬৪ সাল, পৃষ্ঠা ১৪০-৫১।

৩। ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র-কার্ত্তিক, ১৩৬৪ সাল, পৃষ্ঠা ১-৮।

৪। New Series, Vol II, pp 77-83.

৫। ঐ, vol III, pp 459-70, vol, IV., pp 81 ff

৬। দ্রষ্টব্য February, 1908, pp 25-75.

৬ ক। 4th edition, 1924, p 271, note 1

৭। JASB, Vol VI, 1910, pp 429-36

৮। ঐ, pp 227-31

৯। ঐ, pp 237 ff, 245 ff, 271 ff, 457 ff, 465 ff, 467 ff

১০। দ্রষ্টব্য pp 10-11

১১। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩০, পৃষ্ঠা ১৪৯।

১২। JASB, NS, Vol. VI, 1910 pp 485-96, লেখমালানুক্রমণী, ১ম ভাগ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রাখলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্তি উৎসবে লেখক কর্তৃক পঠিত।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব তরুণ বাঙ্গালী সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন একমাত্র আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদারই জীবিত, রাখালদাস তাঁহাদের অন্যতম। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দুইপার্শ্বে অবস্থিত শতশত প্রাচীন নগরীর-ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কর্ণসুবর্ণের অনতিদূরে অবস্থিত বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেরণার উৎস যে কোনখানে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট হয় না। কারণ শৈশব ও প্রথম যৌবনেব দিনগুলির সাহচর্য্যে চেতনা উন্মেষ প্রকৃত ঘটনার মূল্যায়নের ইতিহাস। কেবল তাহাই নহে সমকালীন সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতিফলিত প্রতিক্রিয়া যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের দুইটি ভিন্নমুখী মানবিকতার পবিচয় সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য মনোবিজ্ঞানীব সাহায্য লওয়া প্রয়োজন হয় না। এই দুই ভিন্নমুখী মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীতে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস এবং দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই বিষয় আসে নাই। বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের রচয়িতা থুসিদাইদিসের যথেষ্ট প্রভাব আছে। আবার তাঁহার জীবনের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনেরও ঐক্য আছে। দুইজনেই স্রষ্টা, এবং সৃষ্টির আনন্দেই সমাহিত হইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালীন দুরারোগ্য ব্যধির করাল গ্রাসে পতিত হইয়াও ইতিহাসের অনুশীলন ব্যাহত হইতে দেন নাই। তাঁহার তথ্যনিষ্ঠ মনের পবিচয় ডাঃ অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী তাঁহার মৃত্যুর পর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বারাণসীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় ভগ্নস্বাস্থ্য ঐতিহাসিককে তিনি বলিয়াছিলেন "আর কেন, এখন পরলোকের চিন্তা করুন।" তাহার উত্তরে রাখালদাস বলিয়াছিলেন "পরলোকের যে অস্তিত্ব আছে তাহার প্রমাণ দিতে পার?"

বাল্য এবং কৈশোরের সামাজিক জীবনের প্রতিফলনের প্রশ্ন আগেই উল্লেখ করিয়াছি। কারণ এই সময় হইতে আমরা তাঁহার জীবনের অনেক প্রমাণ পাই। তিনি বলিতেন, বহরমপুর নবাবের দেশ, উনবিংশ শতাব্দীর সেখানকার ধনী-সমাজ অত্যন্ত বিলাসী ও অসংযমী ছিলেন। বিশেষতঃ যেখানে অর্থের প্রশ্ন। আমাব জ্যেষ্ঠতাত হেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনিয়াছি সেখানকার এক অভিজাত বংশের সন্তান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গহর জানকে রক্ষিতা রাখিয়াছিলেন। তিনি একদিন অপরাহ্ণে নর্ত্তকীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছেন, কারণ সময়ে চা পান হয় নাই। তখন তাঁহার

পকেটে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট ছিল তাহা জ্বালাইয়া গহরজানের চা তৈয়ারী হইয়াছিল।

অনেকে মনে করেন যে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পুরাতত্ত্বের প্রেরণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে রামদাস সেন মুর্শিদাবাদের সুসন্তান। সম্পর্কটা ঠিক আমি জানিনা, তবে অনুমান হয় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু এবং সহপাঠী ৺বোধিসত্ত্ব সেন বোধ-হয় রামদাসের পুত্র। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় কিছুদিন বহরমপুরে ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন এবং আমার পিতামহ আদালত হইতে ৺পূরণচাঁদ নাহারের নাবালকত্বের সময় তাঁহাদের এস্টেটের রিসিভার নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জেলা মুর্শিদা-বাদের কান্দী মহকুমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের প্রভাব বাল্য হইতে রাখালদাসের উপর নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল।

৺ পুরাতত্ত্ব-সর্বেক্ষণে দীর্ঘকাল কার্য করিবার সময় তাঁহার জীবনের ঘটনা-সমূহ কিংবদন্তীতে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাঁহার বহুধাব্যাপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এই সাহিত্য-পরিষদে পাওয়া যায়। আর একটা কথা বলিয়া আমার এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। তাহা হইতেছে তাঁহার একাধারে নির্ভেজাল ইতিহাসের সাধনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সাফল্য লাভ করা। সাহিত্য-সাধনায় কোন সহজ চমৎকৃতিতে তাঁহার প্রকৃতি মুক্তির সন্ধান পায় নাই। এই দুইটি গুণ তাঁহার সমসাময়িক কোন ভারতীয় ঐতিহাসিকের মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার উপন্যাসের অনেক চরিত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আবার কয়েকজন কাল্পনিকও আছেন। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে সুপ্রাচীন রোহিতাশ্ব দুর্গ ধবল-বংশীয় জাপিলীয় মহানায়কগণের অধীনে ছিল। জাপ্‌লা এখন ঠিক রোহিতাশ্ব দুর্গের অপর দিকে শোন নদীর তীরে অবস্থিত। জাপ্‌লা যাইবার জন্য একটি বন্ধুর গিরিবর্ত্ম বন্ধুঘাট পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। তবে এই ধবল-বংশের সহিত গুপ্ত সম্রাটগণের কোন সম্পর্কই ছিলনা। তাঁহারা কান্যকুব্জের গাহড়বল রাজ্যের সামন্ত ছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনা আচার্য্য সুকুমার সেন করিয়াছেন। তাঁহার এইসব উপন্যাসের মধ্যে Lytton এবং Sir Walter Scott এর প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। যেমন দেবধরের আত্মোৎসর্গ Last Days of Pompeii হইতে লওয়া। আজ আমার কথা এইখানেই সমাপ্ত করি। আপনারা যে আজ অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন তাহার জন্য আমি ও তাঁহার পৌত্র ও পৌত্রীরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার শতাব্দীর স্মৃতি-বার্ষিকী দেখিয়া যাওয়া হয়ত আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে না, সেই জন্য আমি শ্রীমদনমোহন কুমার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মীগণের নিকট অশেষ ঋণী।

রাখালদাসের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্তি উৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখালদাসের পুত্র শ্রীঅরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত।

লালন ফকির

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

লালন ফকিরের সাধনভূমি সেউড়িয়া গ্রাম। তা কুষ্টিয়া সহরের নিকটে কালীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। সেকালে 'হিতকারী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এখান হতে প্রকাশিত হত। সাধক লালন ফকির বিখ্যাত মানুষ ছিলেন, ঠিক বলতে কি তিনি বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যমণি ছিলেন। তাই তিনি যখন দেহরক্ষা করেন এই পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। তা হতে জানা যায়, তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল ১৭ই অক্টোবর, ১৮৮৯। তিনি খুব দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে তিনি ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর জন্ম বৎসর প্রায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই হিসাবে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মের দুইশত বছর পূর্ণ হয়েছে। সাধক লালন ফকির ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু, তিনি ছিলেন বাঙালীর গৌরব। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে তাঁর জন্মলগ্নের দুইশত বৎসর পরে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিব।

লালন ফকিরের জীবন ভারি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি সাধনার জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার নিকটে ভাণ্ডারিয়া গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা পদ্মাবতী ছিলেন ভস্মদাসের কনিষ্ঠা কন্যা ও তাঁর নিজের নাম ছিল লালন কর। প্রথম যৌবনে তাঁর বিবাহ হয়, এবং বিধবা মাতা ও পত্নীকে নিয়ে তিনি ভাণ্ডারিয়ায় সংসার পাতেন। [illegible] তারপর গ্রামের মানুষের সঙ্গে তিনি নদীপথে তীর্থভ্রমণে যান। তাঁর জীবনীকার বসন্তকুমার পালের মতে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর মতে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান। সম্ভবত দুটিই কিংবদন্তী। তবে মনে হয় শ্রীক্ষেত্রে যাওয়াই বেশী সম্ভব কারণ বহরমপুরের তীর্থক্ষেত্র হিসাবে খ্যাতি নাই। [illegible] তীর্থযাত্রা শেষ করে ফেরবার পথে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সহযাত্রীরা তাঁকে মৃত বলে ধরে নিয়ে মুখাগ্নি দিয়ে গঙ্গাতীরে ফেলে দিয়ে চলে যান। প্রায়শেই জোলাদের একটি পল্লী ছিল। সেখান হতে এক মুসলমান মহিলা নদীতে জল নিতে এসে তাঁকে দেখতে পান কিন্তু তিনি এবং প্রতিবেশীরা লক্ষ্য করেন তিনি তখনও মারা যাননি। মহিলাটি নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর সেবা ও শুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। তখন তিনি আবার নিজের গৃহাভিমুখে রওনা হন। [illegible]

আমরা এই তথ্য পাই শ্রীবসন্তকুমার পাল রচিত 'মহাত্মা লালন ফকির' নামে জীবনী

কোনও তাৎপর্য খুঁজে পায় না। তারা কোনও আনুষ্ঠানিক রীতি অনুসারে উপাসনা করে না, তীর্থ বা হজ করে না। হিন্দুও বাউল হয়, মুসলমানও বাউল হয়। তারা ঈশ্বরকে নিজের মনের মধ্যেই আবিষ্কার করে এবং তাঁকে অরূপ হিসাবে কল্পনা করে। হৃদয়ের মধ্যেই তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাদের সাধনা। সেই সাধনার বহিরঙ্গই হল বাউল সঙ্গীত। অসীম হয়েও মানুষের স্তরে নেমে এসে মানুষের মনে তিনি স্থান নেন এই ধারণায় তারা ঈশ্বরকে 'মনের মানুষ' বলে। একই কারণে রজ্জব বাউল তাঁকে 'নর-নারায়ণ' বলতেন।

(২)

একটা কাহিনী আছে যে শিলাইদহে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের লালন ফকিরের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। এ কাহিনী বসন্তবাবুর গ্রন্থে সমর্থিত (মহাত্মা লালন ফকির, পৃঃ ১৮)। এ বিষয় শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর গ্রন্থে একটি বিস্তৃত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এটা তাঁর শোনা কথা। কারণ, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, আর লালন ফকির দেহরক্ষা করেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই : একদিন রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহের কাছারি বাড়ীতে কাজ করছিলেন তখন সেউড়িয়া গ্রামের প্রজারা তাঁর কাছে দরবার করতে এসেছিল। দরবার শেষ হবার পর রবীন্দ্রনাথের নজরে এল যে একটি বিচিত্র ধরণের সাপমুখো লাঠি নিয়ে তাঁর সন্তানরা হৈ চৈ করছে। খবর নিয়ে তিনি জানলেন এটি লালন ফকিরের লাঠি। তখন তিনি সেটা ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। তারপর নাকি তিনি লালন ফকিরকে ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন (শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৬৭-৬৮)।

আমার মনে হয় এই কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। এটা নিশ্চিত সত্য যে লালন ফকিরের মৃত্যু হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ, এ তথ্য তদানীন্তন স্থানীয় পত্রিকা 'হিতকারী' হতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ওপর ঠাকুরবাড়ীর জমিদারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এসে পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ঠিক কখন হতে তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত ভাবে বলা শক্ত। তবে নির্দিষ্ট একটা তারিখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ইন্দিরা দেবীকে লিখিত জানুয়ারী ১৮৯০ তারিখের একটি চিঠি হতে (ছিন্নপত্রাবলী, ৬)। তাতে তিনি নিজেকে 'জমিদারবাবু' বলে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত লালন ফকিরের শিলাইদহে বারবার সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মনে রাখিতে হবে ঐ সময় লালন ফকিরের বয়স ১১৬ বৎসর হয়েছিল। বাইবেলের হিসাব অনুসারে মানুষের আয়ু ৭০ বছর। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়ে থাকে শত বৎসর মানুষের আয়ু হয়ে থাকে। কিন্তু এই সম্ভাব্য আয়ুর

দুই নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করেও লালন ফকির অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তা সম্ভব হলেও এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে তাঁর দেহ নিশ্চয় জরা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ছিল। এই প্রাচীন বয়সে জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে তাঁর শিলাইদহে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না।

তৃতীয়ত, লালন ফকিরের দরবার করতে এসে শিলাইদহে লাঠি ফেলে যাবার কাহিনীটি একেবারেই কল্পিত মনে হয়। বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সন্তানরা তাঁর ফেলে যাওয়া লাঠি প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন তিনি ১৩০৫ সালে প্রথম সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতে আরম্ভ করেন। তার সাত আট বছর আগেই লালন ফকির দেহত্যাগ করেছেন। সুতরাং এই সময়ে তাঁর শিলাইদহের কাছারি বাড়ীতে দরবার করতে আসা সম্ভব নয়। কাজেই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে এ কাহিনী একান্তভাবে কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে অন্যত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলেই যথেষ্ট হবে।

"রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল কিনা তার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনেরা বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।" (পৃঃ ১২৩)

তবে একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালে লালন ফকিরের রচিত বাউল সঙ্গীতের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। একথাও ঠিক যে বাউলদের তত্ত্ব ও তাঁর মনকে বিশেষ রকম আকৃষ্ট করেছিল। এ বিষয় তিনি তাঁর 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তাই দেখি তিনি লালন ফকিরের সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। অতিরিক্তভাবে আরও বলা যেতে পারে যে তাঁর সাধন-জীবনে লব্ধ নিজস্ব জীবন-দেবতা তত্ত্বের সহিত বাউল তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, বাউল যাঁকে 'মনের মানুষ' বলে তিনি তাঁকেই 'জীবন-দেবতা' রূপে উপলব্ধি করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে বাউল-সাধক-সম্প্রদায়ের কিছু বিবরণ এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে দিয়েছি। লালন ফকির বাউল সম্প্রদায়ের শিরোমণি ছিলেন। তাঁর অগণিত শিষ্য হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সমাজেরই মানুষ ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত গ্রামে গ্রামে মুখে মুখে ঘুরত। এখনও ঘোরে। শ্রীরণজিতকুমার সেন তাঁর যে জীবনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন 'বাউল রাজা'। সার্থক নামকরণ হয়েছে; কারণ তিনি সত্যই বাউলদের রাজা ছিলেন।

এখন লালন ফকিরের সঙ্গীত হতে চয়ন করে তাঁর সাধনায় যে উপলব্ধি হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করবার প্রস্তাব করি।

লালন ফকির স্বভাবতই ঈশ্বর-সচেতন মানুষ ছিলেন। পুঁথিজ্ঞানের পথে না গিয়ে হৃদয়ের পথে মনে নিষ্ঠা নিয়ে ঈশ্বরকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর ধারণায় যত পড়বে মনে তত ধাঁধাঁ লাগবে :

আত্মারূপো কর্তা হরি মনে নিষ্ঠা হলে
মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত
বেড়বি তত লখ্না (সন্দেহ)॥

তিনি 'মনের মানুষের' সন্ধান করেছেন বাইরে, কিন্তু সেখানে তাঁকে পান নি। তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁকে বাইরে পাওয়া যায় না, নিজের মধ্যেই পাওয়া যায় :

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়॥
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়॥

তার পরের অবস্থায় লালন ফকিরের উপলব্ধি হয়েছে যে তাঁকে বাইরে খোঁজা বিফল, সেই মনের মানুষকে মনের মধ্যেই খুঁজতে হবে। অতিরিক্ত ভাবে তাঁর ধারণা হয়েছে, তাঁকে ধরা যায় না, অর্থাৎ তাঁর শরীরী প্রকাশ নেই। তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়, কিন্তু তাঁকে ধরা যায় না। তাই তিনি ঈশ্বরকে 'অধর মানুষ' বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নীচে উদ্ধৃত সঙ্গীতের অংশটি দেখা যেতে পারে :

এই মানুষে দেখ চেয়ে সেই মানুষ আছে।
কত যোগী ঋষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়।
ও চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
অধর মানুষ তেমনি সদাই।
আছে আলেকে (অলক্ষ্যে) বসে।

তিনি যে ধরা দেন না, কারণ তিনি অরূপ, সে কথা লালন ফকির অন্যত্র এই ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণায় তিনি নিজে এবং তাঁর 'মনের মানুষ' একই জায়গায় অবস্থান করেন, অথচ তাঁকে ধরা যায় না :

আমি আর সে অচিন এক জন,
এ জগতে থাকি দুজন,
ফাঁক দেখি লক্ষ যোজন
গেলে ধরিতে।

তাঁকে প্রেমের সূত্রেই পেতে হয়, অন্যপথে তিনি ধরা দেন না। বহির্জগতে নয়,

অন্তরের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে, তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হয়। সেই রত্নকে পেলে বাহিরে খোঁজার প্রয়োজন হয় না :

প্রেম পাতি জাল পাতলে
তাতে অধর ধরা যায়।
রত্ন যে পায় আপন ঘরে
সে কি বাইরে খুঁজে মরে ?
না বুঝিয়া লালন ভেঙে
দেশ-বিদেশে যায়।

এই সাধনরীতি আধ্যাত্মিক দিক হতে কঠিন হলেও অন্য দিকে অতি সরল, কারণ, আনুষ্ঠানিক রীতি বিবর্জিত। অন্তরের মধ্যে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে তাঁকে পেতে হয়। সুতরাং এ সাধনায় উপাসনা নিষ্প্রয়োজন, তীর্থ-পর্যটনও অর্থহীন, কারণ যাঁকে চাই তাঁকে ত মনের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই লালন সাঁই বলছেন :

উপাসনা-নাই গো তার,
দেহের দলপ (সন্ধান) তার
কোথা কি মিলে ?
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সকল মিলে।

এ হেন সাধকের কাছে জাতিভেদ অর্থহীন। সাধনার বলে তিনি জাতিভেদকে অতিক্রম করে গেছেন, কারণ, তিনি যে 'মনের মানুষকে' আবিষ্কার করেছেন তিনি কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেবতা নন, তিনি বিশ্বমানবের। তাই তিনি বলছেন :

সবে বলে লালন ফকির
হিন্দু কি যবান,
লালন বলে, আমার আমি
না জানি সন্ধান।
এক ঘাটেতে আসা-যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেয়া,
তবে কেউ খায় না কারও ছোঁয়া।
ভিন্ন জল কোথায় পাস ?

লালন-চরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য

মুহম্মদ আবু তালিব
সহকারী অধ্যাপক,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁব নাম লালন সাঁই বা শাহ। পিতা দরীবুল্লাহ দেওয়ান, মাতা আমিনা খাতুন। জন্মস্থান যশোর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রাম। গ্রামটি বর্তমানে হরিণাকুণ্ডু থানা ও ডাকঘর সাধুগঞ্জের এলাকাধীন। তাঁর গুরু বা পীরের নাম সিরাজ সাঁই, প্রকাশ্য নাম শিরাজ শাহ্। ইনিও হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বাংলা ১১৭৯ সালের ১লা কার্তিক, মুতাবিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁর জন্ম হয়, এবং ওফাত বা মৃত্যুর তারিখ ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক, শুক্রবার, মুতাবিক ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সমস্ত খবরই মিলেছে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য এবং স্বগ্রামনিবাসী দুখ মল্লিক ওরফে দুদ্দু শাহ লিখিত একটি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথিতে (রচনা ১৩০৩ সাল, ১৮৯৬ খ্রীঃ)।[১] বলা বাহুল্য, এতদিন ধরে লালনের ব্যক্তিজীবন, ধর্ম ও সময়কাল নিয়ে যে সব বাক্-বিতণ্ডা চলছিল দুদ্দু শাহেব পুঁথিখানি প্রাপ্তিতে তার প্রায় সকল সমস্যারই সমাধান হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রচলিত জীবন-কাহিনীর জট উন্মোচনের সহায়ক প্রাসংগিক বিবিধ দলীল-দস্তবীজও সম্প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে, বর্তমান নিবন্ধে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পেশ করা যাচ্ছে।

॥ ১ ॥

॥ দুদ্দু শাহের বিবৃতি (লালন শাহের আত্মচরিত) ॥

একটি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথি। সাইজ ৯৳" × ৫৳" ইঞ্চি, পয়ার ছন্দ, চরণ সংখ্যা ১৪৮। একটি চরণ বন্দনামূলক এবং তা প্রথমেই সন্নিবিষ্ট এবং অতিরিক্ত। চরণটি নিম্নরূপ—

"মানুষ গুরু লালন সাঁই দরবেশের চরণ সহায়।"[২]

এই বিবৃতি থেকে জানা যায়, লালন ১১৭৯ সালের ১লা কার্তিক (= ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ) যশোর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমাস্থ হরিষপুর বা হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁর ইন্তিকাল হয় ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক, শুক্রবার (= ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর)। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, তাঁর মৃত্যুর সময়ে কুষ্টিয়া (সমকালীন নদীয়া) থেকে 'হিতকরী' নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত তার একটি খণ্ডিত সম্পাদকীয় বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, সে বৎসর ১৭ই অক্টোবর, শুক্রবারে তিনি ইন্তিকাল করেন। 'হিতকরী'তে উল্লিখিত সাল সম্পর্কিত অংশটুকু খণ্ডিত থাকায় এ নিয়ে আমাদের পরবর্তী সুধী মহলে

অনেক বাক্-বিতণ্ডা চলে, পরে পঞ্জিকা দৃষ্টে স্থিরীকৃত হয় যে, উল্লিখিত তারিখ ছিল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শুক্রবার, মুতাবিক বাংলা সনের ১লা কার্ত্তিক, ১২৯৭ সাল।[৩] দুদ্দু শাহের বিবৃতিটিতেও সুস্পষ্টভাবে—"পহেলা কার্ত্তিক শুক্রবারের" উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তাই "হিতকরী" উল্লিখিত দিন ও তারিখ যে যথার্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত কলমী পুঁথিখানিতে 'বারশ পঁচানব্বই বাংলা সনের' উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ওটি পুঁথির ভ্রান্ত পাঠ। মূল পাঠ হবে 'বার স সাতানব্বই'। কেন না, ১২৯৫ সালের ১লা কার্ত্তিক শুক্রবার নয়—বুধবার ; এবং ১২৯৮ সালেরও ১লা কার্ত্তিক (১৭ই অক্টোবর) শুক্রবার নয়—শনিবার।

অতএব সাতানব্বই সালের ১লা কার্ত্তিক এই গ্রহণযোগ্য পাঠ। এবার মূল পাঠটি উদ্ধৃত করা যাক—

"এগার শো উনআশি কাত্তিকের পহেলা
হরিশপুরে গ্রামে সাঁইর আগমন হৈলা।
যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয়
উক্ত মহকুমাধিন হরিশপুর হয়।
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাহার
বংশ পরম্পরা বাস হরিশপুর মাঝার।
দরীবুল্লা দেওয়ান তার আব্বাজির নাম
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।

* * *

বারশত 'সাতানব্বই' বাঙ্গলা সনেতে
পহেলা কার্ত্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে।
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল।"*

হরিশপুর শুধুমাত্র জন্মভূমিই নয়—এখানে তাঁদের বংশ-পরম্পরায় বাস। সেখানে অদ্যাবধিই তাঁর ও তাঁর গুরু সিরাজ সাহের অধস্তন বংশধরগণ অতি দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করছেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কেও দুদ্দু শাহের বিবৃতি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, হাতের একটি প্রমাণ বাইরের দশটি অনুমানের চেয়ে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

দুদ্দু শাহ যে শুধু মাত্র তাঁর জন্মভূমির ও জন্ম-মৃত্যুর সঠিক বিবৃতি দিয়েছেন তাই নয়, তিনি স্বয়ং লালনের কাছ থেকেই এ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন। অন্য কথায় এটি স্বয়ং লালনেরই আত্মজীবনবৃত্ত। দুদ্দুর সমসাময়িক আবদুল ওয়ালী সাহেবও তাঁর বিবৃতির সমর্থন জানিয়েছেন। যেমন "He (Lalan) was a disciple of Shiraj Shah and

both were born at the village Harishpur, sub-division Jhenedah, District Jessore)"[৫] লক্ষ্য করবার বিষয়, আবদুল ওয়ালী লালন-সিরাজের শুধুমাত্র বাসস্থান হিসাবে হরিশপুরের উল্লেখ করেননি, বলেছেন,—'জন্মভূমি'। এতদ্ব্যতীত লালনের মাজারও দরগাহ যে কুষ্টিয়া শহরের অদূরে ছেঁউড়ে নামক মৌজায় অবস্থিত, আবদুল ওয়ালী সাহেব সে কথাও উল্লেখ করেছেন। দুদ্দু শাহের পূর্বোক্ত বিবৃতি থেকে আরও জানা যায়, দুদ্দু নিজে এর লেখক হ'লেও আসলে এটি লালনেরই আত্মকথা, এবং এ কাহিনী তাঁর নিজের কানেই শোনা—তাই একে লালন শাহের আত্মচরিতের শ্রুতিলিপি বলা যায়, যেমন—

"আলম ডাঙ্গা গ্রামে শুকুরশার আশ্রমে
আরজি করিনু আমি আতব নির্জনে।
দয়াল দরদী সাঁই করুণা করিয়া
কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া।
এত শুনি দয়াল সাঁই মোর পানে চায়
মৃদু হাসি এই দাসে যাহা কিছু কয়।
বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া
সাঁইজির ছিল মানা নাহি প্রকাশিয়া।
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া।
এ কারণে শেষ কালে লঙ্গি তার বাণী
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী।"[৬]

দুদ্দু কথিত শুকুর শাহও লালনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য এবং উত্তরাধিকারী। উক্ত গ্রামে তাঁদের আধ্যাত্মিক বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। মনে হয়, সমকালে লালন শাহের বিরুদ্ধবাদী দল তাঁর সম্পর্কে নানা সত্যমিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছিল, বিশেষ করে বাহ্য শরীয়ত পন্থী মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ তাঁর অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে নিতান্তই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলো। দুদ্দু শাহের রচনাতে, প্রকাশ্যে না হোক, পরোক্ষভাবে তার উল্লেখ আছে মনে করি। বিশেষভাবে তাঁর জীবনকালে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বাহাস-বিতর্ক সম্পর্কিত বিবরণের মধ্যে তার আভাস মেলে। যেমন,—

"নানা দেশ হতে শেষে আসে নানা জন
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন।
চক্কর ফক্কর আর মানিক মলম
কোরবান মনিরদ্দিন আসে কতজন।
কতজন ছিল মোর প্রভুর গোলাম
কি কব তাদের পদে হাজার সালাম।"[৭]

স্বয়ং দুদ্দু শাহই এ ভাবে বাহাস করতে এসে তাঁর কাছে 'বয়াত' হন বা দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরই ভাষায় :

"বাহাছ করিতে গিয়া বয়াত হইনু
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু।"

এই 'বয়াত' হওয়া মানে ধর্মান্তরিত হওয়া নয়, দীক্ষা গ্রহণ করা। সম্প্রতি দুদ্দু শাহ উল্লিখিত শুকুর শাহের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে "ছহি আক্কেল নামা" শীর্ষক একখানি প্রাচীন কলমী পুঁথি উদ্ধৃত হয়েছে। পুঁথিখানিতে এই শ্রেণীর চারটি বিশেষ 'বাহাস' বা বিতর্ক সভার বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'য়েছে।[৮] এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

॥ ২ ॥

॥ "অধম কাংগাল বিরচিত—
ছহি আক্কেল নামা ॥"

কলমী পুঁথি। প্রাচীন হস্তাক্ষর। সাইজ ডবল ডিমাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০। লেখকের পরিচয় নেই, শুধুমাত্র "অধীন কাঙ্গাল" ও "অধম কাঙ্গাল" ভণিতা আছে। এই অধম কাঙ্গাল যিনিই হোন না কেন, তিনি তাঁর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। কাঙ্গাল তাঁর গ্রন্থে লালনের পরিচয় স্বরূপ লিখেছেন :

"ছেঁউড়ে নামেতে গ্রাম কালি গঙ্গার টাটে
মহকুমা কুষ্টিয়া সেই গ্রামের নিকটে।
ভালুকা থানার সেই শরহদ্দ জাহির
সেই গ্রামে আছে একজন দরবেশ ফকির।
ছেরাজ সাই দরবেশের ভালেক লালন শা তার নাম
মুলুকে যার ছন্দ গান রচনা তামান ॥"[৯]

এর পরেই বাহাসের বর্ণনা। প্রথম বাহাসটি হয় স্থানীয় হিজলী বটগ্রামের মুন্‌শী তোফাজ্জেল হোসেন ও তাঁর অনুসারীদের সংগে। নিতান্তই ধর্মীয় বাহাস। বাহাস হয় শরীয়ত-মারফতে নিয়ে। বাহাসে মুন্‌শী সাহেবের পরাজয় হয়। কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, মুনশী সাহেব লালনকে বে-শরা ফকির বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু লালন তাঁর প্রশ্নের এমন সব শাণিত উত্তর দেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, মুনশী সাহেব নিতান্তই নাজেহাল হন। উল্লেখ্য যে, লালন কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী ছেঁউড়ে গ্রামে আস্তানা স্থাপন করে শেষ জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। এ-ব্যাপারে তাঁর গুরু সিরাজ শাহের নির্দেশ ছিল বলে কথিত হয়। দুদ্দু শাহের পূর্বোক্ত বিবৃতি থেকে জানা যায়, যৌবনকালে রাজশাহী জিলার 'খেতুরী' নামক গ্রামের বিখ্যাত বৈষ্ণব মেলা[১০]

দর্শনান্তে নৌকাযোগে দেশে ফেরার পথে কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সংগিগণ কর্তৃক ছেঁউড়ে গ্রামের প্রান্তদেশে নদীস্থলে পরিত্যক্ত হন। এবং উক্ত গ্রামের মলম সর্দার ও তাঁর স্ত্রী কর্তৃক তিনি উদ্ধৃত হন।

॥ ৩ ॥

॥ প্রচলিত বিশ্বাস মতে লালন-জীবনী ও তার প্রবক্তাগণ ॥

প্রচলিত বিশ্বাস মতে, লালন জন্মগতভাবে কায়স্থ-সন্তান ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম পদ্মাবতী ও মাতামহের নাম ভস্মদাস এবং জন্মস্থান কুষ্টিয়া (পূর্বতন নদীয়া) জিলার ভাঁড়ারা গ্রাম। লালন-জীবনীকার শ্রীবসন্তকুমার পাল মনে করেন, ভাঁড়ারা গ্রামের লালনের আসল নাম ছিল লালনচন্দ্র দাস, ভাঁড়ারার ভৌমিকদের ইনি জ্ঞাতি ছিলেন।[১১] যৌবনের প্রাক্কালে ইনি কাশী বা পুরী তীর্থস্থান থেকে ফেরার পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ছেঁউড়ে গ্রামে পরিত্যক্ত হওয়ার পর ইনি ফুলবাড়ী গ্রাম-নিবাসী জনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট ইসলাম ধর্মে, মতান্তরে বাউল বা ফকীরী ধর্মে, দীক্ষিত হন।

কিন্তু দুদ্দু শাহ বলেন, হরিশপুরের দরীবুল্লাহ-নন্দন লালন উক্ত গ্রামেরই শিরাজ শাহের নিকট বয়াত হন এবং এই হরিশপুর গ্রামই পার্শ্ববর্তী কুলবেড়ে গ্রামের সংগে যুক্ত হয়ে কুলবেড়ে বা কুলবাড়ী-হরিশপুর নামে (ফুলবাড়ী নয়) পরিচিত হয়। অতএব ফুলবাড়ী নামটি কুলবাড়ীরই ভ্রান্ত পাঠ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, দুদ্দু শাহ ও বসন্ত বাবু উভয়েই লালনকে শিরাজ শাহের শিষ্য বলেছেন, তবে বসন্তবাবুর মতে, লালন কায়স্থ-সন্তান। কিন্তু তিনি কি সত্যি সত্যিই কায়স্থ-সন্তান? এ-সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন দুদ্দু শাহ। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

লালন নবদ্বীপে ভ্রমণকালীন জনৈক বিধবা কায়স্থ-রমণীর বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর নাম পদ্মাবতী। খুব সম্ভবত রমণীকে লালন মাতৃ-সম্বোধন করতেন। তাঁর আশ্রয়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। দুদ্দুর ভাষায় :

পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে নিয়ে গেল দেই ক্ষত্রধনী॥

মনে হয়, কিংবদন্তী আকারে এই কাহিনী বিস্তৃত হয়, ফলে লালন ও পদ্মাবতীর সন্তান রূপে পরিচিত করে তা হ'লে কি বসন্তবাবুর বিবৃতি ভুল? না তাও ঠিক নয়। বসন্তবাবুর তথ্য কিংবদন্তীভিত্তিক। নানা জনশ্রুতি, ব্যক্তিগত বিবৃতি ও স্মৃতি-কথা মিলিয়ে তিনি তাঁর কাহিনী নির্মাণ করেছেন।

তাঁর পদ্মাবতী-লালন কাহিনীরও একটি সমাধান মিলছে আলোচ্য দুদ্দু শাহের বিবৃতি মারফত। আগেই বলা হয়েছে, ভাঁড়ারায় নয়—নবদ্বীপে উদ্দেশ্যহীন ভাবে

ভ্রমণকালীন লালন এক কায়স্থ-বিধবা রমণীর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। এই রমণীর নামও ছিল 'পদ্মাবতী'। দুদ্দু পদ্মাবতীর বিস্তারিত পরিচয় দেন নি। তবে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, বেশ কিছুদিন পদ্মাবতীর গৃহে তিনি অবস্থান করেন। তখন লালন সবে মাত্র কৈশোর কাল অতিক্রম করেছিলেন। কিম্বদন্তী মতে, লালন পদ্মাবতীকে ধর্মমাতার আসন দিয়েছিলেন। জীবনের শেষাবধি এই মহিলার সংগে তাঁর ধর্ম সম্পর্ক বজায় ছিল। খুব সম্ভব পরবর্তীকালে লোকমুখে প্রচলিত হওয়ায় কাহিনীটি রূপান্তর লাভ করে বসন্ত বাবুর হস্তগত হয় এবং সুধীমহলে লালনের আসল কাহিনীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিখ্যাত গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্বয়ং ক্ষেত্রানুসন্ধানে গিয়ে বসন্তবাবু প্রমুখের বর্ণিত কাহিনীর কোন প্রামাণ্য বিবরণী সংগ্রহ করতে পারেন নি। তিনি তাই স্পষ্টই বলেছেন—"লালনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। আমি কয়েক বছর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন কথা শোনা যায় তাহা প্রায়ই জনশ্রুতি। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য হিসেবে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।"[১৮] দুঃখের বিষয়, ভাঁড়ারার মত হরিশপুরে গিয়ে লালন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ তাঁর হয় নি, ফলে হরিশপুর সম্পর্কিত কথা-কিংবদন্তীর মধ্য থেকে প্রাপ্ত লালন-জীবনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হ'য়েছেন। অনুরূপভাবে বঞ্চিত হ'য়েছেন বসন্তকুমার পালও। বর্তমান নিবন্ধকারের নিকট লিখিত একটি পত্রে বসন্তকুমার বাবু এ-কথা স্বীকারও করেছেন যে, পূর্বোক্ত দুদ্দু শাহ বা আবদুল ওয়ালীর পূর্ব লিখিত ও প্রকাশিত বিবৃতির কথা তিনি ইতিপূর্বে জানতে পারেন নি, বা কোথায়ও দেখেনও নি। তবে তিনি লালনের সাক্ষাৎ শিষ্য ভোলাই শাহ ও ভাংগরী ফকিরাণীর নিকট অনেক কাহিনী শুনেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে যা জেনেছেন তাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন (১৯৫৪)। এ মত অবস্থায় তাঁদের বর্ণিত কাহিনীকে কি ভাবে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায়?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি কুষ্টিয়া কাছারীর মহাফেজ খানা থেকে একটি প্রাচীন পর্চায় জনৈক আনন্দ শাহের পুত্র লালন শাহের নাম ও পরিচয় উদ্ধৃত হ'য়েছে। ইনিও ভাঁড়ারা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। অধিকর্তাগণ তাই মনে করেছেন, খুব সম্ভব, ইনিই বসন্তবাবু-কথিত আসল লালন শাহ। কিন্তু মুশকিল হ'য়েছে এই যে, ইনি 'মুসলিম সন্তান'[১১] আর বসন্ত বাবুর মতে লালন 'কায়স্থ-সন্তান'। তা হ'লে আনন্দ-নন্দন লালন শাহ আবার কে? বলা বাহুল্য, পূর্ব-বর্ণিত লালন-জীবন-কাহিনী, যা প্রামাণ্য দলীল পত্রের মারফত উদ্ধৃত হ'য়েছে তার প্রেক্ষিতে ভাঁড়ারার এক অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে আসল লালনের স্থানে কিছুতেই বসানো যেতে পারে না। এবং বলা বাহুল্য, কালের দিক দিয়েও ইনি লালনের অনেক পরবর্তী। তাই সাধক-কবি লালন একজনই, তাঁর জন্মস্থান হরিশপুরে এবং কর্মস্থান ছেঁউড়ে, এ-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

॥ ৪ ॥

॥ আক্কেল নামার কাহিনী ॥

এবার "ছহী আক্কেল নামা" অবলম্বনে লালনের জীবন কাহিনীর একটি বিশেষ অধ্যায়ের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে। বলা হয়েছে লালনের নাম তখন এত বেশী পরিচিত ছিল যে, সিরাজ শাহের শিষ্য এবং ছেঁউড়ের লালন শাহ বললে সকলেই এক ডাকে চিনতে পারত। 'আক্কেল নামা' লেখকও তাই এক কথায় পরিচয় দিয়েছেন—"শিরাজ শাহ্ দরবেশের তালেব লালন শা তার নাম।" সুফী পরিভাষায় 'তালেব' অর্থ শিষ্য, মুরীদ। আর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি হওয়ায় লালন-জীবনীর প্রামাণ্য উপাদান হিসেবে দুদ্দু শাহের বিবরণীর পরেই অধম কাংগালের এই বিবৃতির স্থান দেওয়া যেতে পারে। কাহিনীটি দুদ্দু শাহ্ বর্ণিত কাহিনীরও সমর্থন করেছে। যেমন, চড়োইকোন গ্রামে লালনের সঙ্গে তোফাজ্জেল হোসেন মুন্সী ও তাঁর অনুচরদের সঙ্গে এক বাহাছ অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল বলে কাংগাল উল্লেখ করেছেন। এই বাহাছটির উল্লেখ কবি জসিমউদ্দীনের একটি প্রবন্ধেও আছে। দুদ্দু শাহও বলেছেন, তিনি নিজেও এবং মনিরউদ্দীন শাহ সহ অনেকেই তাঁর সঙ্গে তর্ক করে পরাজিত হয়ে তাঁর মতে দীক্ষিত হন ইত্যাদি। "আক্কেলনামা"[৩] কার তাঁর গ্রন্থে চারটি বিশেষ বাহাছের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বয়ান করেছেন। তিনি বাহাসের স্থান, বাহাছকারিদের নাম, ঠিকানা এবং বিশেষ বিবরণীও প্রদান করেছেন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে বিশেষ বিবরণী উদ্ধার করতে পারেন, ও তার সত্য মিথ্যা যাচাই করেও দেখতে পারেন। বর্তমান নিবন্ধকারও ব্যক্তিগতভাবে এসব বিষয়ে যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন, এবং সপক্ষে সত্য সাক্ষ্যও লাভ করেছেন। এখানে সুধী-সমাজের অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ তুলে দেওয়া যাচ্ছে—

লালন শা ফকির কহে মুন্সী বরাবর
ছোস্তালের জোয়াব তুমি দেহতো আমার।
পহেলা শরিয়ত সিড়ি বলিয়াছ তুমি
একে একে তাহা সব জিজ্ঞাসিব আমি।
সরিয়ত ঘরের সিড়ি ঘর মারুফত
সখ নাহি আমার তাতে কহিলাম নেহাত।
চড়িয়া সিড়ির পরে খাড়া যদি থাকি
না হেঁটে কেমনে ঘরে যাই বল দেখি।
সরিয়ত হইলে হাচেন মারুফতে যাবো
হইল কি না হইল প্রমাণ কিসে পাবো।
গাছের ফল কাঁচা পাকা রঙ্গে যায় চেনা

কাঁচায় যে রং থাকে পাকিলে থাকে না।
কাজে কাজে এই মতো আছায় লক্ষণ
যেরূপ সাধকের বেলা সিদ্ধির নয় তেমন।
কি নিশান দেখিলে বুজি সরিয়ত হাছেল
খোলাছা করিয়া তাহা কহতো ফাজেল।
আন্দাজী না কহিও বাত কহ হাদিছ মতে
কবে হবে সরা হাছেন যাবে মারুফতে।[১৪]

লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, বাহাসে লালন নিজেকে সুস্পষ্টভাবে বা-শরা বা শরীয়ত পন্থী মুসলিম ফকির বলে দাবী করেছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মুনশী সাহেবকেও 'আন্দাজী' কথা না বলে 'কুরআন হাদিস' অনুসারে যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেছেন। পক্ষান্তরে, বাহাসকারী মুনশী তোফাজ্জল হোসেন সাহেব তাঁকে বে-শরা ফকীর বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, "আক্কেল নামা" লেখক লালন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও একটি বিশেষ মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন তা এই যে, সমকালীন লালন-বিদ্বেষিগণ লালন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে নানা অপবাদ রটাতো। শুধু তাই নয়—এ সম্পর্কে কতিপয় পুঁথিপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুঁথি পত্রের মধ্যে "জালালাতোল ফোকরা" নামক একখানি ছাপা পুঁথির উল্লেখ করে লেখক মন্তব্য করেছেন—

হাদিচের কওল যাহা লিখিলাম তাই।
ছাদেক নছিরদ্দির মতো না বুঝিও ভাই।
কিবা বুজ বুঝিল ভাই ছাদেক নছরদ্দি।
না মেলে তুলনা তার বারো ভাটির মদ্দি।
আল্লা করে এমন বুজ কার নাহি হয়।
এমন বুদ্ধির লোক আখের ঠেকিবে সে দায়।
ফকির বেশে কোন বোম্বেটে কোথা হইতে আইল।
ছাদেক নছরদ্দির ভাগ্যে দর্শন পাইল।
তাহাদের বাটীর কিবা অন্য বাটীর মাঝে।
মন বুঝিতে জায়ে কিবা কি করিল পাছে।
ঐ জানে আর সেই জানে আর জানে সেই মাগি।
আর জানে সেই উপর হাকিম সর্ব ঠাঁই জার আঁখি।
ছাচ্ছা কিবা মিছা তাহা আর কেহ না জানি।
পুঁথি লিখে জাহের ঐ করিল তাহাই মুনি।
পাগলা পাগলির খেলা কেইছা তায়ে দেখাইল।

দেখিয়া সে ভাল মানুষ বেজার হইল।
বেতথ ঘটনা সে জে দেখিল এমন।
গোপ্তে কেন তারে নাহি করিল শাসন।
উদখ্যাদার মত শোশে খেয়ে বুদ্ধির মাথা।
তামাম ফকির তুশে বাঁদিল কবিতা।
রিজিষ্টারি মোহর ছাপা করিল তার পরে।
জানাইতে মনে তুদ্দু সহর নগরে।
পরমার্থে হাত দিয়াছে ঝুট যদি কেউ জানে।
মহর ছাপাইল তার বিশেষ কারণে।
অন অধিকার প্রবেশ করি খাইয়াছে সে মধু।
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল ছিঁড়েছে এই করে কি সাধু।
ইহাই ভাবিয়া শেষে বেজায় খ্যাপিল।
কামড়াইল কার তার দিশে না করিল ॥

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

॥ ৫ ॥

॥ "জালালতুল ফোকরা" ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥

"জালালতুল ফোকরা" মুন্সী ছাদেক আলি ও মুন্সী নছরদ্দী কর্তৃক রচিত। পুঁথিখানি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। উক্ত পুঁথিতে লালনশাহী ফকির সম্প্রদায়ের আচার আচরণের যে সব বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে "সহী আক্কেল নামা"য় তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। লেখকের ভাষায় 'বেতুথ' বা 'বেতথ্য' ঘটনা অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ও নিতান্তই অজ্ঞতা-প্রসূত। পরবর্তীকালে লিখিত 'বাউল ধ্বংস ফতওয়া' নামক পুস্তিকাতেও এরূপ কিছু কিছু জুগুপ্সিত চিত্র উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। আবদুল ওয়ালী সাহেবের পূর্বোক্ত প্রবন্ধেও জনৈক কারামতুল্লাহ শাহ লিখিত "মনোরঞ্জন উচিত কথা" শীর্ষক এই ধরণের আরও একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত গ্রন্থখানিও আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। তবে "বাউল ধ্বংস ফতওয়া" ও সেই গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দুস্তান-নিবাসী আর্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজীর "সত্যার্থ প্রকাশ" গ্রন্থ দু-খানি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। ফলে, সত্যের অনুরোধে বলতে হ'চ্ছে যে, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতাগণও নিতান্তই অন্ধ বিশ্বাস এবং একটি পূর্বনির্ধারিত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে এ-সব উক্তি করেছেন। অবশ্য স্বামী দয়ানন্দের গ্রন্থে বর্ণিত অনাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বাঙলার তথাকথিত বাউল সম্প্রদায় তথা লালন শাহী ফকীর সম্প্রদায় পড়ে কিনা, তা ধীর স্থির চিত্তে

বিচার করে দেখতে হবে। কেননা, তিনি তাঁর গ্রন্থে বাঙলা দেশের সম্প্রদায় সমূহের নাম তো করেনই নি, উপরন্তু তাঁর গ্রন্থ মুসলিম ফকির সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে লেখাও নয়।[১৫]

বস্তুতঃ লালন শাহ ও তাঁর সম্প্রদায়কে বুঝতে গেলে "ছহী আক্কেল নামায়" বর্ণিত গ্রন্থ কিতাবগুলি বিশেষভাবে পড়া দরকার, কেননা এ যাবৎ লালন ফকীরকে সাধারণভাবে তথাকথিত বাউল ফকীরদের সঙ্গে একত্র করে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ লালনের মৃত্যুকালীন 'হিতকরী' পত্রিকায় যে মন্তব্য করা হয়, তাতে স্পষ্টভাবেই লালন সম্প্রদায়কে তথাকথিত বাউল সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে দেখা হয়েছে, যথা—"সম্প্রতি সাধু সেবা বলিয়া এই মতের নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। সাধু সেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মত অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবার ও বাউলের দলের যে কলঙ্ক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধু সেবা অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহাপাপ।"[১৬] এখানে বাউল, সাধুসেবা এবং লালন সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে বিচার করা হ'য়েছে। আরও কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, হিতকরীর এই বিবৃতির অপব্যাখ্যা করেছেন বিখ্যাত-বাউল তত্ত্ববিদ্ ডক্টর শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। হিতকরীর বিবৃতিটিকে ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন—

—"হিতকরী পত্রিকায় লালনের যে মৃত্যু সংবাদ এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আছে যে, সাধু সেবা নামে লালনের শিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার চলে এবং অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে বলিয়া তাঁহাদের সন্তানাদি হয় না।"[১৭] এই উক্তি সত্যের অপলাপ মাত্র। লালন বিবাহিত ছিলেন। তবে তাঁর কোন সন্তানাদি হয় নি। ছেঁউড়ের দরগাহ চত্বরে লালনের কবরের পাশেই লালনের স্ত্রী মতিবিবির কবর আছে। আবদুল ওয়ালী সাহেবও লালনকে বিবাহিত বলে উল্লেখ করেছিলেন। কবি জসীমউদ্দীন সাহেবের মতে, লালনের স্ত্রীর নাম 'বিশোকা', তিনি জমীর খোনকারের কন্যা ছিলেন।[১৮] মতান্তরে, মতিবিবি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম। উভয়েই নিঃসন্তানা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

॥ ৬ ॥

॥ পাট্টা ও কবুলিয়ত দলীল প্রসঙ্গ ॥

সম্প্রতি লালন কর্তৃক সম্পাদিত জমিজমা সংক্রান্ত দু'টি পাট্টা ও দুটি কবুলিয়ত দলীল যথাক্রমে লালনের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ও যশোর রেজিষ্ট্রী অফিস লাইব্রেরী থেকে নিবন্ধকার কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।[১৯] সেগুলি সমকালীন শৈলকুপা সাব রেজিষ্টারী অফিস থেকে রেজিস্ট্রীকৃত হয় যথাক্রমে ১২৮৭ ও ১২৮৮ সালে (১৮৮১ সালের ১৯ জানুয়ারী ও

১৮৮২ সালের ২৮শে জানুয়ারী) সম্পাদিত হয়। তখন শৈলকুপার সাবরেজিষ্টার ছিলেন জনাব হামিদ উদ্দীন মুহম্মদ। দলীলগুলি থেকে জানা যায়, স্থানীয় ভড ফতেজঙ্গপুরের নিকটস্থ রামচন্দ্রপুরের অন্তর্গত মৌজে পরমানন্দপুরে একটি আখড়া বা আস্তানা প্রতিষ্ঠাকল্পে এই জমী খরিদকৃত হয়। লালন উভয় জমীরই অনুকূলে কবুলিয়ত লিখে দেন। দলীলে লালন নিজেকে 'মৃত সেরাজ সাঁই'-এর পুত্র এবং 'জাতীয় মুসলমান' বলে উল্লেখ করেছেন। পাট্টা দলীলে জমীর মালিক প্রাণনাথ সাহা, পাঁ হরচন্দ্র সাহা ও বৈদ্যনাথ সাহা পাঁ উমাচরণ সাহা, সাকীন ফুলহরির উল্লেখসহ মালিকের দস্তখত আছে। কবুলিয়তেও লালন সাঁই-এর পরিচয়, সাকীন ছেঁউড়ে, জাতি মুসলমান ইত্যাদির উল্লেখ আছে। তদুপরি লালনের নিজের হাতের দস্তখত আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁর কয়েকটি হিন্দী ও উর্দু গানও সম্প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে। তাই এতদিন যে তাঁকে নিরক্ষর লোককবি মনে করা হ'ত, বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণে তা অসত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কবুলিয়ত দুটিতে লালন অন্ততঃ দশটি দস্তখত করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই যে, লালন নিজেকে মৃত সেরাজ সাঁই-এর পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বলা হ'য়েছে, সিরাজ ছিলেন লালনের আধ্যাত্মিক পিতা বা গুরু, অবশ্য তিনি তাঁর পালক পিতাও বটে। আগেই বলা হয়েছে, শিষ্য দুদ্দু শাহের কাছে তিনি যে পরিচয় বিবৃত করেন, তাতে পিতা ও মাতার নাম ছিল যথাক্রমে দরীবুল্লাহ দেওয়ান ও আমিনা খাতুন। দাদার নাম গোলাম কাদির। হরিশপুর গ্রামে তাঁদের নামে ভিটা ও স্মৃতি-চিহ্নাদি বিদ্যমান রয়েছে। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, অধ্যাত্মবাদী ফকীরদের কাছে, গুরু পীরের পরিচয়ই প্রধান, ব্যক্তি-পরিচয় তাঁদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। লালনের গানে সিরাজ শাহের নাম পীর বা গুরু হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় দলীলেই সাব-রেজিষ্টার হামিদ উদ্দীন মুহম্মাদের দস্তখত আছে। আরও উল্লেখ্য যে, দলীল-দাতা দলীলে লালনকে বিশেষ "মাননীয় ও সম্ভ্রান্ত মনুষ্য বিধায় অতি কোন নিরিকে পাটা" লিখে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাই বলতে দোষ নেই, সমকালে লালন নিতান্তই সম্মানী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। স্ব-সমাজেও তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে যে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণও মিলেছে পূর্বোক্ত 'সহী আক্কেল নামা' গ্রন্থে বর্ণিত 'বাহাস' বা বিতর্ক সভা সংক্রান্ত বিবরণীতে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য দলীলে সিরাজ শাহকে পিতা বলে উল্লেখ করায় কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করেছেন যে, লালন যদি দরীবুল্লাহ দেওয়ানের পুত্রই হবেন, তা হলে তিনি নিজেকে সিরাজ শাহের পুত্র বলে পরিচয় দেবেন কেন? কেন দিয়েছেন, তা বলা মুশকিল, তবে ইনি যে সিরাজ শাহের শিষ্য এবং পালিত পুত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, এবং দুদ্দু শাহ নিজের মুখে বলা কাহিনী শুনেই তাঁর জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

॥ ৭ ॥

॥ 'বাউল ধ্বংস ফতওয়া' ও 'সত্যার্থ প্রকাশ' ॥

লালনের ইন্তিকালের বহু পরে লালন সম্প্রদায় তথা বাউল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রংপুর জিলার অন্তর্গত সৈয়দপুরের মওলানা রিয়াজ উদ্দীনের নেতৃত্বে 'বাউল ধ্বংস ফতওয়া' জারী করা হয়। এই ফতওয়া পুস্তিকায় মুসলিম সম্প্রদায়-ভুক্ত তথাকথিত বাউল ফকীরদের নানা জুগুপ্সিত আচার-আচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হয় ও তদনুসারে তাঁদেরকে ইসলাম ধর্মচ্যুত (কাফের) বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।[৭০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ফতওয়ায় সুস্পষ্টভাবে লালন শাহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও আনীত হয় এবং সেই অভিযোগের দলীল হিসেবে আর্যাবর্তের (ভারত রাষ্ট্রের) বিখ্যাত আর্য—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর বিখ্যাত 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'বাম মার্গী' 'বীজ মার্গী', 'চুনি মার্গী', 'আপাপন্থী', 'অঘোরী', ইত্যাদি লোকায়ত সাধক সম্প্রদায়ের নানা অনাচারের দৃষ্টান্ত পেশ করে বাঙলার বাউলদেরকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে, স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের কুত্রাপি লালন ফকীর বা বাঙলার তথাকথিত বাউল সম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকায় ফতওয়াকারের উক্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে বাঙলাদেশের লালন সম্প্রদায় তো দূরের কথা, বাউল সম্প্রদায়ের কোন শাখারই বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য সাধারণ অর্থে 'বাউলকে (বাতুল?) উদাসীন, অশাস্ত্রীয় ও ব্রাত্যশ্রেণীভুক্ত করা হলেও এঁরা প্রকৃতপক্ষে অনাচারী উদাসীন মাত্র নন, এঁরা কোন না কোন ধর্মপথের অনুসারী। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। হালে এরা নানা শ্রেণীভুক্ত— যাঁদের মধ্যে নিষ্ঠাবান মুসলমান যেমন আছেন, তেমনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, বৈষ্ণব মতের সাধকও আছেন। এতদ্ব্যতীত অনাচারী নাড়ার ফকীর বা কদাচারী বাউল ফকীরও কিছু কিছু আছে। সাধারণ্যে তারা 'নাড়ার ফকির', 'বে-শরা ফকির' নামে পরিচিত। বাউল ধ্বংস ফতওয়ায় সেই অনাচারী ফকীরদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, ফতওয়া রচনার বহু আগেই লালনের ইন্তিকাল হয়েছিল, এমন কি লালন-শিষ্য দুদ্দু-গানজুও জীবিত ছিলেন না।

॥ ৮ ॥

॥ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে ॥

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাউল সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের সুধীমহলে সাধারণভাবে একটি বিরূপ মনোভাব বহুদিন ধরে চলে আসছে। যার মূলে অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" আছে বলে অনেকে মনে করেন। দত্ত মহাশয় তাঁর গ্রন্থের বিবরণ কিভাবে এবং কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, জানা নেই, তবে মনে হয়, পূর্ব-উল্লিখিত "বাউল ধ্বংস ফতোওয়া" কার-মওলানা রিয়াজউদ্দিন সাহেবের মত তিনিও কিছু

কিছু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এখানে কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে অক্ষয় দত্তের ভ্রান্তিমূলক ধারণা সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিবৃতি উল্লেখ করা যাচ্ছে। ঘটনাটি বিবৃত করেছেন প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে। যথা, "মেলা ভাঙ্গার পর আমি কি কারণে কলিকাতা যাইতেছি, কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ীতে উঠিয়া দেখি—গাড়ীর কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া সশিষ্য রবিঠাকুর। উভয়ে উভয়কে এরূপ আচম্বিতে দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত। তিনি বলিলেন, "আপনি কোথা হইতে?" আমি বলিলাম, "আপনি কোথা হইতে?" তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার জমিদারি হইতে। আমি বলিলাম, আমি আমার জমিদারি হইতে।

তিনি। জমিদারিটি আবার কি?

আমি। ঘোষপাড়ার কর্তা ভজাদের মেলার অধ্যক্ষগিরি।

তিনি। কর্তাভজাদের মেলা। শুনিয়াছি উহা বড় জঘন্য ব্যাপার।

আমি। অক্ষয়কুমার দত্তের উপাসক সম্প্রদায় পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু তিনদিন মেলার অধ্যক্ষগিরি করিলাম, কই জ-ঘ-ন্য, তিন অক্ষরের একটিও দেখিলাম না। ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার দত্ত হিন্দু ধর্মের প্রতি মিশনারির অধিক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। আমিও যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়া ছিলাম, তাহা পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করিলাম। এই বর্ণনায় তাঁহারও যেন চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"আমার একটি প্রার্থনা। আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, যদি তাহা এতটুকু ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'সাধনা'র জন্য লিখিয়া দেন, তবে আমার মত অনেকেরই একটা বিষম ভ্রম ঘুচিবে।"[২১] উল্লেখ্য যে, এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে লালনেব যোগাযোগ ছিল বা তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হ'য়েছে।[২২]

॥ ৯ ॥

॥ সমকালীন সুফী সমাজে লালনের প্রভাব ॥

কালের দিক দিয়ে লালন ছিলেন উনিশ শতকের যুগ-প্রবর্তক মনীষী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক (১৭৭২-১৮৯০ খ্রীঃ)। উল্লেখ্য যে, এঁরা উভয়েই একই বৎসরে মাত্র ৫।৬ মাসের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামমোহন ছিলেন লালনের অগ্রজ। সমকালীন বাঙলাদেশে ও বাঙালী সমাজে যে নবযুগের সূচনা ঘটে, তার অগ্রপথিক, তূর্যবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন রাজা রামমোহন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি 'ভারত-পথিক'। অর্থাৎ শুধু বাংলাদেশের বা বাঙালী সমাজের নয়—তিনি ছিলেন সমগ্র

ভারতবর্ষেরই যুগ-প্রবর্তক মনীষী। বর্তমান ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতারও যুগনায়ক তিনিই। বলতে কি, রামমোহনই সনাতন আচার-সর্বস্ব বহু-দেববাদী পৌত্তলিক ভারতবর্ষকে একেশ্বরবাদী মানবধর্মের বাঁধনে বাঁধতে সচেষ্ট হন। এই নব ধর্মমত প্রচারের নিমিত্ত তিনি আরবী ও ফারসী ভাষাতে "তুহ্‌ফাত-উল-মুয়াহ্‌দীন" বা একেশ্বর-বিশ্বাসীদের প্রতি উপহার নামে যে যুগান্তকারী পুস্তিকাখানি রচনাও প্রকাশিত করেন (১৮০৩) তদ্দ্বারা তাঁর মনোবিকাশের ধারা সম্পর্কে সুন্দর পরিচয় লাভ করা যায়।[২৩] কিন্তু কৌতূহলের বিষয় 'তুহ্‌ফাত' গ্রন্থে প্রচারিত ভাবধারার সঙ্গে লালনশাহী সুফী চিন্তাধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, রামমোহনের গ্রন্থখানির পাশে লালন-গীতি ও লালনের জীবন-দর্শনের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ রেখে বিচার করলে একজন সাধারণ পাঠকও আশ্চর্য হয়ে ভাববেন, দুই বিপরীত ধর্মানুসারী এবং আপাতবিরোধী যুগপথিকের চিন্তাধারার কি আশ্চর্য সাদৃশ্য, কি গভীর মিল। বলা বাহুল্য, রামমোহনের 'তুহফাত' গ্রন্থের বিষয়বস্তু নয় শুধু, তার চিন্তাধারা, এমন কি বর্ণনা-ভঙ্গীরও আশ্চর্য সাযুজ্য রয়েছে লালনের চিন্তাধারার সঙ্গে। মাঝে মাঝে তার বর্ণনা এত কাছাকাছি যে, একটিকে অপরটির তরজমা বা অনুবাদ বলেও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অবশ্য রামমোহন পাশ্চাত্যশিক্ষা-সভ্যতার অনুরাগী হ'লেও প্রাচ্য সুফী-সাহিত্যের, বিশেষ করে হাফিজ সাদীর কাব্য-কাননেরও একজন উন্মত্ত মধুপ ছিলেন। হাফিজ ও সাদী রুমী প্রভৃতি সুফী সাধকের রচনা লালনের অতি প্রিয় ছিল। এই দিক দিয়ে লালন শাহীর সঙ্গীত ও লালন-দর্শনের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার ঐক্য থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই 'তুহ্‌ফাত-উল মুয়াহ্‌দীন' গ্রন্থের সঙ্গে লালন গীতির সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, উভয়ের রচনা পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে এরূপ গভীর প্রতীতি জন্মে যে খুব সম্ভব উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘটেছিল। এই যোগাযোগ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ঘটা সম্ভব ছিল না, কেননা, তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতেই কিছু ছিল না, তবে সঙ্গীতের প্রচার ছিল। তাই তথাকথিত লোক-গীতির মারফত এই যোগাযোগ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। অবশ্য পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁর গীত-সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, অনেকে তাঁর সক্ষম অনুকারীও ছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র কবিগুরু ও বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ গীতিকাব্যধারার আদি প্রবর্তক বিহারীলাল চক্রবর্তী। উনিশ শতকের বাউল-গীতির অন্যতম প্রধান প্রচারক ও সাধক কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (কুমারখালি, কুষ্টিয়া), সাহিত্য সাধক মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। ঐতিহাসিক গবেষক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুসাহিত্যিক রায় জলধর সেন, এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই অসাধারণ মরমী কবি-সাধকের বাণী-সমুদ্রে অবগাহন ক'রে ধন্য হয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে বাঙ্গলা দেশের সুধীসমাজ লাভ করেছিল বিহারীলালের "বাউল-

বিংশতি", "সারদামঙ্গল" "সাধের আসন" ইত্যাদি কাব্য, ও কবিগুরুর "বাউল" (১৯০৫), "আত্মশক্তি", "Religion of Man" (1931), "মানুষের ধর্ম (১৯৩৩) ইত্যাদি সাহিত্য ফসল ও ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনমূলক গ্রন্থরাজি। শুধু তাই নয়, কথিত আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের (জন্ম ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬) সঙ্গীত-আসরে লালন শাহী সঙ্গীতেরও বিশেষ কদর ছিল। এমনকি, নিছক মানবতাবাদী (Humanist) দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকেও লালন-গীতির আসরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত হিসেবেও দেখা গিয়েছে। শুধু কি তাই? রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম-সমাজেও যে লালন-গীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এরূপ একটি কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। রামমোহনের 'ব্রাহ্ম-সঙ্গীত' (১৮৩৩) গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীতটি হ'ল নিম্নরূপ :

কে ভুলালো হায়
কল্পনারে সত্য কহি জানো একি দায়।
আপনি গড়হ যাকে
যে তোমার বশে তাকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনও ভূষণ দেও, কখনো আহার
ক্ষণেকে স্থাপহ ক্ষণেকে করহ সংহার
প্রভু বলি মানো যারে
সম্মুখে নাচাও তারে
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছো কোথায়?

তুং—প্রতিমা গড়ায় ভাস্করে
ম'লে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
আবার গুরু বলে তারে
এমন পাগল কে দেখেছে?
মাটির পুতুল গড়ে নাচায়
একবার মারে একবার বাঁচায়
সাঁই যেন স্বয়ং হতে চায়
লালন কয় তার সকল মিছে।

রামমোহনের তুহ্‌ফাত-এর একটি বাণী নিম্নরূপ—"একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূল সূত্র। জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা।"[২৪]

—তুং লালনের—

"ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
যবন কি কাফের তার
জাতের বিচার নাই।"

আরও একটি প্রশ্ন—"এখন প্রশ্ন এই যে, যিনি স্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ, দয়ালু বদান্য এবং অনাসক্ত সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধমতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব? অথবা এই সবই কি ধর্ম্মানুবর্তীদের মন-গড়া জিনিস? আমার তো মনে হয় যে, যে কোন সুস্থ মনের লোক কেউই শেষেরটি মানতে ইতস্ততঃ করবে না।"

বলা বাহুল্য, লালনের মনেও ছিল ওই একই প্রশ্ন:

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়।
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন খোদায় পাঠায়॥
এক যুগে যা পাঠায় কালাম।
আর যুগে তা হয় কেন হারাম-
দেশে দেশে এমনি তামান
ভিন্ন দেখা যায়।
যদি একই খোদার হয় বর্ণনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না
মানুষেরই সব রচনা
তাইতে ভিন্ন হয়।
এক এক দেশে এক এক বাণী
পাঠান কি সাঁই গুণমণি
মানুষের রচনা জানি
লালন ফকির কয়॥[২৫]

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এটিও রামমোহনের মত লালনের প্রশ্ন বটে, তবে জবাব রামমোহনের মত নয়। সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে লালন-গীতিতে (যা 'ভাব সংগীত' বা 'ভাব গান' নামে পরিচিত) একটি গানে ভক্ত-মনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অন্যটিতে দেওয়া হয় তার জবাব। একে বলা হয়—'দৈন্য' ও 'প্রবত্ত'। দৈন্যে শিষ্য বা 'বালকা' রূপে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এবং প্রবত্তে গুরুরূপে (পীর বা মুরশিদ) তার জবাব দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে রামমোহনের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, মুসলমান সমাজের কাছে—আসলে এ কোন নতুন প্রশ্ন নয়—ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে একদল যুক্তিবাদী দার্শনিক (মুতাজিলা) কুরআন শরীফ ঐশী বাণী নয়—হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর রচনা, এই মর্মে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। এ নিয়ে বহু বাক-বিতণ্ডাও

অনুষ্ঠিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত এ সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে কুরআনকে অপরিবর্তনীয় ঐশী বাণীরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হ'য়েছিল। উনিশ শতকের বাঙলাদেশে প্রশ্নটি নতুন করে উঠলেও তাতে মুসলমান সমাজের মাথা-ব্যাথার কোন কারণ ছিল না, কেননা এ প্রশ্ন ছিল সমকালীন হিন্দু-সমাজে সংস্কারের ব্যাপারে রামমোহন ও তাঁর অনুসারীদের। কুরআন শরীফ ঐশী বাণী হোক বা না হোক, তাতে হিন্দু-সমাজের মাথা-ব্যথা ছিল না, কিন্তু কুরআনের বাণীর অনুসরণে হিন্দু-সমাজের সংস্কার করতে গেলে তার একটি যুক্তিসংগত এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বৈ কি ? রামমোহন সেই ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'তুহফাত' পুস্তিকায়। সুধী-সমাজের অবগতির জন্য এ-সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীর প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রকাশিত "রামমোহন ও তৎকালীন সাহিত্য ও সমাজ" গ্রন্থ থেকে প্রাসংগিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। যথা,—"তুহফাত-উল-মুয়াহহিদীন ঐসলামিক বিশ্বধর্মের আদর্শে রচিত, অথচ "গোঁড়া মুসলমানী মতের প্রতিরোধক। আসলে ইসলামের মধ্যে যে উদারপন্থী সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল তাঁদের আদর্শে (মুতজল) এটি রচিত।" ইত্যাদি[২৬] প্রভাতবাবু মুতাজিলা দর্শনের বরাত দিতে গিয়ে এখানে একটু ভ্রান্তিতে পতিত হ'য়েছেন, কেননা, তিনি বলতে চেয়েছেন, মুতাজিলাবাদীদের মত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামী একেশ্বরবাদী চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করে তিনি তাঁর নবীন ধর্মমত (ব্রাহ্ম ধর্ম) প্রচার করেছিলেন, যাতে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামীর স্থান ছিল না। কিন্তু কথাটি যে ঠিক নয়, তার কারণ, তিনি তাঁর ধর্মমতে কোন অহিন্দুকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। এমন কি তাঁর ব্রাহ্মধর্ম শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মেই রূপান্তরিত হ'য়েছে। এবং হিন্দু ধর্ম হওয়ায়, রামমোহনের বিশ্বজনীন ধর্ম মতও খণ্ডিত হ'য়েছে। ফলে ব্রাহ্মধর্ম হ'য়েছে অব্রাহ্ম বা অহিন্দু-সমাজের প্রতিবাদী ও একেশ্বরবাদী এক বিশেষ ধর্ম। লালন তাঁর গানে স্পষ্টই বলেছেন, শুধুমাত্র একেশ্বরবাদী (মোজাহেদ) হ'লেই হবে না, তাতে কোন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বা পয়গম্বরের অনুসারী হ'তে হবে, কেননা ধর্মমত সাধারণ মানববুদ্ধির অতীত, এবং ধর্মমতের প্রবর্তক স্বয়ং খুদাতায়ালা ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন না। তাই কি পরবর্তী ব্রাহ্মগণ নিজেদেরকে সনাতন হিন্দু ধর্মেরই অনুসারী বলে পরিচয় দিচ্ছেন ? রামমোহনের মত লালনও যুক্তিবাদী ছিলেন বটে, তবে ছিলেন আসলে ইসলামী ভক্তিবাদে দীক্ষিত (সুফী), তাই রামমোহনের আল্লাহ প্রেরিত রসুল ও তাঁর বাণীর প্রতি অবিশ্বাসকে প্রকাশ্যেই আক্রমণ করে বলেছেন—

"নবীনা মানে যারা
মোয়াহেদ কাফের, তারা
সেই কাফের দায়মাল হবে
বে-হিসাব দোজখে যাবে
আবার তারে খালাস দিবে
লালন-কয় মোর কি হয় জানি ॥[২৭]

এখানে 'মোয়াহেদ' শব্দটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু এখানেই নয়, লালনের একাধিক গানে 'মোয়াহেদ'দের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। লালন স্পষ্টই বলেছেন, ইহ ও পরকালের মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য পীর-মুরশিদ বা আধ্যাত্মিক গুরুর চরণ-শরণের প্রয়োজন। আল্লাহ প্রেরিত নবী বা অবতারগণ সেই গুরু, তাঁরা কোন বিশেষ ব্যক্তি নন—আল্লাহের বিশেষ দূত ও বাণী বাহক। তাই মোয়াহেদ-গণ লালনের মতে ভ্রান্তি। তবে কি লালন রামমোহনের 'তুহফাত' গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। মনে হয়, পড়েছিলেন, তা না হ'লে লালনের গানে 'মোয়াহেদ'-প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই উত্থাপিত হ'ত না। কেন না, যে সমস্যা সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই মুসলিম দার্শনিকদের মনে আলোড়ন জাগিয়েছিল, এবং বহু বাক্-বিতণ্ডার পরে তার একটা মীমাংসাও হয়ে গিয়েছিল, উনিশ শতকের মুসলিম-সমাজে সে প্রশ্ন নতুন ক'রে উত্থাপিত হওয়ার কোন কারণও দেখা দিয়েছিল না। আরও একটি কথা। প্রভাতবাবু মনে করেন, রামমোহনের সাংগীতিক প্রেরণা উত্তর ভারতের কবীর দাদূ-নানকপন্থীদের কাছ থেকেই এসেছিল। ঘটনাটি অস্বাভাবিক একটা কিছু এমনও নয়—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি সমকালীন বাঙলা দেশের মরমী গীতিধারার কথা একবার উল্লেখ করতেও ভুলে গেছেন। মনে হয়, এই সব সাধারণ মানুষের জীবনেও যে কোন অসাধারণ চিন্তার বিকাশ ঘটতে পারে মুখোপাধ্যায় মশায় তা কল্পনাও করতে পারেন নি, তাই রামমোহনের ধর্ম-সাধনার সঙ্গে এ-দেশের পানি-মাটির কোন সংযোগ ঘটতে পারে এরূপ কথা ভাবতেও ভুলে গেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের ভুল অহরহ ঘটে চলেছে। অবশ্য রামমোহনের ব্রাহ্ম-সংগীত রচনার মৌল প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক না কেন, সুফী-সংগীত সাধনার ধারার সঙ্গে তার যে বিশেষ যোগ ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য। নানক-কবীর-দাদূর সংগীত সাধনাও সুফী সংগীতেরই ('সামা') রকমফের এ-কথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। লালন দুদ্দু-পান্‌জু সম্প্রদায়ের সংগীত-সাধনাও তারই অনির্বাণ ধারার প্রবাহ মাত্র। সমকালীন ফরায়েযী-ওয়াহাবী সমাজ-সংস্কারকগণ সংগীতের প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিলেন বটে, তবে বিশ্বসংগীত আসরে মুসলমানরাই যে এককালে একচ্ছত্র ছিল এবং এখনও সুফী-সংগীত বিভিন্ন দেশে সংগীত-সাধনার ধারাকে বিশেষ ভাবে সজীব রেখেছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। পাক-ভারত-বাঙলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাই দেখতে পাই রামমোহনের উত্তরাধিকারী বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথেও লালনশাহী মরমী-গীতির প্রভাব অপরিসীম। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ লালন শাহের কতটা সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তা নিয়ে আমাদের সুধী-মহলে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকলেও তাঁর শিলাইদহে (কুষ্টিয়া) প্রবাসকালে তার মনোরম গ্রাম পরিবেশে লালন শাহী ফকীর-সমাজের একতারা তাঁকে কিভাবে পাগল করে তুলেছিল এবং তিনি একের পর এক করে অপূর্ব কাব্যফসলে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ সমৃদ্ধ করে

তুলেছিলেন, এবং কি ভাবে তাঁর মানস-লোকে পলি জমে ধীরে ধীরে জীবন-দেবতার চর জেগে উঠছিল, রবীন্দ্র কাব্য-সমালোচকদের কাছে তা বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় বলে বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে। কবিগুরুর সাহিত্য-জীবনে এ কালের অভিজ্ঞতা, বিশেষ ক'রে লালন শাহী সংগীতের প্রভাব পরবর্তীকালে কিভাবে জীবন দেবতাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়ে ছিল, তাঁর লণ্ডনে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালা (Religion of Man. 1930) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালায় (মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩) তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। তাই আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে লালন শাহ ও তাঁর অনুসারী ধর্ম ও সংগীত সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে—সত্যের অনুরোধে এ-কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। তবে গভীর পরিতাপের বিষয়, অদ্যাবধি এ-দিকে আমাদের সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ববিদদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। বারান্তরে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাতের আশা রইল।

পাদটীকা

১। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ বিরচিত ও লালন কথিত আত্ম জীবন চরিতের কলমী পুঁথি। যশোর জিলার হাট জগদল নিবাসী আবদুল লতীফ আফি আনহু (বর্তমানে মরহুম) সংগৃহীত (১৯৬০)। নবদ্বীপের নিকটবর্তী চরব্রহ্ম নিবাসী জনৈক রামবাবুর নিকট থেকে এটি সংগৃহীত হয়। রচনা কাল ১৩০৩ সাল, ১৮৯৬ খ্রীঃ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা, ১৩৭৪, ১৯৬৭) প্রকাশিত। বিস্তারিত বিবরণী বর্তমান নিবন্ধকারের "লালন শাহ ও লালন গীতিকা" ১ম ও ২য় খণ্ড (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮) দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য যে গ্রন্থখানি ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে সমাপ্তি হয় ও বাঙলা একাডেমীতে প্রকাশের জন্য দাখিল করা হয়।

২। পূর্বোক্ত (সাহিত্য পত্রিকা)। পৃঃ ৭৭।

৩। শ্রীবসন্তকুমার পাল। মহাত্মা লালন ফকির (শান্তিপুর, নদীয়া, ১৯৫৪) পৃঃ ১। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাংলার বাউল ও বাউল গান (কলিকাতা, ১৩৭৮ সাল, ২য় সং) পৃঃ ৫৩৯।

৪। মুহম্মদ আবু তালিব। লালন পরিচিতি (ঢাকা, ১৯৬৮) পৃঃ ৪।

৫। Abdul Wali. On some curious Tenents and Practices of certain class of Faqirs in Bengal. Journal of the Anthropological Society of Bombay, 1900, Vol. No. 4, p. 217.

লেখক খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার বাসিন্দা ও লালনের জন্মস্থানের নিকটবর্তী শৈলকুপা (যশোর) সাব-রেজিষ্টারী অফিসের সাব-রেজিষ্টার ছিলেন (১৮৫৬-১৯২৬)। সমকালীন বাঙলার প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ইনি একজন বিখ্যাত গবেষক ও লেখক ছিলেন। যশোর জিলার খড়কী গ্রাম নিবাসী আমার স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শরীফ হোসেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন তাঁর 'হারামণি' ৭ম খণ্ডের ভূমিকায় (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৩) ভুলক্রমে এই রচনাটি Natural Society of Bombay থেকে প্রকাশিত বলে উল্লেখ করেছেন। রচনাটির তিনি শুধু নাম শুনেছেন, দেখেন নি, ফলে এই ভ্রান্তি।

৬। এক নম্বর টীকায় উল্লিখিত দুদ্দু শাহের লালনের আত্মচরিত সংক্রান্ত বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

৭। ১ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। তালিব। পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৮-৩২।

৯। অধম কাঙ্গাল। ছহী আক্কেলনামা, কলমী পুথি। নিবন্ধকার সংগৃহীত।

১০। রাজশাহী জিলার গডের হাট পরগণার বিখ্যাত প্রেমতলী-খেতুরী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মস্থান। খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের বিখ্যাত পদকর্তা নরোত্তম দাস এখানে যে মহোৎসব করেন, বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনেরই ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১১। পাল। ৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১।

১২। ভট্টাচার্য (৩ নম্বর টীকা)। পৃঃ ৫৪১।

১৩। The Bangladesh Observer (July, 2, 1973) p. 2.
নিজস্ব সংবাদ দাতার নিবন্ধ।

১৪। তালিব। ৮ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। সত্যার্থ প্রকাশ ; হিন্দী গ্রন্থের বাংলা তরজমা।

১৬। পাল। পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৬-৩১।

১৭। ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৪৫।

১৮। জসীম উদ্দীন। লালন শাহ ফকির প্রবন্ধ। বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল, ১৯২৫।

১৯। খুব সম্ভব বিশোকা লালনের প্রথম স্ত্রীর নাম। নিবন্ধকার সংগৃহীত ১২৮৭ ও ১২৮৮ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত লালনের পরমানন্দপুর আস্তানার জমীক্রয় সংক্রান্ত দুটি কবুলিয়ত ও দুটি পাট্টা দলীল। পাট্টা দুটি শুকুর সাহেবের উত্তরাধিকারী জনাব আমীর হোসেন শাহ ও আমজাদ হোসেন শাহ সাহেবদ্বয়ের সৌজন্যে ও কবুলিয়ত দুটি যশোর জিলা রেজিষ্টারী অফিস থেকে গত ১০ই মে, ১৯৭৩

তারিখে রেজিষ্টার জনাব তোজাম্মেল হক সাহেব ও তাঁর সহকর্মীদের আনুকূল্যে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, রেজিষ্ট্রার সাহেব লালনের ছেঁউড়ে আস্তানার নিকটবর্তী অধুনা লুপ্ত 'ভালুকা' থানার বাসিন্দা। দুদ্দ শাহেব পূর্বোক্ত বিবৃতি এবং দলীলে ভালুকা থানার নাম আছে। অধম কাঙ্গালও ছেউড়ে গ্রামকে ভালুকা থানার অন্তর্গত বলেছেন।

২০। মাওলানা রিয়াজ-উদ্দীন আহম্মদ। বাউল ধ্বংস ফতওয়া, ১ম ও ২য় খণ্ড (সৈয়দপুর, রংপুর, ১৩৩৩ সাল=১৯২৬)। দ্রষ্টব্য তালিব। লালন শাহ ও লালন-গীতিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫-১২৮।

২১। নবীনচন্দ্র সেন। আমার জীবন।

২২। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (পশ্চিম বঙ্গ) ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ঘোষপাড়ায় এ-বিষয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধানে গিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের গুরুমার বন্দনামূলক লালনের নিম্নলিখিত গানটি উদ্ধার করেছেন।

কি আনন্দ ঘোষ পাড়াতে
পাপী তাপী উদ্ধারিতে
দুলাল চাঁদকে লয়ে সাথে
রয়েছেন মা ডালিমতলাতে ॥
কে বোঝে মা তোমার মেলা (খেলা ?)
এখানে এই দোলের মেলা
অন্ধ আতুর বোবা কালা
মুক্তি হয় মা তোর কৃপাতে ॥
কেন গো সতী-স্বরূপিণী
সামনে আছে সুরধুনী
অনেক দূরে ছিল শুনি
এগিয়ে এল তোর কাছেতে ॥
লালন কয় তোর মনকে খাঁটি
ডালিমতলার নিয়ে মাটি
হারাস যদি হাতের লাঠি
পড়বি খানা আর ডোবাতে ॥

গানটি রুক্মিনী বালা দাসীর আখড়া থেকে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা) ছাত্র শ্রীকিরণ বিশ্বাস সংগ্রহ করেন (১৯।৩।৭৩ তাং রাত্রি ১টা)। এ-থেকে বোঝা যায়, ঘোষ পাড়ার সঙ্গে লালনের যোগাযোগ ছিল।

২৩। রামমোহন গ্রন্থাবলী (কলিকাতা, ১৯৭৩)।

২৪। পূর্বোক্ত। তুহফাত-উল-মুয়াহ্‌দীন। পৃঃ ৭১৪-৭২৯।

২৫। তালিব। লালন শাহ ও লালন গীতিকা,
গান নম্বর ২০৪ (২য় খণ্ড)।

২৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রামমোহন ও তৎকালীন সাহিত্য ও সমাজ (কলিকাতা, ১৯৭২) পৃঃ ৯১।

২৭। তালিব। পূর্বোক্ত ১ম খণ্ড। গান নং ১।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীহারাধন দত্ত

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বর্তমান যুগে প্রায় বিস্মৃত নাম। অথচ বিগত যুগে সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও সাহিত্যসেবীরূপে বঙ্গসাহিত্য-সংসারে তিনি শ্রদ্ধাব আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হরিমোহন গল্প-উপন্যাস-কাব্য-নাটক-রসরচনা-সঙ্গীত-নিবন্ধাদি বচনা করিয়া সেকালের সাহিত্যরসিক সমাজে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার এই সমস্ত রচনা টিকে নাই। পুরাতনের প্রতি ছিল তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। ইংরাজ আধিপত্য যুগে স্বদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রায় সব কিছুই অপাঙক্তেয় ও পরিত্যাজ্য হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্য সংস্কৃতির এই যুগ-সংকটে হরিমোহন প্রায়-বিলীয়মান প্রাচীন কবিতা সঙ্গীত পাঁচালী যাত্রাপালা প্রভৃতি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়া দেশীয় সাহিত্যকে অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অধিকন্তু প্রাচীনকাল হইতে তাঁহার সমকালীন যুগ পর্যন্ত বঙ্গভাষার লেখক-সম্প্রদায়ের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি ও সুগভীর সাহিত্যপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' খ্যাত হরিমোহন একালের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষকগণের কাছে প্রয়োজন বোধে কখন কখন অপরিহার্য বিবেচিত হন। দুঃখের বিষয় হরিমোহনের জীবন ও সাহিত্য সাধনার পরিচয় জ্ঞাপক কোন নিবন্ধ বা আলোচনা এতাবৎ কেহ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তিনি অতিশয় অনাদৃত অবস্থায় হুগলী জেলার বিজন জন্মপল্লীতে লোকান্তরিত হন। কোন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদটুকুও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের অলক্ষ্যে ও অগোচরে তাঁহাব জন্মশতবার্ষিকীর তিথিও অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছি। তথাপি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার জীবন ও কীর্তির যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি বর্তমান নিবন্ধে তাহাই উপস্থিত করিতেছি।

জন্ম ঃ বংশ পরিচয়

হুগলী জেলার দাদপুর থানা (পূর্বে পোলবা) অন্তর্গত সানিহাট (সিনেট) গ্রামে হরিমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ ১৫ই আষাঢ়, বুধবার ১২৭২ বঙ্গাব্দ (ইং১৯ জুন ১৮৬৫ খ্রীঃ)। হরিমোহনের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে ভিন্ন একটি মতেরও সন্ধান পাইয়াছি। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী বিষয়ক উপকরণ ও তথ্যাদি অনুসন্ধান কালে তাঁহার বাসভবন হইতে 'বঙ্গীয় জ্যোতির্বিদ্যালয় ও কার্য্যালয়ের' (১১, ইডেন হসপিটাল রোড)

একখানি পত্র হস্তগত হয়। পত্রখানির তারিখ, ২ মাঘ, ১৩৩১ (১৪ জানুয়ারী ১৯২৫)। ঐ পত্রে হরিমোহনের জন্মতারিখ, ১৬ই আষাঢ়, ১২৭৭ (২৯ জুন্ ১৮৭০ খ্রীঃ), বুধবার শুক্লা প্রতিপদ, আর্দ্রানক্ষত্র, লিখিত আছে। হরিমোহনের কোন জন্মকোষ্ঠি খুঁজিয়া পাই নাই। হরিমোহন নিজ প্রয়োজনে এই জ্যোতির্বিদ্যালয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন অনুমিত হয়। বোধহয় পরিণত বয়সে চাকুরীর প্রয়োজনে বয়স কমাইবার জন্য তিনি জ্যোতির্বিদ্যালয়ের একখানি বয়স নির্দ্ধারণ পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হরিমোহনের এই পরবর্তী জন্মতারিখ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁহার জীবনী বিষয়ক অন্যান্য যেসব উপাদান পাইয়াছি তাহাও হরিমোহনের জন্মতারিখ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ সমর্থন করে না। বঙ্গবাসী কার্যালয়ে, হরিমোহনের সহকর্মী ও বঙ্গবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৩১২ বঙ্গাব্দে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি জন্ম সাল উল্লেখ করেন নাই। তথাপি হরিমোহনের বয়স সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন—"ইঁহার বয়স এক্ষনে অনুমান চল্লিশ বৎসর।"[১] অনুমান করা যাইতে পারে দুর্গাদাস হরিমোহনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে হরিমোহনের বয়স চল্লিশ হইলে জন্মসাল ১২৭২ ধরিতে হয়। হরিমোহনের বয়স সম্বন্ধে দুর্গাদাসের এবংবিধ অনুমান নেহাৎ অনুমান মাত্র নহে। হুগলী জেলায় তাঁহার সানিহাটি বাসভবনে, 'শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা' নামক ৬০ পৃষ্ঠার একখানি সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাইয়াছিলাম। ১৩২২ বঙ্গাব্দে হরিমোহন স্কন্দপুরাণের রেবা খণ্ড অবলম্বনে সত্যনারায়ণ ব্রতকথা অনুবাদ করেন। পরে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ২৫ চৈত্র বৃহস্পতিবার, তারিখে রচিত 'আত্মনিবেদন' অংশ ইহার সহিত যুক্ত করেন। এই 'আত্মনিবেদনে' তিনি লিখিয়াছেন

সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' পত্রের সেবায়,
থাকিয়া আসিনু আমি ঘাটের কোটায়।
কর্ম্মত্যাগ পরে আজ এগার বৎসর,
বদ্ধ হয়ে আছি ঘোর সংসার ভিতর।

এই পদ্যাংশ হইতেও হরিমোহনের জন্মসালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বঙ্গবাসীর কর্ম্মত্যাগের বয়স কমপক্ষে ষাট বৎসর এবং অবসর জীবন ১১ বৎসর ধরিলে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁহার জন্মসাল ১২৭২ হয়। সুতরাং ১২৭২ বঙ্গাব্দকে তাঁহার জন্মসাল হিসাবে গ্রহণ করিব।

হরিমোহন সানিহাটের প্রসিদ্ধ মুখোটী বংশের সন্তান। বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পরিবারে মুখোটী বংশের কোন কন্যার বিবাহ হওয়ায় ইঁহাদের কৌলিন্য লুপ্ত হয়। হরিমোহনের পিতার নাম যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। মাতা ভুবনমোহিনী। ছয়মাস বয়সে হরিমোহন পিতৃমাতৃহীন হন। জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পল্লীর ভট্টাচার্য্যায় বংশীয়া জননীকল্পা ব্রজমোহিনী তাঁহার ভরণ পোষণ শিক্ষা-দীক্ষার যাবতীয়

দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অপ্রকাশিত আত্মনিবেদনে হরিমোহনের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।[১] সানিহাটের এই মুখোপাধ্যায় পরিবারে নিত্য শালগ্রামশিলা পূজিত হইত। এই শালগ্রামশিলার নিত্যপূজা ও ভোগের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতাপচাঁদ মহতাব ১২৩৪ বঙ্গাব্দে বাস্তুভিটাসহ ২৫ বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর ভূমিদান করেন (তায়দাদ নং ৩৪৮৫৪)। মুখোপাধ্যায় পরিবারের বংশধরেরা আজিও তাহা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

হরিমোহনের জন্মপল্লী সানিহাট একটি গণ্ডগ্রাম। এখানকার বিশালাক্ষী দেবী জোড়বাংলা মন্দির বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। সানিহাটের জোড় বাংলা মন্দিরের গায়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১২২৯ সাল উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা ইহার বহুপূর্বে। মন্দিরটি ইংরাজ যুগে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির কোন প্রভাব ইহার গঠনে কোথাও অনুপ্রবেশ করে নাই। বাঙ্গলার নিজস্ব মন্দির নির্মাণশৈলী বিশালাক্ষী মন্দিরে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। স্থানীয় প্রাচীন হালদারবংশীয়গণ কর্তৃক এই দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে বর্দ্ধমানের মহারাজা মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দেন। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় জমিদারগণ দেবীর সেবার ব্যবস্থা করেন। বিশালাক্ষী জাগ্রতা দেবী বলিয়া এই অঞ্চল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই দেবীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ক নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী এখানকার জনসমাজে প্রচলিত আছে।[৩] সানিহাট প্রাচীনকাল হইতে পিতল কাঁসার শিল্পকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ।[৪] হরিমোহন একটি প্রশস্তি কবিতায় জাগ্রতা বিশালাক্ষী দেবীর স্তব করিয়াছেন।[৫] প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবসে মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার নবমীতে এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দীর প্রাঙ্গনে মেলা উৎসব পালিত হয়। হরিমোহন তাঁহার জন্মপল্লী সানিহাটকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতেন। জন্মপল্লী সানিহাটের

১। দুর্গাদাস লাহিড়ী। বাঙ্গালীর গান (বঙ্গবাসী, ১৩১২)

২। হুগলী জেলায় গ্রাম সানিহাট নাম।
যথা বিশালাক্ষী মার আছে পুন্যধাম।

৩। শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। হুগলীজেলার দেব-দেউল (১৯৭১)

৪। শ্রীসুধীর কুমার মিত্র। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ২য় খণ্ড, (১৯৬৫, ২য় সংখ্যা, তৃতীয় মুদ্রণ)

৫। ধ্যানকরি বিশালাক্ষী বিশাল যাঁহার অক্ষি,
তপ্ত স্বর্ণ জিনি যাঁর অঙ্গের বরণ।
দুটি ভুজ দেখি যাঁর অম্বিকা প্রচণ্ডা আর
খড়্গ খেটক যিনি করেন ধারণ॥

কল্যাণ-বিধায়ক সর্ববিধ উন্নয়ন কর্ম্মের সঙ্গে তিনি নিজেকে আমৃত্যু যুক্ত রাখিয়াছিলেন। জন্মভূমি সানিহাট সন্নিহিত জনপদ সমূহের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। গোস্বামী মালিপাড়ার মদনমোহন জীউ'র উৎসব উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতায় তাঁহার পল্লী-প্রীতির নিদর্শন বিদ্যমান।[৬]

তথায় মুখোটী বংশে জনম লভিয়া।
জন্মকাল গোয়াইনু মায়ায় মজিয়া॥
পিতা যদুনাথ মাতা ভুবনমোহিনী।
দুঁহুর মহিমা আমি কিছু নাহি জানি॥
শিশুকালে পিতামাতা দোঁহে হারাইয়া।
কোনরূপে বেঁচে আছি অকূলে ভাসিয়া॥
জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দাদা সদা সদাশয়।
ত্রৈলোক্যনাথের কৃপা ভুলিবার নয়॥
তিনি আর ভিক্ষামাতা শ্রীব্রজমোহিনী।
আমারে মানুষ কৈলা দিবস যামিনী॥
এদের বাৎসল্য স্নেহ মনে দৃঢ় গাঁথা।
সদা মনে জাগে মোর ইঁহাদের কথা॥
জীবন কর্ত্তব্য সারি ইঁহারা এখন।
উভয়েই গিয়াছেন স্বরগভবন॥
ইঁহাদের গুণ আমি স্মরিয়া স্মরিয়া।
সংসার সাগর তীরে রয়েছি পড়িয়া॥

অপ্রকাশিত "শ্রীশ্রীসত্যনারায়নের ব্রত কথা" পাণ্ডুলিপি হইতে।

৬। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ভক্তভবনে ভগবান (কবিতা)। মুদ্রণকাল, ২২, ফাল্গুন, ১৩৩৫

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮১ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥

১৩৮১, বৈশাখ—আষাঢ় ॥

সূচীপত্র

Eighty-Second Foundation Day Celebrations of the Bangiya Sahitya Parisad
Governor's Address……Sri Anthony Lancelot Dias ১

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ (অনুবাদ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ৬

সাহিতলাল মজুমদারের একটি অপ্রকাশিত কবিতা ১০

'প্রকৃতিভির্বধ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ'—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ১৪

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত—শ্রীকালীকিঙ্কর দত্ত ১৯

সেপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ—শ্রীমদনমোহন কুমার ৩১

পরিষৎ-সংবাদ ৫২

শুভ সংবাদ ৬৯

ক্রোড়পত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১

বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ১১

রেখাচিত্র : দিমিত্রিঅস্ গালানস্ (১৭৬০-১৮৩৩), বঙ্গদেশ তথা ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

চর্য্যাপদ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ; চণ্ডীদাস-সমস্যা ; বৈষ্ণব পদাবলী ; শাক্ত পদাবলী ; রোম্যান্‌টিসিজম্ ; মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান ; বাঙ্‌লা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ; বাঙ্‌লা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যকৃতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ ॥

ডবল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭২।

মূল্য দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বোর্ড বাঁধাই ॥

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

॥ ৮২তম বর্ষ ॥ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ ॥

পৃষ্ঠপোষক

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল

শ্রীআন্টনি লান্সলট্ ডিয়াস্

বান্ধব

রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

সভাপতি

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীকুমারেশ ঘোষ

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহারাধন দত্ত শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীকমলকুমার ঘটক

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য

১। শ্রীঅধীর দে ২। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীকানাইচন্দ্র পাল ৪। শ্রীকামিনীকুমার রায় ৫। শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৭। শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ৮। শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায় ৯। শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ১০। শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ১১। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩। শ্রীধীরাজ বসু ১৪। শ্রীমনসুর আলি সিদ্দিকী ১৫। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ১৬। শ্রীমনোমোহন ঘোষ ১৭। শ্রীশিবদাস চৌধুরী ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় ১৯। শ্রীসুধাকান্ত দে ২০। শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন (নৈহাটি শাখা) শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপ শাখা

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর শাখা) শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় (কৃষ্ণনগর শাখা

GOVERNOR OF WEST BENGAL

82ND FOUNDATION DAY CELEBRATIONS OF THE BANGIYA SAHITYA PARISAD ON 25TH JULY, 1974.

GOVERNOR'S ADDRESS

National Professor Dr. Sunıti Kumar Chatterji, Dr. Mazumdar, Minister for Education, the Vice-Chancellor, Professor Coomer, distinguished guests and friends,

I am indeed proud to have the distinction of being invited as Chief Guest to the 82nd Foundation Day Celebrations of the Bangiya Sahitya Parisad. The Parisad has been a temple of learnning at which many Bengali scholars, poets, writers and savants have selflessly served in the course of the last eight eventful decades. Most of the eminent persons who were connected with this institution from its very inception are no longer with us, but their hallowed memory is still enshrined in the Bangiya Sahitya Parisad. We are fortunate that we still have amongst us eminent scholars like Dr. Suniti Kumar Chatterjee and Dr. Ramesh Chandra Mazumdar who are, in a sense, contemporaneous with the Parisad and who, in spite of their age, have shown a tremendous energy and still take exemplary interest in the development and welfare of this institution.

While expressing my sincere thanks to Dr. Chatterjee and his colleagues of the Parisad for kindly inviting me to this evening's function I feel somewhat embarrassed in not being able to speak to you in the rich and beautiful language, the cause of which has all along been upheld by this Academy. I crave your indulgence therefore for addressing you in English.

Dr. Mazumder and Dr. Chatterjee who have preceded me this evening have dwelt on various aspects of the Parisad's history and of its unique position in the life and letters of Modern Bengal. The first part of a publication on the history of the Parisad by Professor Madan Mohan Coomer has just been released. I have the opportunity of glancing through it, and with the help of my Secretary am able to get a gist of that very fascinating history of this Academy, and I do hope that it won't be long before the next two volumes of this history are published. I have little to add to the deliberations of this evening and shall therefore confine myself to what I consider to be some of the immediate and important tasks before the Parisad.

The Parisad has always stood as a symbol of self-help and self-reliance among our people in so far as our literary and linguistic heritage is concerned. Great men and women in literary and cultural fields came together in the past to build this temple of learning. Many are the illustrious names which have been closely associated with this Academy—men like Rabindranath Tagore, Binoy Krishna Deb of Sobhabazar, Ramesh Chandra Dutt, Ramendra Sunder Trivedi, Jyotirindra Nath Tagore, Gaganendra Nath Tagore, Satyendra Nath Tagore, Rajani Kanta Gupta and Hirendra Nath Dutt, to name only a few among those who had sustained and nourished this centre of learning and research in its early days of struggle and difficulty. One cannot also forget the munificent donations in the form of land and money by eminent patrons of learning like Maharaja Manindra Chandra Nandy of Cossimbazar, Raja Jogindra Narayan Roy of Lalgola, Rai Srinath Pal of Murshidabad, Prafulla Nath Tagore, Maharaja Sayaji Rao Gaekwad of Baroda and a host of others who made it possible for the Parisad to have its own building at the present site and also an annexe called "Ramesh Bhavan" dedicated to the memory of its President Ramesh Chandra Dutt.

Those were days of challenge and the pioneers had to work against heavy odds but what sustained them more than anything else was public support and sympathy. It is unfortunate that in more recent times general apathy, neglect and indifference have taken a heavy toll on the Parisad and its activities. The work of the Parisad and its precious and unique collections is truly a national trust and there is no reason why Government, at the Central and State levels, should not provide adequate funds to enable the Parisad

to conduct its affairs in a manner befitting its heritage and its tradition. Equally, it is the responsibility of the people of Bengal to come to the aid of the Parisad not only financially but also by taking keener interest in its activities. The landed gentry is no longer in a position to contribute handsomely as in the past but new classes have taken their place and it is from commerce, industry and agriculture that financial assistance can justifiably be expected.

The activities of the Parisad cover many aspects of our language, literature and culture as I was able to see for myself in the short time that I was able to go round some of the exhibition rooms. You have a priceless collection. At the same time, I must say that I was depressed and saddened to find that so many precious exhibits, so many precious manuscripts, so many precious documents have no proper place in which they can be housed, that they are exposed therefore to ravages of time and climate and that there is a paramount need therefore for Government, for the public of Bengal, for the Parisad to get together and see how quick the development of the Parisad can be fostered and, above all, how best the rare collection of very old manuscripts can be preserved. The library of the Parisad which contains many rare volumes has been enriched from time to time by the addition of the personal collection of eminent persons like Iswar Chandra Vidyasagar, Ramesh Chandra Dutt, Satyendra Nath Dutt, Binoy Krishna Deb and Satyendra Nath Tagore. The manuscript museum has a rare collection of very old manuscripts in Sanskrit and Bengali. Its museum contains old coins, stone and metallic statues, copper edicts, armour of ancient times, manuscripts etc. There is need, in my opinion, for special arrangements to be made for the security of the Parisad's valuable collection. I have no doubt that the Parisad has maintained an up to date and scientifically classified inventory of all its possessions and that periodically a physical verification is done.

The Boston Museum has been extremely gracious in returning an exhibit which was stolen from the Parisad's collection to which Dr. Chatterji has just referred and told you such a fascinating story of how the Bronze, which originally was here, has now been recovered and will soon be sent to Calcutta and find its place home here. But by and large this clandestine trade in precious art objects has become an unscrupulous and ruthless operation. Therefore,

I particularly would like to caution the Parisad and its custodians to take appropriate steps to guard against pilferage and theft. There is some urgency in creating a strong public opinion against vandals and all those who steal from Museums and temples objects of great historical, sentimental or religious value. There may be need to amend the existing law with a view to mete out draconic punishment on those who acquire illegally objects of art of great historical value or who attempt to smuggle them out of the country.

After independence the Central Government has set up institutions like Sahitya Akademi, Lalit Kala Akademi and National Book Trust of India with a view to encouraging creative talent among our writers and artistes. Following this lead many of the State Governments have also set up similar akademis to serve the cause of literature and fine arts of the States concerned. These are certainly attempts in the right direction. It is however needless to point out that the proper development of art and literature requires an atmosphere free from official interference as much as possible. It is in this context that the role of Bangiya Sahitya Parisad has assumed much more importance in the post-independence period. I have no doubt that under its present leadership the Parisad will play its due role in this regard with distinction. If the Parisad with its long and glorious tradition displays in its work the spirit of change, the spirit of renewal and the spirit of revitalisation in keeping with the requirements of the present day, I am sure, its future will be even more glorious than its past.

I thank you, friends, for listening to me so patiently and once again I convey my best wishes to the President and office-bearers of the Parisad — I would specially name its energetic Secretary Professor Madan Mohan Coomér —for the very determined and concerted efforts that have been made to, shall I say, get this ancient institution a face-lift and their attempts at rejuvenating this time-honoured institution. I conclude with an extract from a letter written by Friedrich Max Muller to this Academy in 1893 : "You have plenty of work before you, and I hope you may persevere in your patriotic efforts. I call them patriotic, because all that helps to give a people a knowledge of and a pride in .their history, strengthens their patriotism and places it on a true foundation".

Finally, as a very small token of my appreciation of the excellent work that the Parisad is doing, I would like to announce, on this occasion today, a very small donation from the Governor's Fund, a sum of Rupees Ten thousand, which I would like to be devoted solely to the purchase of suitable equipment and other items of furniture that may be required to house and preserve the precious collection of documents and manuscripts.

JAI HIND.

A. L. DIAS

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা-দিবস

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১, ২৫শে জুলাই ১৯৭৪ ॥

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ

[অনুবাদ]

জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মজুমদার, শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য্য, অধ্যাপক কুমার, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ ক'রে আপনারা আমাকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন। পরিষৎ দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানসাধনার একটি মন্দির। এই সারস্বত-মন্দিরে বিগত আট দশকে বহু বাঙালী লেখক, কবি, মনীষী এবং জ্ঞানতপস্বী নিঃস্বার্থভাবে বাণীর সেবা ক'রে গিয়েছেন। এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে-সব প্রখ্যাত ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁদের পুণ্য স্মৃতি আজও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তরে দীপ্যমান। সৌভাগ্যবশতঃ এখনও আমাদের মধ্যে আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত প্রসিদ্ধ মনীষী বিদ্যমান—যাঁরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমবয়সী এবং বয়সের ভার সত্ত্বেও তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে প্রচণ্ড উৎসাহী এবং এখনও অসামান্যরূপে কর্ম-তৎপর।

আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আচার্য্য চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে এতে আমি একটু বিব্রতও বোধ করছি, কারণ, আপনাদের যে সুন্দর সমৃদ্ধ ভাষার চর্চা ও সাধনায় দীর্ঘকাল এই পরিষদ্ ব্যাপৃত, সে ভাষায় আমি আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি না। ইংরেজীতে ভাষণ দিচ্ছি, সেজন্য আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডক্টর মজুমদার ও ডক্টর চট্টোপাধ্যায় পরিষদের ইতিহাসের নানা দিক্ এবং আধুনিক বঙ্গের জীবনে ও সাহিত্যে তার অতুলনীয় প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার-রচিত পরিষদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড-ও আজ এইমাত্র প্রকাশিত হল। এই বইখানির বিভিন্ন অংশ দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে এবং আমার সচিবের সহায়তায় এই গ্রন্থে বর্ণিত পরিষদের অতিশয় চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি লাভ করেছি। আজকের এইসব আলোচনায় আমার নতুন ক'রে বলবার বিশেষ-কিছু নেই। সুতরাং পরিষদের পক্ষে অব্যবহিত এবং জরুরী কর্তব্য বলে মনে করি এমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখেই আমার আলোচনা-সীমাবদ্ধ রাখছি। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য ও বিকৃথ অনুসন্ধান-সম্পর্কে পরিষৎ চিরদিন স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক রূপে কাজ করে এসেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা একদিন

এই সারস্বত-মন্দির প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত হয়েছিলেন। প্রথম পর্বের দুঃখদৈন্য অভাব অভিযোগ ও সংগ্রামের দিনে বহু কীর্তিমান ব্যক্তি জ্ঞানচর্চার ও গবেষণার এই কেন্দ্রটিকে সযত্নে রক্ষা ও পোষণ করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেব, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আরও অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, মুর্শিদাবাদের রায় শ্রীনাথ পাল, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, বড়োদার গায়কবাড় মহারাজা সয়াজী রাও প্রভৃতির মত যে-সকল বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ ও ভূমি দান করেছেন, তাঁদেরও আমরা ভুলতে পারি না। তাঁদেরই আনুকূল্যে বর্তমান স্থানে পরিষদের নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা এবং এরই সংলগ্ন—পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-পূত—'রমেশ-ভবন' নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

সে যুগ ছিল সংগ্রামের যুগ। বহু বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রেই চলতে হয়েছিল পথিকৃৎদের। কিন্তু সবচেয়ে বেশী বল তাঁরা পেয়েছিলেন জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইদানীং জনগণের অনীহা, অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে পরিষদের সংরক্ষণ এবং কাজকর্ম বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। পরিষদের নানা কীর্তি এবং অতুলনীয়, অমূল্য সংগ্রহ বস্তুতঃ একটি জাতীয় 'ন্যাস' এবং এর মহৎ উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কেন যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করবেন না তার কোনও হেতু নেই। সমভাবেই কেবল অর্থ দিয়ে নয়, এর কাজে সাগ্রহ সহযোগিতা করে পরিষদ্‌কে সাহায্য করা বঙ্গবাসিগণের দায়িত্ব। অতীতের মত জমিদারদের বদান্যতালাভের সুযোগ আজ আর নেই, কিন্তু শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিক্ষেত্রে নূতন যে সকল শ্রেণী তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই অর্থসাহায্য আশা করা যেতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাজ আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। আজ অল্প সময়ের মধ্যে আমি স্বচক্ষে এখানের কয়েকটি প্রদর্শনী-কক্ষ দেখলাম। আপনাদের সংগ্রহ অমূল্য। সেই সঙ্গে আমি একথাও বলব যে আমি বিষণ্ণতা ও বেদনা বোধ করছি—এত মূল্যবান্ নিদর্শন, এত মূল্যবান্ পুথি, এত মূল্যবান্ দলিলপত্র যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণের জন্য আপনাদের যথেষ্ট স্থান নেই, ফলে কালের ও আবহাওয়ার আক্রমণে এগুলি বিপন্ন। অতএব সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারের, বঙ্গের জনসাধারণের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মিলিত হয়ে কত দ্রুত পরিষদের উন্নয়ন করা যায় এবং সর্বোপরি এখানে রক্ষিত অতি প্রাচীন দুর্লভ পুথিগুলির সংগ্রহ সর্বোত্তমভাবে রক্ষা করা যায় তার প্রচেষ্টা করা। পরিষদের গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

আছে, এবং বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সুধীজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ লাভ ক'রে সে গ্রন্থাগার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। পুথিশালায় সংস্কৃত ও বাংলা বহু দুষ্প্রাপ্য পুথির সঞ্চয় এবং চিত্রশালায় প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি, তাম্রশাসন, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং পুরাতন পুথি প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। আমার মনে হয়, পরিষদের এই সব মূল্যবান্ সংগ্রহের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। সন্দেহ নেই, পরিষৎ এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত সমস্ত বস্তুর বৈজ্ঞানিকভাবে সজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ তালিকা রক্ষা করে আসছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়েও দেখছেন।

পরিষদের সংগ্রহশালা থেকে অপহৃত একটি মূর্তি প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বোস্টন মিউজিয়ম অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন, এবিষয়ে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং পরিষদে রক্ষিত ঐ ব্রোঞ্জের মূর্তিটি কিভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে তার চিত্তাকর্ষক কাহিনী আপনাদের বলেছেন ; মূর্তিটি শীঘ্রই কলকাতায় প্রেরিত হবে এবং পরিষদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মূল্যবান্ শিল্পকীর্তি নিয়ে যখন ন্যায়-অন্যায়-বোধ-হীন নির্মম, গোপন ব্যবসায় চলেছে, তখন চৌর্য্য ও অপহরণের হাত থেকে এগুলিকে বাঁচাবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা পরিষৎকে করতেই হবে। তাই বিশেষ ক'রে এই বিষয়ে আমি পরিষদ্ ও তার তত্ত্বাবধায়কদের আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। ঐতিহাসিক, ধর্মগত এবং ভাবগত কারণে পরম মূল্যবান্ আমাদের প্রত্ন-বস্তুগুলিকে যে বর্বর ও তস্করেরা যাদুঘর ও মন্দির থেকে অপসারণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত-গঠন জরুরী ও অপরিহার্য্য কর্তব্য। যারা অবৈধভাবে মহামূল্যবান্ শিল্প সামগ্রী ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে আত্মসাৎ করছে অথবা বিদেশে চালান করে দেবার চেষ্টা করছে, তাদের অতি কঠোর শাস্তি দেবার জন্য প্রচলিত আইনের সংশোধন আবশ্যক। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের লেখক ও শিল্পীদের সৃজনী প্রতিভাকে উৎসাহিত করবার জন্য সাহিত্য আকাদেমী, ললিতকলা আকাদেমী এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ রাজ্যে সাহিত্য ও ললিত-কলার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে কোন কোন রাজ্য-সরকারও অনুরূপ আকাদেমী বা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। এগুলি অবশ্যই সৎপ্রচেষ্টা। এ কথা বলা বাহুল্য যে শিল্প ও সাহিত্যের যথার্থ উন্নতির জন্য যথাসম্ভব সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত আবহাওয়ার প্রয়োজন। এই পরিবেশে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। আমার সংশয় নেই যে বর্তমান নেতৃত্বে পরিষদ্ কৃতিত্বের সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করবে। দীর্ঘ গৌরবময় ঐতিহ্যসম্পন্ন এই পরিষদ্ যদি যুগের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন, নবায়ন এবং নবজীবনের ভাবধারার পরিচয় দিতে পারে তবে তার ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়েও মহত্তর হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বন্ধুগণ! আমার ভাষণ ধৈর্যসহকারে শুনেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। আবার আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও কর্মকর্তাদের—বিশেষভাবে, বর্তমান উৎসাহী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারকে—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সমবেত চেষ্টায় এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির নবরূপায়ণের এবং দীর্ঘদিনের গৌরবমণ্ডিত এই সারস্বত-সদনের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসের জন্য। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই একাডেমির কাছে লেখা—ফ্রীড্রিখ্ মাক্স ম্যূলরের একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিঃ "আপনাদের সামনে অনেক কাজ। আমি আশা করি, আপনাদের স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় আপনারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অগ্রসর হবেন। 'স্বদেশপ্রেমপূর্ণ' বলছি এই কারণে, যে যা-কিছু দেশের ইতিহাস সম্পর্কে দেশবাসীর জ্ঞান এবং গৌরব-বোধ জাগায়, তাই তার দেশাত্মবোধকে দৃঢ় করে এবং স্বদেশপ্রেমকে সত্যকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।"

সর্বশেষে, পরিষদ্ যে চমৎকার কাজ করছেন তা উপলব্ধি ক'রে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার একটি বিনীত ঘোষণাঃ রাজ্যপালের তহবিল থেকে খুব সামান্য একটি অঙ্ক, দশ হাজার টাকা, আপনাদের হাতে দিতে চাই। আমার ইচ্ছা, পরিষদের বহুমূল্যবান্ দলিলপত্র ও প্রাচীন পুথিপত্র সংরক্ষণের উপকরণ ও সেইজন্য প্রয়োজনীয় আসবাবাদি ক্রয়েই এই অর্থ ব্যয়িত হবে।

জয় হিন্দ॥

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আণ্টনি লান্সলট্ ডিয়াসের ভাষণ। টেপরেকর্ডে গৃহীত মূল ইংরেজী ভাষণটি অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

মোহিতলাল মজুমদারের একটি অপ্রকাশিত কবিতা

[মোহিতলাল মজুমদার (জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮, মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৯৫২) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্‌লা সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন ; ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মোহিতলালের সহিত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, প্রফুল্লকুমার গুহ, হীরেন্দ্রলাল দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেশকুমার মিত্র প্রমুখের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহারা রমনার নীল-ক্ষেত-প্রান্তরে সান্ধ্যভ্রমণকালে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও হাস্য-পরিহাসে আনন্দ-উচ্ছল অবসর মুহূর্তগুলি উপভোগ করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্য্য পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১লা জুলাই ১৯৪২ অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা চলিয়া আসার পূর্বদিন মোহিতলাল, রমেশচন্দ্রের উদ্দেশে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন। ১৫ই আষাঢ় ১৩৪৯ (৩০শে জুন ১৯৪২) সন্ধ্যায় নীলক্ষেত-পদচারী-দলের পক্ষ হইতে মোহিতলাল স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি কবিযা সান্ধ্যভ্রমণের নিত্যসঙ্গী শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের হাতে অর্পণ করেন। রমেশচন্দ্র, মোহিতলালের এই কবিতাটি সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর কাল সযত্নে রক্ষা করিযা আসিযাছেন। বঙ্গের বিভিন্ন কবি ও মনীষীর পত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার জন্য সংগ্রহকালে পরিষদের বর্তমান সম্পাদক মোহিতলালের এই কবিতাটি প্রার্থনা করিলে রমেশচন্দ্র কবিতাটি পরিষদে দান করিয়াছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবি মোহিতলালের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসবে রমেশচন্দ্র এই কবিতাটি শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে স্বয়ং পাঠ কবিযা শোনান। কবিতাটি পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "বাঙ্গালী" নাটকের কবি মোহিতলাল মজুমদার-কৃত ইংরেজী অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি এবং মোহিতলালের কয়েকখানি চিঠিও সংগৃহীত হইয়া ঐ দিন পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১—১৯৩৬ ইতিহাসের অধ্যাপক, ১৯৩৭ জানুআরি হইতে ৩০শে জুন ১৯৪২ উপাচার্য্য ছিলেন ; শ্রীহীরেন্দ্রলাল দে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী গণিতের অধ্যাপক, স্বর্গত ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, স্বর্গত প্রফুল্লকুমার গুহ ইংরেজীর অধ্যাপক এবং স্বর্গত সুরেশকুমার মিত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ছিলেন।

—পরিষৎ সম্পাদক।]

নীলক্ষেত-পদচারীদলের পথ-সহচর
পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের
বিদায়-উপলক্ষে

প্রীতি-নিবেদন

পথের প্রান্তে, আজিকে বন্ধু, তোমারে বিদায় দিনু—
যেখান হইতে প্রতি-সন্ধ্যায় তোমা সাথে ফিরেছিনু ;
আজিকে সে-পথে ফিরিব সকলে একা,
হয় ত' ইহাই পথিকের সাথে পথিকের শেষ দেখা।

না জানি কখন্ কেমনে হ'ল যে এমন পথের প্রীতি,
নূতন সমাজ গড়িনু আমরা—নূতন মিলন-রীতি ;
মুক্ত আকাশে, নীলক্ষেত-প্রান্তরে,
একটি সে পথ মিলাইল সবে—মিলে নাই যারা ঘরে !

এ পথের এই ছায়াতরুবীথি—কোথাও বা খোলা-মাঠ—
গৃহকোণে বসি'—দিল না সাধিতে নিজ নিজ পূজা-পাঠ।
কেহ ছেড়ে এল গাঢ়তর আলাপন,
কেহ বা বাঁচিল কিছুখন তরে ক্ষান্ত রাখিয়া রণ !

প্রতি-সন্ধ্যায় পথের সে ডাকে ঘর হ'তে বাহিরিয়া
আলাপে-প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে গেনু সবে পাসরিয়া—
কোন্ সাজে মোরা সাজি সারা দিনমান,
পথের কুহকে পথচারীদের থাকে নাক' সেই জ্ঞান !

সে কথা বুঝিনু আরো ভাল করি', তোমারে লভিনু যবে,—
সেও কি পথের কুহক, অথবা নিজেরি সে গৌরবে
মোদের ললাটে পরাইলে জয়টীকা,
হেরিনু মাঠেরো ললাটে ঝলিছে তাহার স্বর্ণ-শিখা !

পদে পদে পদ মিলায়ে চলিতে, পথের ছন্দে তবু
তোমার প্রাণের শোনালে যে সুর—সে আর শুনিনি কভু।
তব হৃদয়ের সেই শোভা সুন্দর—
যেন সে আকাশে অস্ত-মেঘের বর্ণের নির্ঝর !

হেথা সকলেই পরবাসী মোরা—ঘরে নয়, পথে দেখা ;
পথ ফুরালেই সাথীরা সবাই চলে' যাবে একা একা।
তবু দিনে-দিনে সেই সে পথেরি মাঝে,
মানুষে মানুষে হয় পরিচয় কত কাজে কত সাজে।

কোন' কাজ নয়—অকাজের মত আমাদের পথ-চলা,
চলিতে চলিতে যার যাহা খুশী, প্রাণ খুলে' তাই বলা,—
উচ্চকণ্ঠে, কভু বা উচ্চহাসে ;
হিল্লোল তার মিলাইয়া যায় হাওয়ার হুহু-শ্বাসে।

এমনি করিয়া কত না সন্ধ্যা, কত সায়াহ্ন-বেলা
যাপিনু, বন্ধু,—তুমি সে আমোদে কভু কর নাই হেলা।
আজ দেখি একি !—পথের ধূলার ফাঁদে
ধরা দিয়েছিল কোন্ প্রাণখানি ? পথ যে আজিকে কাঁদে !

বেলা পড়ে' এলে, শিরীষ-তরুটি রহিবে যে বাহু মেলি'—
দাঁড়াতে যেথায় সেই ভূমি' পরে সুশীতল ছায়া ফেলি',
জানিবে না সে ত'—চলে' গেছ বহুদূরে,
আর হেরিবে না হাস্য-বদন পথচারী বন্ধুরে !

কৃষ্ণচূড়াও লাল শামিয়ানা দু'ধারে বিথারি' হোথা
ভাবিবে, এখনি দিবে দরশন—দাঁড়ায়েছে পথে কোথা' ;
ঈষৎ-বেগুনী জারুলের ফুল-বীথি
প্রতি বৈশাখে বহিবে তোমার পদচারণের স্মৃতি।

আর আমাদের ?—প্রথম দু'দিন ভুল হবে বার বার—
যেন একজন এখনো যে বাকি, দেখা নাই কেন তার।
না কহিতে কিছু, সহসা পড়িবে মনে,
আর হেরিব না তোমারে, বন্ধু, এইখানে, এই ক্ষণে !

হেরিব না সেই যূথপতি-সম দৃঢ় তব পদচার,
শুনিব না সেই গাঢ়কণ্ঠের সংযত উৎসার—
অন্তর হ'তে আত্মীয়তার বাণী।
কভু সে গভীর, কভু লঘুভাষে ঘুচা'ত মনের গ্লানি।

হয় ত তুমিও পেয়েছিলে কিছু মোদের সঙ্গ কবি' ;
ধুতি ও পিরান, হাতে লাঠিখানি—ধড়া-চূড়া পবিহবি'—
দিনান্তে শুধু অর্দ্ধদণ্ড তরে
খোলা-মাঠে বুঝি প্রাণের মুক্তি লভিতে তৃপ্তিভবে ?

পদ-পদবীর তুঙ্গশিখরে ঝড়েব ঝাপট সহি',
ওই শিরে তব দুর্ভর-ভার—লোক-সম্মান বহি'—
উচ্চে-ওঠার শাস্তিও প্রতি পদে,
তবু মধুহীন কর নাই কভু তব মন-কোকনদে।

এইচ্-এল্ দে, কে-ডি, গুহ, আর—মিত্র, গাঙ্গুলী, কবি,
(সর্ব্বশেষেব নামটাই সার,—বিপবীত তাঁব সবই।)
একসাথে হাতে দিয়েছিনু বেঁধে মোরা
একটু মোহেব একটু স্নেহেব বঙীন্ বাখীর ডোবা।

তারি ভরসায মিনতি মোদেব, এই শেষ সন্ধ্যায—
যেখানেই থাকো, ভাবিযো বাবেক—এই তরুবীথি-ছায,
এই নীলক্ষেতে, গোধূলিব প্রান্তবে,
তোমারে, বন্ধু, খুঁজিতেছি মোবা আবেক পথেব 'পবে।

সে পথে আমরা ত্বরিতে মিলিব—মধুব স্বপ্নবৎ—
সে যে নির্ম্মল মনেব আকাশে স্মবণের ছাযা-পথ।
সে পথে এমনি দাঁড়াইবে তুমি আসি'—
নমস্কারেব পবেই হেবিব সেই মুখে সেই হাসি !

নীলক্ষেতের পদচারী বন্ধুদল
হীরেন্দ্রলাল দে, ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, প্রফুল্লকুমার গুহ,
সুবেশকুমার মিত্র, ধীবেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী,
মোহিতলাল মজুমদাব

নীলক্ষেত, রমনা ;
ঢাকা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪৯।

'প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ'

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাঙলা-বিহারেব পালবংশীয় সম্রাট্ ধর্মপাল আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বাজত্ব করিযাছিলেন। তাঁহাব খালিমপুর তাম্রশাসনে তদীয় পিতৃদেব এবং বংশের আদি নরপতি গোপাল (আনুমানিক ৭৫০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

মাৎস্যন্যাযমপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ কবং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূডামণিস্তৎসুতঃ।

অর্থাৎ দেশের অরাজক অবস্থা-দূবীকরণেব উদ্দেশ্যে প্রকৃতি বা প্রজাগণ শ্রীযুক্ত গোপালের সহিত রাজলক্ষ্মীর বিবাহ দিযাছিল। 'বাজলক্ষ্মীব সহিত বিবাহ দেওয়া বলিতে অবশ্যই রাজা নির্বাচিত কবা বুঝিতে হইবে।' অক্ষয়কুমাব মৈত্রেয প্রণীত 'গৌডলেখমালা', পৃষ্ঠা ১২, শ্লোক ৪ দ্রষ্টব্য।

প্রজাবর্গ কর্তৃক ব্যক্তিবিশেষকে রাজারূপে নির্বাচনের এইরূপ উল্লেখ ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এবং আদি মধ্যযুগের গ্রন্থাদি ও লেখাবলীতে আরও দেখিতে পাওয়া যায। কিন্তু প্রকৃতি বা প্রজা বলিতে ঠিক কি বুঝায, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক সমাজে মতদ্বৈধ আছে। প্রথমে ঐ ধবণেব দুই চারিটি দৃষ্টান্তেব উল্লেখ কবিয়া আমরা ঐ মতদ্বৈধের আলোচনা করিব।

রামাযণে (১।৪২।১) আছে—

কালধর্মং গতে বাম সগবে প্রকৃতিজনাঃ।
বাজানং বোচয়ামাসুরংশুমন্তং সুধার্মিকম্॥

অর্থাৎ ইক্ষ্বাকুবংশীয নবপতি সগবেব মৃত্যুব পর প্রকৃতিজনেরা তৎপুত্র অংশুমান্‌কে রাজা নির্বাচিত কবিযাছিল।

কাঞ্চীর পল্লব-বংশে পালবংশীয গোপালের সমকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দ্বিতীয নন্দিবর্মা পল্লবমল্ল (৭৩০-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করিযাছিলেন। কশাকুডি তাম্রশাসনে তৎসম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, প্রজাগণ তাঁহাকে বাজপদে বরণ করিয়াছিল—'বৃতঃ প্রজাভিঃ'। South Indian Inscriptions, Vol. III, Part II, p. 349 দ্রষ্টব্য।

অনুরূপভাবে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসামের পালরাজবংশের আদি নরপতি ব্রহ্মপাল সম্বন্ধে বলা হইযাছে—'প্রকৃতযো ভুভাররক্ষণক্ষমং……পরিচক্রিরে নরপতিং শ্রীব্রহ্মপালং হি যম্'। অর্থাৎ ভৌমবংশের একবিংশতিতম নরপতি ত্যাগসিংহ অপুত্রক অবস্থায পবলোকগমন করিলে প্রকৃতিবর্গ ঐ বংশেরই কোনও শাখায় উদ্ভূত ব্রহ্মপালকে রাজা নির্বাচিত কবিযাছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকৃত 'কামরূপশাসনাবলী', পৃষ্ঠা ৯৪ (বত্নপালেব তাম্রশাসন, ৫ াক ১০) দ্রষ্টব্য।

পূর্বে পণ্ডিতসমাজে যে মতভেদের উল্লেখ করিয়াছি,তাহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহে প্রজাকর্তৃক রাজা নির্বাচনের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়, উহার কোন বিশদ বিবরণ মেলেনা। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বিবরণে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত হইতে পারে, তাহাতে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাই প্রজাদ্বারা রাজা নির্বাচন সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই।

স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার 'গৌড়রাজমালা'য় (পৃষ্ঠা ২১) স্থির করিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালার জনসাধারণ কর্তৃকই অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গোপালের নির্বাচনসূত্রে মাৎস্যন্যায় বিদূরিত এবং গৌড রাষ্ট্র পুনরুজ্জীবিত হইযাছিল।" অবশ্য ঘটনাটির তারিখ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে, শেষভাগে নহে। যাহা হউক অক্ষযকুমার মৈত্রেয, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণও চন্দ মহাশযের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। মৈত্রেয় মহাশযের 'গৌডলেখমালা', পৃষ্ঠা ১৯ (পাদটীকা) এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম ভাগ (১৩৩০ সন), পৃষ্ঠা ১৫১, ১৬৩ ও ১৭১ দ্রষ্টব্য।

অপরদিকে আবদুল মোমিন চৌধুরীর Dynastic History of Bengal (Dacca, 1967) গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "The verse in question does not seem to speak of any election or selection by the Prakritis, in whatever sense the word may be taken. What it says is that the Prakritis made Gopala take the hands of fortune in order to put an end to the state of Matsyanyaya. The metaphorical information can be taken to mean simply that Gopala was assisted by a few Prakritis to gain power or, in other words, Gopala with the support of a few Prakritis (possibly some ruling chiefs or officials who were his camp-followers) succeeded in mastering power and thus put an end to the state of lawlessness." পৃষ্ঠা ১১ দ্রষ্টব্য। এই ব্যাখ্যার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রাজ্যই ঐভাবে স্থাপিত হইযাছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অগণিত রাজ্যপ্রতিষ্ঠাপকদের মধ্যে কেবলমাত্র দুই চারি ব্যক্তিকে প্রজাগণদ্বারা নির্বাচিত বলা হইয়াছে। অবশ্যই ইহার কোন কারণ ছিল এবং প্রমাণ ব্যতীত এইরূপ অসাধারণ দাবিকে উডাইযা দেওযা সম্ভব মনে করি না। মোমিন সাহেবের ব্যাখ্যা সত্য হইলে নির্বাচনের দাবির কোনই মূল্য থাকে না।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশযের History of Ancient Bengal (Calcutta, 1971) গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "According to the couplet referred to above, Gopala was made king by the Prakritis. The common meaning of the word is 'subject', and it has consequently been held that Gopala was elected king by the general body of people. Although this view has met with general acceptance, it is open to doubt whether the passage refers to anything like a regular election by the

general mass of people, and, if so, whether this was at all practicable in those days and in such abnormal times. It would, perhaps, be more reasonable to hold that the choice was originally made by the leading chiefs, and was subsequently endorsed and acclaimed by the people." পৃষ্ঠা ৯৫ দ্রষ্টব্য। অবশ্য চন্দ মহাশয় এবং অন্যান্যেরাও আধুনিক প্রথায় জনসাধারণ কর্তৃক ভোট দ্বারা রাজা নির্বাচন বুঝিযাছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারাও সম্ভবতঃ "acclaimed by the people" বুঝিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই ধরণেব নির্বাচনেব যে দুই একটি ঐতিহাসিক বিবরণী আমাদের জানা আছে, তাহা অনুসবণ করিলে বিষয়টি বুঝিবার জন্য বোধ হয় আমাদিগকে বেশী মাত্রায় অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

পূর্বে আমবা পল্লববংশেব কাঞ্চীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্লের প্রজা দ্বারা রাজপদে বরণের উল্লেখ করিয়াছি। ঘটনাটিব অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ কাঞ্চীপুরের বৈকুণ্ঠ পেরুমাল মন্দিরের তামিল শিলালেখাবলীতে পাওয়া যায়। পল্লববংশীয সম্রাট্ দ্বিতীয পরমেশ্বরবর্মা নিঃসন্তান অবস্থায অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করায় রাজ্যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। দেশের সেই মাৎস্যন্যাযজনিত দুর্দিনে মাত্র (মন্ত্রী) ও মূলপ্রকৃতিগণ এবং 'ঘটকয়র্' ঐ বংশেব হিরণ্যবর্মা নামক মহাবাজেব নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেশের দুরবস্থার কথা নিবেদন কবিয়া একজন রাজা চাহিলেন। হিরণ্যবর্মা তখন 'কুলমল্ল'গণকে আহ্বান করিয়া জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ পল্লব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে চাহেন কিনা। কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঐ গুরুভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর হিবণ্যবর্মা তাঁহার শ্রীমল্ল, রণমল্ল, সংগ্রামমল্ল এবং পল্লবমল্ল নামক চারি পুত্রকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম তিন জন সিংহাসনের দাযিত্ব গ্রহণে অস্বীকাব কবিলে সর্বকনিষ্ঠ পল্লবমল্ল বিনম্রভাবে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর। হিরণ্যবর্মা প্রথমে তাঁহার নাবালক পুত্রকে ঐ সুকঠিন কার্যের জন্য ছাড়িতে বাজী হন নাই। পরে ধরণিকোণ্ড পোশর নামক জনৈক নায়কেব বিশেষ অনুরোধে তিনি পুত্রকে পল্লবসিংহাসন গ্রহণে অনুমতি দিয়াছিলেন। তখন পল্লবমল্ল কাঞ্চীপুব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাজ-ধানীর নিকট পৌঁছিলে, পল্লবদি-অবৈযর্ নামক জনৈক নায়ক বৃহৎ একদল সেনা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং পল্লবমল্লকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া কাঞ্চীপুরে লইয়া যান। সেখানে তিনি সামন্তবর্গ, বণিক্‌সংঘ, মূল প্রকৃতিসমূহ এবং কাডক্ক মুত্তবৈযর্ নামক নায়কেব অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। অতঃপব মন্ত্রিদল, সামন্তবর্গ, 'ঘটকযর্' এবং উভযগণ (স্বদেশী ও পবদেশী বণিক্ সংঘদ্বয) কর্তৃক তিনি নন্দিবর্মা নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং 'বিডেলবিডুগু', সমুদ্র ঘোষ, খট্টাঙ্গধ্বজ ও বৃষভলাঞ্ছন

সংজ্ঞক বাজচিহ্ন লাভ করেন। South Indian Inscriptions, pp. 10 ff. (No. 135) এবং Epigraphia Indica, vol. XVIII, p. 117 দ্রষ্টব্য।

উপবেব বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায, পল্লববংশীয কাঞ্চীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লব-মল্লেব বাজপদে নির্বাচনে পল্লববাজ্যেব সমুদয় প্রজা অংশগ্রহণ কবে নাই, ইহা সত্য; কিন্তু উহা নিতান্ত ফাঁকা দাবি নহে। অধিকন্তু ঐভাবে নির্বাচনেব দাবি সাধাবণ কোনও নবপতিব পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আমবা কল্‌হনকৃত 'রাজতবঙ্গিণী'ব পঞ্চম তবঙ্গে বর্ণিত বাজা যশস্কবেব নির্বাচনেব কাহিনীব উল্লেখ কবিতে পাবি। উহাব বর্ণনা বৈকুণ্ঠ পেরুমাল মন্দিবেব লেখাবলীব বর্ণনা হইতে অনেকটা অন্যরূপ এবং উহাতে বুঝা যায় যে, বাজা নির্বাচনেব প্রথা সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে একরূপ ছিল না।

৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাচাবী কাশ্মীববাজ অবন্তিবর্মা বা উন্মত্তাবন্তি ক্ষয়বোগে আক্রান্ত হইযা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। তখন দাসীবা কোথা হইতে শূববর্মা নামক একটি শিশুকে আনিয়া উহাকে বাজাব ঔবসজাত পুত্র বলিযা বটাইযা দিল এবং মৃত্যুপথযাত্রী নবপতি তাহাকে বাজাসনে অভিষিক্ত কবিলেন। সামন্ত, মন্ত্রী, একাঙ্গ এবং তন্ত্রী প্রভৃতিব হস্তে শিশু বাজাব বক্ষণাবেক্ষণেব ভাব ন্যস্ত কবিযা অবন্তিবর্মা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সংবাদ পাইযা বিদ্রোহী সেনাপতি কমলবর্ধন বাজধানী শ্রীনগব আক্রমণ কবিলেন। একাঙ্গ, তন্ত্রী, সামন্ত ও অশ্বাবোহী সেনাদল তাঁহাকে বাধা দিতে গিযা পবাজিত হইল। নিজেব অল্পসংখ্যক অশ্বসেনাব সাহায্যে বাজপক্ষেব সহস্র সহস্র অশ্বাবোহী সৈন্য বিতাড়িত কবিয়া কমলবর্ধন বাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবিলেন। তখন শিশুবাজাব পক্ষ ত্যাগ কবিযা বাজপক্ষীয সেনাদল পলাইয়া গেল। বাজমাতা নিঃসহায পুত্রকে লইযা কোন গুপ্তস্থানে আত্মগোপন কবিলেন।

বাজ্যাভিলাষী হইযাও বাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এবং ভীরুপ্রকৃতি কমলবর্ধন তৎক্ষণাৎ সিংহাসন অধিকাব কবেন নাই। পবদিন তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত কবিযা সবলভাবে বলিলেন, "আপনাবা স্বদেশবাসী যে যুবককে কার্যক্ষম বুঝিতেছেন, সেই উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজা নির্বাচিত করুন।" কমলবর্ধনেব ধাবণা ছিল যে, ব্রাহ্মণেবা তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিযা বাজপদেব জন্য নির্বাচিত কবিবেন। কিন্তু সমবেত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পাঁচ ছয় দিন ধবিযা বাজা হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তিব নাম প্রস্তাব কবিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা চালাইতে লাগিলেন। কমলবর্ধন তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাবা ইঁট ছুঁড়িযা তাঁহাকে তাড়াইযা দিলেন। ইতিমধ্যে অবন্তিবর্মাব মহিষীগণেব অনুচবেবা যশস্কব নামক জনৈক সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ব্রাহ্মণ যুবককে ঐ ব্রাহ্মণদিগেব সভায় উপস্থিত হইবাব সুযোগ করিয়া দিলেন। অদৃষ্টেব প্রভাবে ব্রাহ্মণেবা যশস্কবকে দেখিবামাত্র একমত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে একযোগে ঘোষণা কবিলেন, "এই ব্যক্তিই আমাদেব বাজা হউক।" কল্‌হন পণ্ডিত মন্তব্য কবিযাছেন, "পার্থেব পুত্র (অবন্তিবর্মা) যদি ভৃত্যগণেব

কুবুদ্ধি-প্রভাবে নিজের বংশকে নষ্ট না করিতেন এবং পরে কমলবর্ধন আসিয়া যদি আবার তাঁহার পুত্রকে বিদূরিত না করিতেন, তবে অনুচ্চবংশসম্ভূত ও দারিদ্র্যপীড়নে ভূ-পর্যটনকারী এই অভাগ্য যশস্করদেবের পক্ষে রাজ্যলাভ কিরূপে সম্ভব হইত?" দ্রষ্টব্য 'রাজ-তরঙ্গিণী', তরঙ্গ ৫, শ্লোক ৪৪৫ হইতে।

উল্লিখিত বর্ণনাটি পড়িয়া প্রথমেই আমাদের মনে হয়, কমলবর্ধনের পক্ষে সম্ভবতঃ সৈন্য সাহায্যে ব্রাহ্মণদিগকে বিতাড়িত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার অসম্ভব ছিল না। বোধ হয় তিনি ভীরুস্বভাব ছিলেন বলিয়াই তাহাতে সাহসী হন নাই। কিন্তু যশস্কর কমলবর্ধন অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও নীতিজ্ঞ ছিলেন দেখা যায়। তিনি রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই দৌবারিকগণকে আদেশ দিলেন, "ঐ ব্রাহ্মণদিগকে ওখান হইতে দূরে সরাইয়া দাও।" দৌবারিকেরা যখন ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিল, তখন নবীন রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিতেছিলেন, "আপনারা আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে দেবতার মত পূজা করিব। কিন্তু রাজ্যদানের জন্য আপনারা অভিমানে উদ্ধত হইয়া থাকিবেন, সেটি হইবে না। কার্য্যকাল ব্যতীত অন্যসময়ে আপনারা কেহই আমার নিকটে আসিবেন না।" 'রাজতরঙ্গিণী', তরঙ্গ ৬, শ্লোক ২-৪ দ্রষ্টব্য।

ঘটনাটি হইতে যশস্করের সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতিজ্ঞানের জন্যই দীনদরিদ্র যশস্কর কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি হইতে সমর্থ হন। আর উহার অভাবেই হাতে আসিয়াও কাশ্মীর-সিংহাসন সেনাপতি কমলবর্ধনের হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

যাহা হউক, যশস্করের কাহিনী হইতে দেখা যায়, দেশের ব্রাহ্মণেরা কখনও কখনও রাজা নির্বাচন করিতেন। খুঁজিলে এই ধরণের এবং অন্যান্য প্রকারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যে সকল প্রাচীন ভারতীয় নরপতি প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের দাবি উপেক্ষণীয় নহে। তবে সকলের নির্বাচনপদ্ধতি এক ধরণের না হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এই ক্ষুদ্র আলোচনা সমাপ্ত করিব। এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বা 'জনসাধারণের নির্বাচন' কথাটির অর্থ কি? আজিও গণ্য করিবার মত আয়তনবিশিষ্ট এমন কোন রাষ্ট্র নাই যেখানে বালক, স্ত্রীলোক, নিরক্ষর, উন্মাদ প্রভৃতি সমুদয় অধিবাসীর ভোটদানের অধিকার আছে। সুতরাং এযুগেও নির্বাচন ঠিক জনসাধারণের নহে, রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকের মনোনীত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা নির্বাচন। আবার নির্বাচিত ব্যক্তি যে প্রতিনিধিগণের সকলেরই মনোনয়ন লাভ করেন, তাহা নহে। তাই বর্তমান কালের নির্বাচনকে যদি জনসাধারণের নির্বাচন বলিতে বাধা না থাকে, তবে প্রাচীনকালের নির্বাচনকেও জনসাধারণের বলিয়া উল্লেখ করায় কোন ক্ষতি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত

ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্ত

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়। এই যুগের আরম্ভে প্রায় আড়াই শ' বছরের পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট ক'রে, প্রগতিশীল সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার সব আশা ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা। সমস্ত শতাব্দী ধরে দেশে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায়, সামাজিক অরাজকতা ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

৩রা মার্চ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর ক্যাম্পে আউরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগে থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ পরিষ্কার হয়েছিল এবং তাঁর দুর্বল বংশধরদের অলসতা ও অকর্ম্মণ্যতার জন্য এই পতন অবশ্যম্ভাবী রূপ ধারণ করেছিল। হারেমের বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত মূর্খ ফারুখ্‌সিয়র্ ও মুহম্মদ শাহ-এর এমন সাধ্য ছিল না যাতে এই পতন রোধ হয়। এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বীর্য্য সম্রাটদের শাসনকার্য্যে অবহেলার দরুণ চারিদিকে দুর্নীতি ও অসাধুতা ব্যাপকরূপে দেখা দিয়েছিল। যে শাসনব্যবস্থা দেশ ও জাতির স্বার্থরক্ষায় পরাঙ্মুখ ও অপারগ, তার বিলুপ্তি অনিবার্য্য। ইতিহাসের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুযায়ী মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্বাভাবিক ও সমর্থনীয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক ডঃ স্টারস্, ল্যাঙ্কাস্টার রাজবংশ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, মোগল সম্রাটদের অষ্টাদশ শতাব্দীর আচরণ বিচার করে আমাদেরও তাই ব'লতে ইচ্ছা করে, "The dynasty that had failed to govern must cease to reign"।

এই পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায় তথা আমীর-ওমরাহবর্গের চরিত্রও তাদের সম্রাটদের চরিত্রের অনুরূপ নিম্নগামী ছিল। সম্রাটের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, এবং বাবর, আকবর ও আউরঙ্গজেবের সময়ে যারা সাম্রাজ্যের সকল সেবায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল, পরবর্ত্তীকালে তাদেরকে সঠিকভাবে চালনা করার, শাসনকার্য্যে লাগানোর ও তাদের আনুগত্য অর্জন করার জন্য চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ও কূটনীতিবিশারদ কোনো মোগল সম্রাটের আবির্ভাব হয় নি। এই প্রসঙ্গে উজীর সর্‌দুল্লাহ খাঁন-এর একটি উক্তির মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, সে কথা মনে পড়ে। তাঁর কথায় বলতে গেলে— "কোনো যুগেই দক্ষ ব্যক্তির অভাব হয় না। তাদেরকে খুঁজে বার করা, নিজের দলভুক্ত করা এবং স্বার্থান্বেষীদের মিথ্যা অভিযোগ কানে না তুলে তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া বিচক্ষণ শাসকের কর্ত্তব্য"। "No age is wanting in able men; it is

the business of wise masters to find them out, win them over, and get work done by means of them, without listening to the calumnies of selfish men against them." ১

কিন্তু, উপযুক্ত শাসক ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অভাবে মোগল অভিজাত সম্প্রদায় অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের অসাধু কার্য্যকলাপে দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণীর অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুণ যে রাজনৈতিক দলাদলি সৃষ্ট হয় এবং পুষ্টিলাভ করে, তার ফল কোনো দেশে কোনো কালে ভালো হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত অভিজাতবর্গের প্ররোচনায় অসংখ্য স্বার্থান্বেষী যুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতকতায়, ষড়যন্ত্রে, গুপ্তহত্যায় ও নির্ব্বিচার নির্য্যাতনে শোকে ভয়ে মূক হয়ে গিয়েছিল। যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ১৭১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাট ফারুখ্‌সিয়রকে প্রথমে অন্ধ ও পরে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়, যে নীচ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ ২রা জুন, ১৭৫৪ তারিখে আহমদ শাহ সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হন, এবং যে ভাবে উজীর ইমাদ্-উল্-মুলক্'এর হাতে ১৭৫৯ সালের ২৯শে নভেম্বর দ্বিতীয় আলমগীর নিহত হন ও দ্বিতীয় শাহ আলম্ রাজ্যচ্যুত হন—সে সব কথা শুনলে আজও শিউরে উঠতে হয়।

চক্রান্তকারী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজাতবর্গ তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম দলে, উচ্চপদস্থ হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানগণ; দ্বিতীয় দলে, তুরান বা ট্রান্সঅক্সিয়ানা'র সুন্নী মুসলমানগণ, এবং শেষোক্ত দলে, পারস্য দেশের শিয়া মুসলমানগণ। এই সব দলের পারস্পরিক কলহ বিবাদে সারা দেশের নাগরিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়েছিল। তখন দেশে এমন কোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ নেতা ছিলেন না যিনি আকবরের মতো জাতীয় জীবনে প্রগতির জন্য কোনো পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পারেন, এমন কোন রাজনৈতিক মহাপুরুষ এই যুগে আবির্ভূত হন নি যিনি দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য পথনির্দ্দেশ দিতে পারেন।[২] তাই সমসাময়িক একটি স্মৃতিচারণে সিরাজউদ্দৌলার দরবারের প্রসঙ্গে, আমরা দেখতে পাই, লেখা আছে যে সকলে যেন স্বার্থপরতা জীবনের একমাত্র ব্রত বলে মেনে নিয়েছিল। নিদারুণ হতাশায় ও দুঃখে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী জঁা ল' (Jean Law) ১৭৫৯ সালের এপ্রিল মাসে ইতিহাসকার গোলাম হোসেনকে বলেছিলেন,—"আমি বাংলা থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন স্থান আমার নজরে পড়েনি যেখানে গরীবের উপর নির্য্যাতন ও পথচারীদের সর্ব্বস্বাপহরণ হয় না। আমি চেয়েছিলাম যে সুজা ও ইমাদ্-এর মতো রাজা বা আমীর দেশের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করুন এবং ইংরেজদের দমন করুন, কিন্তু তাঁরা কেউই সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁদের নিশ্চেষ্টতার ফল যে কি হতে পারে তাঁরা তা কোনোদিন

(১) Irvine, *Later Mughals* vol. II, P. 311. ২ ibid, p. 314.

বিচার করেননি। ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায় দুর্নীতিপরায়ণ অস্থিরচিত্ত নির্বোধের দল ও ভারতীয় জীবনে সকল দুঃখের মূল।"[৩] ১৭৬৮ সালে সম্রাট শাহ আলম ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখেছিলেন, "অভিজাত ও সামন্তবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা এই অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। তারা প্রত্যেকে নিজের এলাকায় আপন সার্ব্বভৌমত্ব প্রচার করে এবং একে অন্যের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত থাকে। সবল দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব করে।.....মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার এই যুগে মহামহিম [মোগল] বাদশাহ ইংরেজ প্রধানগণ ছাড়া আর কারো সেবা বা আনুগত্যে আস্থা রাখেন না।" "Through the perfidiousness of the nobility and vassals this anarchy has arisen, and every one proclaims himself a sovereign in his own place, and they are at variance with one another, the strong prevailing over the weak . . In this age of delusion and deceit, His Majesty places no dependence on the services or professions of loyalty of any one but the English chiefs."[৪] ফলতঃ জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী অন্তর্বিরোধ বিদেশী শক্তিকে কোনো দেশে অধিকার বিস্তারে প্রলোভিত করে। দুর্ব্বল শরীরে যেমন সহজে রোগ প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে, তেমনই গৃহবিবাদে শক্তিহীন ভারত বিদেশী শক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলো এবং বিদেশীদের করকবলিত হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর পোল্যাণ্ডের মতো ভারত তার অভিজাতবর্গের স্বার্থান্ধতার কারণে পরাধীন হলো। ₹ 36,222

বহিঃশত্রুর ক্রমাগত আক্রমণে প্রায় তিরিশ বছর ধরে সারা উত্তর ভারত বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখে গেছেন যে দেশে তখন নাম মাত্র শাসন-ব্যবস্থাও ছিল না। "সীমান্ত রক্ষীদের বেতন খুবই কম ছিল এবং তারা তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে কর্ত্তব্যে উপস্থিত থাকতো না। অবহেলিত দুর্গগুলি বিদেশীদের আক্রমণ করতে সাহসী করেছিল। রাজসরকারের শক্তিহীনতা ও মন্ত্রীবর্গের অমনোযোগিতা সব জায়গায় আলোচিত হতো। প্রশাসনিক কোনো ভয় বা বন্ধন না থাকায় প্রত্যেকে ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা না বিচার করে বর্ত্তমান স্বার্থসিদ্ধির কথাই কেবল চিন্তা করতো। রাস্তা ও গিরিপথগুলি সুরক্ষিত না থাকায় যে কেউ বিনা বাধায় যাওয়া-আসা করতো। কোথায় কি ঘটেছে তার গুপ্ত-সংবাদ দিল্লীর দরবারে পাঠানো হতো না এবং সম্রাট বা তাঁর ওমরাহরা কখনও এমন জিজ্ঞাসা করতেন না যে কেন কোন সামরিক গুপ্তসংবাদ তাঁদের কানে কখনও পৌঁছায় না।" "Hence the guards being ill-paid, abandoned their posts, and the garrisons being utterly neglected, invited the invaders, and the report of the Ministers' indifference, and the weakness of

৩ *Siyar-ul-mutakherin*, Vol. II, p. 257.—Quoted in Sarkar, J. N., *Fall of the Mughal Empire*, Vol. II, p. 528.

৪ *Calendar of Persian Correspondence*, Vol II., pp. 1101, 1836.—Quoted by J. N. Sarkar, ibid.

the Government being rumoured everywhere, everyone without fear of control thought only of his personal interests without minding any consequences. The roads and passes being neglected, everyone passed and repassed, unobserved; no intelligence was forwarded to court [of Delhi] of what was happening; and neither Emperor nor the nobles ever asked why no intelligence of that kind ever reached their ears."

পারস্যের আক্রমণ কম্পমান মোগল সাম্রাজ্যের উপর নিক্ষিপ্ত প্রথম মৃত্যুবাণ। এককালে এই পারস্য দেশ বাবরকে ভারতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল এবং রাজ্যহীন হুমায়ুনকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ-এর নেতৃত্বে পারসিকদের আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিন এতো চরমে উঠেছিল যে তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলো। সমস্ত মে মাস ধরে রাজধানী দিল্লীর পথঘাট নির্বিচার নিষ্ঠুর হত্যার রক্তে প্লাবিত হয়েছিল এবং রাজধানীর ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে সব শহর ও গ্রাম শ্মশানে পরিণত হলো। অনেক প্রামাণিক ইতিহাসকারের মতে নাদির শাহ-এর দুর্দ্দান্ত কিজিলবাস্ (Qizilbash) সেনাদের হাত থেকে নিজেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ভারতীয় নিজেদের স্ত্রী কন্যাদের প্রথমে হত্যা করে, তারপরে নিজেরা আত্মহত্যা করে অথবা স্বেচ্ছায় শত্রুর তরবারির সামনে মাথা পেতে দেয়। বহু নারী অসম্মানের চেয়ে মরণকে শ্রেয়ঃ ভেবে বাড়ীর কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।[৫] ১৫ কোটি টাকা নগদ, ৫০ কোটি টাকা মূল্যের অলঙ্কার, জহরৎ ও বহুমূল্য সামগ্রী, বিখ্যাত কোহিনূর হীরা ও ময়ূর সিংহাসন এবং, ঐমন কি, হিন্দু সংগীত সম্বন্ধে সম্রাট মহম্মদ শাহ-রচিত বহুবর্ণে চিত্রিত বিখ্যাত ফারসি গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে নাদির শাহ যখন ভারত ত্যাগ করলেন, তখন এই আক্রমণের চরম আঘাতে, নিষ্ঠুর হত্যা ও অপহরণের নিদারুণ অসম্মানে মোগল বাদশাহের গৌরবের দিন চিরতরে শেষ হলো।

নাদির শাহ-এর আক্রমণ ভারতে বহিঃশত্রুর অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে দিলো। ৯ই জুন, ১৭৪৭ সালে বিশ্বাসঘাতকের হাতে নাদির শাহ-এর হত্যার পর তাঁর একজন আফগান ওমরাহ আহমদ শাহ অবদালী (যিনি ১৭৩৭ সাল থেকে নাদির শাহ-এর সঙ্গে ছিলেন) পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে[৬], এই কুড়ি বছরে আবদালী কয়েকবার ভারতে অভিযান চালান। নাদির শাহ-এর মতো তাঁর অভিযান কেবল হত্যা ও লুঠ-তরাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই অভিযানগুলির পিছনে ভারতে ও ভারতের বাইরে আফগান প্রভুত্ব স্থাপন করার উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিপুল সংখ্যায় আফগানদের

৫ Irvine, op. cit., vol—II, p. 369.

৬ কিছু ইংরেজী দলিলে বলা হয়েছে যে আবদালী ১৭৬৯ সালে আরও একবার পাঞ্জাবে অভিযান চালান। দ্রষ্টব্য, *Indian Historical Quarterly*, December, 1934.

ভারতে আগমন এবং তাদের এই দেশে আগত পূর্ব্ববর্ত্তী আফগান বসবাসকারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় আফগান প্রভুত্ব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আফগান ভাগ্যান্বেষীগণ অগণিত সংখ্যায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং কোথাও কোথাও, যেমন রোহিলখণ্ডে, নিজেদের রাজ্য-স্থাপন করে। আবদালীর আক্রমণের পূর্ব্বেও আফগানদের প্রভাব উত্তর ভারতে এতো প্রবল ছিল যে প্রতিবৎসর ভারতে আফগান বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও সাম্রাজ্য স্থাপনের আশঙ্কা করা হতো। রোহিলা-অধিপতি আলি মুহম্মদ ১৭৪৮ সালে খোলাখুলিভাবে মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর সার্ব্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন। ঠিক তার পরেই আবদালী ভারতে প্রথম অভিযান চালনা করেন এবং বিহারে আফগানরা নবাব আলিবর্দ্দী খান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তিন মাস (১৩ই জানুআরী থেকে ১৬ই এপ্রিল) পাটনা অধিকার করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে উত্তর ভারতের রোহিলা-আফগানরা ও অযোধ্যার আফগান নবাব, আবদালীকে ভারত-অভিযানে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে আফগান প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রচেষ্টা মোগল সাম্রাজ্যের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির আরও অবনতি সাধন করেছিল, মারাঠাদের উত্তর ভারতে অগ্রগতি পাণিপথের প্রান্তরে ১৭৬১ সালের জানুআরী মাসের যুদ্ধ দ্বারা রোধ করেছিল, এবং বাংলায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বহু বছরের জন্য দুর্ভাবনায় রেখেছিল। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পরাজয়ে ইংরেজ কোম্পানী উল্লসিত হয়েছিল। কিন্তু, যদি আবদালী তাঁর নিজের দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য হঠাৎ ফিরে যেতে বাধ্য না হতেন, তা হলে ভারতে ইংরেজ অধিকার বিস্তারের ইতিহাস হয়তো বিপরীত হতো। আবদালী ভারতে আরও কিছুকাল থাকলে বিহার ও বাংলার আফগান শক্তি সমবেত ও সংগঠিত হতো এবং ইংরেজদের সঙ্গে পূর্ব্বভারতে ক্ষমতা লাভের জন্য নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শেরশাহ-এর আকস্মিক অভ্যুত্থান ও ১৭৪৮ সালে বিহারে আফগান বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব-হওয়া ইতিহাসের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ও আরও নিশ্চিতভাবে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের পর যখন ইংরেজ ক্ষমতা অযোধ্যার আফগান নবাবের রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়—তখন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারতস্থিত ইংরেজ রাজপুরুষগণ আফগান অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকতেন। সমসাময়িক ইংরেজী খবরের কাগজে ও সরকারী নথিপত্রে এই আফগান-ভীতির বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য আরও অনেক কারণের সঙ্গে আফগান-ভীতির জন্য সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন এবং যখন ইংরেজরা চন্দননগর থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করে তখন তিনি নিরপেক্ষ থাকেন। আবদালীর প্রত্যাবর্ত্তন তাঁর কাছে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ

বলে মনে হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে ১৭ই মে তারিখে সিরাজউদ্দৌলা ক্লাইভকে একটি চিঠিতে লেখেন,"……by the favour and goodness of God, Abdali is returning by continual marches to his own country."[৭]

১৭৭৩ সালের জুন মাসে আহমদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর পর ভারতে আফগান অভ্যুত্থানের আশঙ্কা যদিও অনেক কমে গিয়েছিল, তবুও ভারতস্থিত ইংরেজরা সর্ব্বদা আতঙ্কে থাকতো।[৮] আবদালীর পৌত্র জামন শাহ-এর সময়ে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হেনরী ডাণ্ডাস্ লর্ড ওয়েলেসলীকে আফগানদের উপর সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন।[৯] ওয়েলেসলী সেজন্য পারস্যের দরবারে প্রথমে মেহদী আলি খান ও পরে ক্যাপ্টেন ম্যালকমকে দূত হিসাবে পাঠান। ১৮০১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কোম্পানীর লণ্ডনস্থিত সিলেক্ট কমিটিকে তিনি জানান: "The active measures adopted by the court of Persia against Zemaun [Zamun Shah] which were subsequently encouraged by Captain Malcolm, produced the salutary effect of diverting the attention of Zemaun Shah from his long projected invasion of Hindusthan during three successive seasons . ..,...The assistance afforded by Mehdi Ali Khan under my orders, to the Prince Muhammad Shah, originally enabled that Prince to excite these commotions which have recently terminated in the defeat of Zemaun Shah, in his deposition from the throne and in the active extinction of his power; to the consolidated and active Government of Zemaun Shah has succeeded a state of confusion in the country of the Afghans highly favourable to our security in that quarter."

এই সঙ্গে ভারতের সেই যুগের ঘটনাবলীকে পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। পর্য্যুদস্ত মোগল শক্তির উপর বিগত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ও ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করতে মারাঠা নেতৃবর্গ বদ্ধপরিকর হয়েছিল। শীঘ্র তারা দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাংলা, দিল্লী ও পাঞ্জাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করলো। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরে হিন্দু একাধিপত্যের ভিত্তি স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা করেন পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ, যখন ১৭১৯ সালে দিল্লীতে মারাঠা অভিযানের পর মোগল শক্তির দুর্ব্বলতার পূর্ণ বিবরণ তিনি জানতে পারেন। পেশোয়া প্রথম বাজীরাও সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে অগ্রসর হন এবং ১৭৭২ সালে মারাঠাধিপতি শাহু'র কাছে দিল্লী আক্রমণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন,

৭ Proceedings of the Select Committee, 21st February and 26th December, 1757.

৮ দ্রষ্টব্য, Kaye, *History of the War in Afghanistan*, vol. I

৯ Owen, *Wellesley Despatches*, p. 638.

"Let us strike at the trunk of the withering tree (the Mughal Empire); the branches will fall of themselves. Thus should the Maratha flag fly from the Krishna to the Indus."। ১৭৩১ সালের মধ্যে বাজীরাও গৃহশত্রুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট করেন, এবং সেনাপতি শম্ভুজী (কোলহাপুর) ও দাভাদে মালব্য, গুজরাট ও ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করেন। ১৭৩৭ সালে তাঁর শক্তিশালী অশ্বারোহী-বাহিনীর অগ্রগতি দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং পরের বছর দুরাণী-সরাই'এর সন্ধি অনুযায়ী তিনি মারাঠাদের পরম শত্রু নিজামের কাছ থেকে নর্ম্মদা ও চম্বলের মধ্যকার বিস্তৃত অঞ্চলের অধিকার আদায় করেন। ১৭৫৮ সালে পেশোয়া রঘুনাথ রাও-এর সময়ে মারাঠাশক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং দুর্ভেদ্য আটক-এর দুর্গে মারাঠা পতাকা উত্তোলিত হয়। কিন্তু মারাঠাশক্তির এই বিস্তার তাদের আফগানদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে বাধ্য করলো। ১৭৬১ সালের ১৬ই জানুয়ারী, পাণিপথের প্রান্তরে অন্যান্য বারের মতো ভারতের ভাগ্য পুনরায় নির্দ্ধারিত হলো। মারাঠা কর্ত্তৃক ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ধূলিসাৎ করে দিয়ে আহমদ শাহ আবদালী বিজয়ী হলেন। লোকক্ষয়কারী এই যুদ্ধের পরিণাম-স্বরূপ অর্থ-সম্পদ মান-মর্য্যাদা হারিয়ে মারাঠা প্রভাব ভারতে ম্লান হলো এবং কয়েকমাস পরেই ২৩শে জুন তারিখে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

কিন্তু, দশ বছরের মধ্যেই প্রতিভাশালী পেশোয়া প্রথম মাধো রাও-এর আমলে মারাঠারা পাণিপথে পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং ১৭৭২ সালে নির্বাসিত মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে তাঁর পিতৃপুরুষের মসনদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো। আরও কয়েক বছরের মধ্যে মাধোজী সিন্ধিয়া একনায়করূপে রাজনীতিতে দেখা দিলেন এবং ১৭৮৯ সালে দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত তাঁর করতলগত হতে বাধ্য হলেন। স্যার জন ম্যালকম-এর ভাষায়—Sindhia remained "as the nominal slave but the rigid master of the unfortunate Shah Alam, Emperor of Delhi."[১০] ভারতের রাজনীতিতে এই সময়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, সম্রাট করতলগত হলে সাম্রাজ্যের উপর অধিকার বিস্তার করার পথ প্রশস্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ও মারাঠা শক্তিদ্বয় মোগল সম্রাটকে কুক্ষিগত ক'রে এবং তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারে নিযুক্ত ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ ১৮০৩-০৪ সালে ইংরেজদের হাতে মারাঠাদের ক্রমাগত পরাজয়ে এবং ১৮১৮ সালে স্যার জন ম্যালকম-এর কাছে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর আত্মসমর্পণে।

মারাঠা শক্তির পরাজয়ের প্রধান কারণ তার নেতৃবর্গের মধ্যে মতানৈক্য। স্বার্থপরতা

১০ Malcolm, *Memoir of Central India*, vol. I, p. 122.

ও ঈর্ষ্যার কারণে তারা কখনও একতাবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের সম্মুখীন হয়নি। সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো না থাকায় মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলগুলি সহজে ইংরেজদের হস্তগত হলো। তা ছাড়া ইউরোপীয় গোলন্দাজদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মারাঠা সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সৈন্য পরিচালনা করতে পারতেন না এবং মারাঠা সৈনিকরা এই পরমুখাপেক্ষিতার কারণে হীনমন্য হয়েছিল। ফলে ইংরেজদের সাহস ও সম্মিলিত সেনাবাহিনী এবং সুশিক্ষিত গোলন্দাজ-বাহিনীর কাছে মারাঠা শক্তি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

বাণিজ্যে নিযুক্ত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও একটি প্রধান ঘটনা। ওলন্দাজ কোম্পানী ১৭৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর বেদারা'র যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করে ভারতের রাজনীতি থেকে বিদায় নিল। কিন্তু, ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ও ফরাসীদের বিবাদ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী স্থায়ী হয়েছিল। ২২শে জানুয়ারী ১৭৬০ সালে বন্দীবাস-এর যুদ্ধে লালী'র ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পরেও ফরাসীরা ভারতে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা ত্যাগ করেনি।[১১] তারা ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা নেতৃবর্গ, হায়দার আলি ও টিপু'র সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। ১৭৭৭ সালে সেন্ট লুবিন ইংরেজদের শক্তি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নানা ফড়নবিশের সঙ্গে এক সন্ধি করেন।[১২] এই একই কারণে তারা মহীশূরের রাজার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে।[১৩] আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলির বিদ্রোহে ভারতে ইংরেজ শক্তিকে চরম আঘাত করার প্রত্যাশিত সুযোগ ফরাসীরা পেয়েছিল। ফরাসী সরকার ইংরেজ উপনিবেশগুলির বিদ্রোহকে সমর্থন জানায় এবং বুসী'র নেতৃত্বে ৩,০০০ সৈন্য ও এ্যাডমিরাল সুফ্রেন-এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী হায়দার আলিকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য হিসাবে পাঠায়। কিন্তু ফরাসীদের সব চেষ্টা বিফল হলো। ইংরেজরা পুনরায় পণ্ডিচেরী দখল করে নিলো। ফরাসীরা ১৭৮৩ সালের ভার্সাই সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী পণ্ডিচেরী ফিরে পেলো, কিন্তু তারপরেও তারা নিজাম ও টিপুকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্ব্বদা প্ররোচিত করতো। কর্নওয়ালিস পুনার রেসিডেন্ট সি. ডব্লিউ. ম্যালেটকে সাবধান করে দিয়ে ১০ই মার্চ, ১৭৯৩ সালের একটি চিঠিতে লেখেন : "I look upon a rupture with Tipoo as a certain and immediate consequence of a war with France"।

---

১১ *Bengal : Past & Present*, July-Sept., 1931, p. 25.

১২ ibid,

১৩ ibid, also ; Letter from Earl of Cornwallis to the Secret Committee, dated Fort William, 12th April, 1790 (Forrest, *Selection from the State Papers of the Governor-General of India*, vol. II, Lord Cornwallis, p. 14)

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্ত্তী কালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংরেজরা ভারতে ফরাসী উপনিবেশগুলি অধিকার করতে অগ্রসর হলো। বহু ফরাসী ফ্যাক্টরী ও বাণিজ্য জাহাজ আটক করা হলো।[১৪] চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী ফরাসীদের হাতছাড়া হলো। ভারতে ইংরেজ বিজয়ের খবর জানিয়ে কর্ণওয়ালিস্ কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্‌কে ১৭৯৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন, "I have great satisfaction in congratulating your Honourable Court on the reduction of the fortress of Pondichery and of all other French Settlements and Factories on the continent of India"। পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর-এর সময়ে ফরাসীরা অবশ্য ভারতে তাদের প্রভাব পুনরায় বাড়াতে সক্ষম হয়; কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলী যখন লোহিত সাগর অঞ্চলে অভিযান পাঠিয়ে ফরাসীদের স্থলপথে ভারতে আসার পথ বন্ধ করে দিলেন এবং ফরাসীদের মিত্র ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ইংরেজের অনুগত হতে বাধ্য করলেন, তখন ভারতে ফরাসীদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য নির্মূল হলো।

ইউরোপীয় জাতিগুলির ভারতে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ইউরোপে ও আমেরিকায় তাদের শত্রুতাকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছিল। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮), সপ্তবর্ষ যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩), আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও রণদামামা বেজে উঠেছিল। এই প্রথম সমুদ্রপারে বহির্দেশীয় রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত হলো। চ্যাথাম, পিট, ওয়েলিংটন ও নেলসনের মতো ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলী ও লর্ড ময়রা সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টার যৌথ ফল হিসাবে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বুনিয়াদ তৈরী হলো।

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পিছনে ইংলণ্ডীয় শিল্পবিপ্লবের চাহিদা মিটানোর দারী খুব বেশী কাজ করেছিল। তাই, নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চালানোর জন্য এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ইংরেজদের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের অর্থনীতি কৃষি ও হস্তশিল্পের সহযোগিতায় ভারসাম্য বজায় রেখে দেশের সকল অভাব মোচন করতো এবং তার উপরে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষিজাত, শিল্পজাত ও খনিজ দ্রব্য রপ্তানী করে দেশকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলাদেশের বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে কর্ণেল আলেকজাণ্ডার ডো লিখে গেছেন, "It was a sink where gold and silver came without the best protest of return."। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অগণিত রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজ-

১৪ Letter from the Governor-General in Council to the Court of Directors, dated Fort William, August 1, 1793. (Ross, *Cornwallis Correspondence* Vol. II, pp. 224-26)

নৈতিক মাৎস্যন্যায়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সেই সঙ্গে বিদেশী ইংরেজ বণিকদের অর্থগৃধ্নুতা ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে ফেলেছিল এবং তার ফলে যে অর্থনৈতিক পরমুখাপেক্ষিতা ভারতকে মেনে নিতে হয়েছিল তার কবল থেকে আজও সে নিস্তার পায়নি। রাজনৈতিক কারণে ভারতের বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে এদেশ থেকে যে পরিমাণ স্বর্ণ-সম্পদ বিদেশে চালান হয়েছিল তাতে ভারত চিরকালের জন্য গরীব হয়ে গেলো। ১৭৬৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করার জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সিলেক্ট কমিটি গঠন করে, তার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "We beheld a presidency divided, headstrong and licentious, a government without nerves, a treasury without money and service without subordination, discipline or public spirit·····amidst a general stagnation of useful industry and of licensed commerce, individuals were accumulating immense riches, which they had ravished from the insulted prince and his helpless people, who groaned under the united pressure of discontent, poverty and oppression"। এই রিপোর্ট ১৭৬৭ সালে পেশ করা হয়। জনসাধারণের দুর্দ্দশা ও আর্ত্তনাদ কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার রিচার্ড বেচার'-কেও বিচলিত করেছিল। ১৭৬৯ সালের ২৪শে মে তারিখের চিঠিতে তিনি লণ্ডনস্থিত কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্‌কে লেখেন, "It must give pain to an Englishman to have reason to think that since the accession of the Company to the Diwani the condition of the people of this country, has been worse than it was before; and yet I am afraid the fact is undoubted; .. this fine country, which flourished under the most despotic and arbitrary Government, is verging towards ruin". বস্তুতঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর শাসন সংস্কারও দেশকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্‌কে ২রা আগষ্ট ১৭৮৯ সালে লেখা কর্ণওয়ালিস-এর একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি "agriculture and internal commerce have for many years been gradually declining, that at present, excepting the class of shroffs and benias .. the inhabitants of these provinces [of Bengal, Bihar and Orissa] were advancing hastily to a general state of proverty and wretchedness."। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় শিল্পবিপ্লবের ও ইউরোপীয় পুঁজিবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ১৮১৩ ও ১৮৩৩-এর চার্টার এ্যাক্টের মাধ্যমে সেই পুঁজিবাদ এদেশে কায়েমী স্বার্থ স্থাপন করেছিল। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় পারদর্শী হেনরী টাকার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর হওয়ার পর ১৮২৩ সালে মন্তব্য করেন, "What is the commercial policy which we have adopted in this country with relation to India? The silk manufactures and its piecegoods made of silk and cotton intermixed, have long since been excluded altogether from

our markets and of late particularly in consequence of the operation of a duty of 67 per cent. but chiefly from the effects of superior machinery, the cotton fabrics which hitherto constituted the staple of India have not only been displaced in this country but we actually exported our cotton manufactures to supply a part of the consumption of our Asiatic possessions. India is thus reduced from the state of a manufacturing to that of an agricultural country"। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক অবনতির কারণ হিসাবে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষের এই স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ কবি ক্যুপারের একটি কবিতার নিম্নোল্লিখিত অংশটি সেইজন্য স্বতঃই মনে উদয় হয় :

Hast thou, though suckled at fair freedom's breast
Exported slavery to the conquered East,
Pulled down the tyrants India served with dread,
And raised thyself, a greater in their stead ?
Gone thither, armed and hungry, returned full,
Fed from the richest veins of the Moghul,
A despot big with power ordained by wealth,
And that obtained by rapine and by stealth ?
With Asiatic vices stored thy mind,
But left their virtues and thine own behind ;
And having trucked thy soul, brought home the fee
To tempt the poor to sell himself to thee ?

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের কালিমালিপ্ত ভয়াবহ অধ্যায়ে এই সব হলো বিশিষ্ট ঘটনা ও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু মানবজীবনের ইতিহাসের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনেও খুঁজে দেখলে এমন সব উপদেশ ও শিক্ষামূলক উদাহরণ পাওয়া যায় যেগুলি আমাদের চিন্তায় ও কর্ম্মে উৎসাহিত করতে এবং আমাদের জাতীয় জীবনকে সংযত ও সুসংবদ্ধ করতে প্রেরণা দেয়। এই ঐতিহাসিক সত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দেশ ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনার রূপায়ণে প্রত্যেককে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে নির্দ্দেশ দেয়। আচার্য্য যদুনাথ সরকার সেজন্য তাঁর একটি জ্ঞানগর্ভ বাণীতে স্পষ্ট করে বলেছেন, "And yet our immediate historic past, while it resembles a tragedy in its course, is no less potent than a true tragedy to purge the soul by exciting pity and horror. Nor is it wanting in the deepest instruction for the present. The headlong decay of the age-old Muslim rule in India and the utter failure of the last Hindu attempt at empire-building by the new-sprung Marathas, are intimately linked together and must be studied with accuracy of detail as to facts and penetrating analysis as to the causes if we wish to find out the true solutions of the problems of modern India and avoid the pitfalls of the past."[১৫]

[১৫] Fall of the Mughal Empire, vol. I, Preface.

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের তমসাবৃত জাতীয় জীবনের মাঝে কোথাও কোথাও আশার আলো দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই যুগে কালরাত্রি শেষ হয়ে নতুন ভারতের ঊষাকাল আরম্ভ হলো। এই যুগেই রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নানা পথে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। তার ফলে মধ্যযুগীয় সকল ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আধুনিকতা, মানবিকতা, জাতীয়তা ও যুক্তিবাদী দর্শনের ভারতের মাটিতে পদার্পণ ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল। তারাই প্রভাবে পরবর্ত্তীযুগে ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহী হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবনের সকল দিকে বিপর্য্যয় এরূপ চরমে না উঠলে ভারতীয় জীবনের সকল ব্যবস্থা ও প্রথার মধ্যে যে কি পরিমাণ দুর্নীতির বিষ ও দুর্ব্বলতা জমা হয়েছিল তার নগ্নরূপ ও সঠিক পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয় পুনর্জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তারও সূচনা হতো না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় নব্য ইউরোপীর সংস্কৃতি ও শিক্ষা ভারতকে নবজীবন দান করলো। বেকন লক্, ভলটেয়ার, বার্ক, বেন্থাম, মিল ও নিউটনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনীতি-দর্শন, এবং উইলবারফোর্স ও তাঁর বন্ধুদের মানবতাবাদ ভারতে আমদানী হলো এবং একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন যুগের আগমন ঘোষণা করলো। সংঘাত, সংমিশ্রণ ও নির্য্যাতনের আগুনে পুড়ে ভারতের অন্তর্নিহিত গুণাবলী আসল ও খাঁটি রূপ লাভ করে পুনরায় প্রকাশ পেলো এবং ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি আধুনিক রূপ ধারণ করলো। সুবিধাজনক ঐতিহাসিক তারিখ হিসাবে ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই নবজাগরণের উন্মেষের সূচনা। উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক প্রমুখ মনীষীদের জ্ঞান, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির কারণে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনী পৃথিবীর কাছে প্রথম প্রকাশ পেলো। কিন্তু এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ১৭৭২ সালে ভারতের নবজাগরণের জনক ও প্রথম উদ্‌গাতা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব, এবং সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতেই তিনি শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ লাভ করেন।

লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ

শ্রীমদনমোহন কুমার

প্রাচীন পারসীক 'দিপি' শব্দ ভারতীয় আর্য্যভাষায় পরিগৃহীত শব্দ বা loan-word রূপে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে শব্দটি ভারতীয় আর্য্য ভাষায় প্রচলিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ খরোষ্ঠী[১] লিপিতে উৎকীর্ণ সম্রাট্ অশোকের শাহ্‌বাজগঢী ও মান্‌সেহ্‌রা গিরি-অনুশাসনে 'দিপি' শব্দটির একাধিকবার প্রয়োগে। 'দিপি' শব্দের ভারতীয় আর্য্য প্রতিরূপ 'লিপি' শব্দটি ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ অশোকের গির্নার, কালসী, ধৌলি, জৌগড় গিরি-অনুশাসনে, ধৌলি-জৌগড়ে অশোকের দুইটি স্বতন্ত্র কলিঙ্গ-অনুশাসনে, অশোকের দিল্লী-তোপরা স্তম্ভলিপিতে—অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমা, প্রাচ্যমধ্যা ও প্রাচ্যা প্রাকৃতে —এবং পালিভাষায় 'লিপি', 'লিপী', 'লিবি', 'লিবী' রূপে পাওয়া যায়—'ধংম-লিপি', 'ধংম-লিপী', 'ধংম-লিবি' অশোকের অনুশাসনে উৎকীর্ণ, পালি ভাষায় 'লিবি', 'লিবী', স্ত্রীলিঙ্গে দুই রূপই দেখা যায়। পূর্বতন মহীশূর রাজ্যের (বর্তমান কর্ণাটকের) চিতলদুর্গ জেলার ব্রহ্মগিরিতে, ব্রহ্মগিরি হইতে দুই ক্রোশ দূরে জটিঙ্গ-রামেশ্বরে, এবং ব্রহ্মগিরি ও জটিঙ্গ-রামেশ্বর উভয় স্থান হইতেই দুই ক্রোশ দূরে সিদ্ধপুরে — সন্নিকটবর্তী তিনটি স্থানে — প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ অশোকের ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসনের শেষে সংযোজিত "চপডেন লিখিতে লিপিকরেণ" (চপড নামক লিপিকর কর্তৃক লিখিত) অংশটির সর্বশেষে "লিপিকরেণ" শব্দটি খরোষ্ঠী হরফে উৎকীর্ণ। লিপিকর সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে খোদাই কার্য্যের জন্য মহীশূর অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত √লিখ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'লিখতি' শব্দের 'দাগ কাটে, আঁচড় কাটে' (scratches) অর্থে প্রযোগ অথর্ববেদে এবং 'লেখে' (writes) অর্থে প্রয়োগ যাজ্ঞবল্ক্যে। বিদ্ধশালভঞ্জিকায় 'লিখিতৃ-' অর্থে চিত্রকর।

১ প্রাচীন সিরীয় বা আরামীয় লিপি হইতে উদ্ভূত, পারস্য সাম্রাজ্যে সুপ্রচলিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের হখামনীষীয় Achaemenian বংশের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুরুষ্ বা সাইরস্ Cyrus (৫৫৮—৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), দরিউস্ বা দারয়বহু Darius (৫২২—৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), খ্‌শয়র্শা বা ক্ষয়ার্ষা Xerxes (৫১৯—৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কর্তৃক ভারত আক্রমণ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, গন্ধার হইতে আরব সমুদ্র পর্য্যন্ত, পারস্য অধিকার বিস্তৃত হইলে পারস্য হইতে আগত এই লিপি ঐ অঞ্চলে প্রসৃত হয় এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত থাকে (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত খরোষ্ঠী ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে); ভারতীয় বণিক্, ধর্ম-প্রচারক ও ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে খরোষ্ঠী লিপি মধ্য-এসিয়ায় (চীনীয় তুর্কীস্তানে) নীত; বর্তমানে লুপ্ত। হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত সেমীয় শব্দ Kharoŝeth (অর্থ 'লিখন', 'writing') হইতে 'খরোষ্ঠী' শব্দের উৎপত্তি। মতান্তরে, সংস্কৃত খর+ওষ্ঠ (গর্দভের ওষ্ঠের ন্যায় বক্রাকৃতি) হইতে 'খরোষ্ঠী' নাম।

সংস্কৃত √লিপ্ ধাতুর অর্থ 'বিস্তার করা, লেপন করা' (to smear) ; √লিপ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'লিম্পতি' শব্দের অর্থ 'বিস্তার করে, লেপন করে' (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে); ভাববাচ্যে 'লিপ্যতে' (ঈশোপনিষদে) ; এবং 'লিম্পি'- অর্থ 'লেখা' (পঞ্চবাত্রে) ।

সং লিপ্যতে lipyate >পালি লিপ্পতি lippati, প্রাকৃত লিপ্পই lippai, মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষায় বহুল ব্যবহৃত ।

ঋগ্বেদে 'রিপ্ত-' ripta-, অথর্ববেদে 'লিপ্ত-' lipta- অর্থ 'লেপিত, বিস্তারিত' ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য 'লিখতি' (√লিখ্), 'লিম্পতি' (√লিপ্) শব্দের সহিত প্রাচীন পারসীক হইতে পরিগৃহীত 'দিপি' (√দিপ্) শব্দের সংমিশ্রণে (contamination এ) ভারতীয় আর্য্য ভাষায় "লিপি" শব্দটির উৎপত্তি । মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায়—পালি ও আশোক প্রাকৃতে—ঘোষীভবনের (vocalization) ফলে ধ্বনি-পরিবর্তনে 'লিবি' 'লিবী' শব্দের প্রয়োগ ।

অশোকের কালসী, গির্নার, ধৌলি, জৌগড় প্রভৃতি গিরি-অনুশাসনে ও দিল্লী-তোপ্রা স্তম্ভলিপিতে "ধংমলিপি", "ধংমলিপী", "ধংমলিবি" ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ হইয়াছে । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে শাহ্বাজগঢী ও মান্সেহ্রা-য় অশোকের গিরি-অনুশাসনে 'ধ্রমদিপি' খরোষ্ঠী হরফে উৎকীর্ণ ।

ইরানের হখামনীষবংশীয় (Achaemenian) সম্রাটগণের (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ হইতে ৪র্থ শতক) শিলালিপিতে 'দিপি' শব্দ 'লিখন' অর্থে ব্যবহৃত । ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ অশোক-লিপিতে 'লিখিত', 'লেখিত', 'লেখাপিত' শব্দগুলি খরোষ্ঠী প্রতিলিপিতে 'নিপিস্ত', 'নিপেসিত', 'নিপেস্পিত' রূপে ব্যবহৃত । প্রাচীন পারসীক 'নিপিস্' শব্দের অর্থ 'লিখা' (to write) । হখামনীষীয় শিলালিপিতেও 'নিপিস্' একই অর্থে ব্যবহৃত । 'লিপি' শব্দের উৎপত্তিতে প্রাচীন পারসীক 'দিপি'[১] ও 'নিপিস্' শব্দের সাদৃশ্য ও প্রভাব রহিয়াছে । √লিপ্>লিম্পতি, লিম্পি- শব্দের সহিত প্রাচীন পারসীক 'দিপি'-শব্দের সংমিশ্রণে 'লিপি' ।

সংস্কৃত √লিপ্ ধাতুর অর্থ 'লেপন করা, বিস্তার করা' । প্রাচীন ভারতবর্ষে ভূর্জত্বকে ও তালপত্রে ধাতুনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র লেখনীদ্বারা আঁচড় কাটিয়া তাহার উপর বঞ্জক-পদার্থ বা কালি মাখাইয়া দেওয়া হইত । এই বঞ্জক-পদার্থ বা বর্ণ (বঙ্) লেপন করা বা বিস্তার করা হইতে 'লিপি' ও 'বর্ণ' শব্দের উৎপত্তি । √বৃ>বর্ণ ; যাহা আবরণ করে সেই বাহিরের রূপ বা আকৃতি 'বর্ণ' । ধ্বনির আবরণ- বা আচ্ছাদন-রূপ 'বর্ণ', ধ্বনির লিখিত রূপ 'বর্ণ' । 'বর্ণ্যতে বর্ণ্যতে ইতি বিলেপনম্', ভূর্জত্বকে বা তালপত্রে অঙ্কিত

[১] তু॰ দবির খাস=Private Secretary. [দিপিবর >দবির ; পারসীক দবীর dabīr (writer)+আরবী খাস khāss (personal Secretary)] ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষায় 'দবির খাস' সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত শব্দ ।

রেখার উপর উপর রঞ্জকদ্রব্য বা কালির বিলেপনের বাহিরের রূপ বা আকৃতি 'বর্ণ'। সংস্কৃত 'বর্ণ' শব্দের সহিত তুলনীয় শ্লাব্ Vranu, ('black', 'a crow') ; লিথুআনীয় Varnas, ('a crow').

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সার্থক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি 'শব্দ'। বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত অর্থবোধক শব্দসমষ্টি 'ভাষা'। মুখের ভাষায় প্রকাশিত শব্দকে স্থায়ী রূপ দিবার চেষ্টায় লিপির উৎপত্তি বা আবিষ্কার। ভাষার তুলনায় লিপি অনেক অর্বাচীন। লিপির ইতিহাস মাত্র ছয় হাজার বছরের।

মুখের কথা বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হারাইয়া যায়, অনুপস্থিত ব্যক্তি বা অনাগত কালের নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে মানুষ নানা চেষ্টা করিয়াছে। নানা স্মারক-পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ ভাবকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে ; দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুর প্রাচীন অধিবাসীরা নানা রঙের সরু-মোটা দড়ির গুছি বিভিন্ন ধরণে ও কৌশলে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে, বিভিন্ন দূরত্বে, গিঁঠ বাঁধিয়া নানা ঘটনার কাল, পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা-মূল্য-লেনদেনের হিসাব, নিজ নিজ বিভিন্ন শ্রেণীর পশু, শস্য ও সম্পদের হিসাব রাখিত। দক্ষিণ-আমেরিকার ইন্‌কা (Inca) সাম্রাজ্যে এই গ্রন্থি-পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকীয় আদেশ ও রাজকীয় হিসাব রাখা হইত, এজন্য গ্রন্থি-পাঠ-কুশলী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইত। পেরুর পুনা (Puna) পশু-পালকদের, ক্যালিফোর্নিয়ার পলোনি (Paloni) রেড ইণ্ডিয়ানদের, মেক্সিকোর জুনি (Zuni) উপজাতিদের, জাপানের রিউকিউ (Riukiu) দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। ইউরোপে রুমালে গিঁট বাঁধিয়া এবং এদেশে পুরুষেরা কোঁচার খুঁটে ও মেয়েরা আঁচলে গিঁট বাঁধিয়া এই স্মারক-পদ্ধতির সাহায্যে আগামী দিনের কৃত্যলিপির (diarya) কাজ চালাইতেছে। পেরুর ভাষায় কুইপু (Quipu) শব্দটির অর্থ 'গ্রন্থি', শব্দটি গ্রন্থি-লিখন-পদ্ধতি অর্থে বহু ইউরোপীয় ভাষায় গৃহীত। উত্তর-আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা মৃগচর্মের কোমরবন্ধে (wampum belt-এ) নানা বর্ণের ঝিনুক, গুটি, পুঁতি গাঁথিয়া একই পদ্ধতিতে অতীত ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহের সন-তারিখ, সন্ধির সর্ত, জমির সীমানা চিহ্নিত করে। দশ হাজার বছর পূর্বেও মানুষ গিরিগুহায় চিত্র অঙ্কন করিয়া শিকার, যুদ্ধ, প্রেম, গৃহজীবন ও দাবানলের ছবিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। 'কুইপু' গ্রন্থিবন্ধন, 'ওয়াম্‌পাম্' কোমরবন্ধ, প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র—লিপি-আবিষ্কারের দিকে মানুষের পদক্ষেপ, লিপির প্রাক্‌রূপ, কিন্তু শব্দ বা ধ্বনির লিখিত প্রতীক—'লিপি'—নয়, ধ্বনির আবরণ-রূপ নয়।

লিপি আবিষ্কারের চারটি স্তর। প্রথম স্তরে মানুষ শব্দদ্যোতিত বস্তুর রেখাচিত্র অঙ্কন শুরু করে। এই 'চিত্রলিপি' (Pictogram)—শব্দের প্রতীক হওয়ায়—লিপির প্রথম সোপান। ক্রমে ভাব, বস্তু, ঘটনা বুঝাইতে রেখাচিত্র অঙ্কন না করিয়া গোষ্ঠীমধ্যে

সুপ্রচলিত প্রতীকচিহ্ন আঁকিয়া শব্দের দ্যোতনা শুরু হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের প্রচেষ্টা 'ভাবলিপি' (Ideogram)—প্রতীকচিহ্ন দ্বারা শব্দের ভাব বা অর্থদ্যোতনা ইহার বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় স্তরে শব্দের প্রতীকরূপে সুনির্দিষ্ট চিহ্নমাত্র অঙ্কনের দ্বারা 'শব্দলিপি' (Phonogram)—এই স্তরে রেখালিপির সাহায্যে শব্দ প্রকাশিত। চতুর্থ স্তরে শব্দের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র ক্রমে শব্দের আদ্যধ্বনির প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। হিব্রু 'আলেফ্' (aleph) অর্থ 'বৃষ', বৃষমুণ্ডের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র ফিনিশীয় বর্ণমালার মাধ্যমে আদ্যধ্বনির প্রতীকচিহ্নের রূপান্তরে গ্রীক alpha (আল্‌ফা) বর্ণ। এই আদ্যধ্বনি-নির্দেশের ফলে 'অক্ষরলিপি'-র (Syllabic Script) এবং পরবর্তীকালে আধুনিক 'বর্ণলিপি'-র (Alphabetic Script) উদ্ভব।

চিত্রলিপির নিদর্শন উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লিপিতে। চিত্রলিপি হইতে ভাবলিপিতে বিকাশের নিদর্শন মেক্সিকোর আজটেক (Aztec) লিপিতে এবং ইউকাটন (Yucatan) ও গুয়াতেমালার (Guatemala) 'মায়া' (Maya) লিপিতে। শব্দলিপির নিদর্শন প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদের হিয়েরোগ্লিফিক [hieroglyphic, hiero=sacred, glypho=to carve] লিপিতে এবং প্রাচীন চীনীয় লিপিতে। চিত্রলিপি, ভাবলিপি, শব্দলিপি তিনটিই চীনদেশের লিপিতে ক্রমবিকশিত। চীন, জাপান, কোরিয়া তিন প্রতিবেশী দেশে তিনটি পৃথক লিপি-পদ্ধতি—চীনে 'ভাবলিপি', জাপানে 'অক্ষরলিপি' (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক সভ্যতার সহিত সংস্পর্শে চীনীয় লিপি-পদ্ধতির রূপান্তরে), এবং কোরিয়ায় 'বর্ণলিপি' (সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে গৃহীত)।

খ্রীষ্ট-পূর্ব তিন সহস্রাব্দের পূর্বে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে সুমেরীয় জাতির লিপি এখনও পর্য্যন্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন। এই লিপি বাণমুখ (cuneiform)[১], কীলকাকৃতি (wedge-shaped)। সুমেরীয়দের নিকট হইতে ব্যাবিলোনীয়েরা এই বাণমুখ লিপি গ্রহণ করে। সুমেরীয় প্রভাবে আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মিশরীয় লিপির উদ্ভব। মিশরীয় লিপির প্রভাব প্রাচীন ঈজিয়ানদের মধ্যে পড়ে এবং অনুমান ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ক্রীটদ্বীপে মিনোআন লিপির (Minoan Script) উদ্ভব হয়। ইহার কিছুকাল পরে আনাতোলিয়ায় হিত্তী (Hittite) সাম্রাজ্যে হিত্তী হিয়েরোগ্লিফিক লিপির উদ্ভব, পরে হিত্তী বাণমুখ লিপির বিকাশ। চীনদেশে চীনীয়, পশ্চিম-ইরানে শুশা অঞ্চলে প্রত্ন-এলামীয় (Proto-Elamite), সিন্ধু-অঞ্চলে প্রত্ন-ভারতীয় (Proto-Indian) লিপির উদ্ভব ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটে।

পৃথিবীর ৭টি প্রাচীন লিপি—সুমেরীয়, মিশরীয়, ক্রীটদ্বীপীয়, হিত্তী, চীনীয়, প্রত্ন-

১ Latin *cuneus*, a wedge+*forma*, a shape=*cuneiform*. ব্যাবিলনের চতুষ্পার্শে প্রচুর মৃত্তিকা ও পলিমাটি সহজলভ্য ছিল, মৃৎফলকে সূচীমুখ শলাকা (stylus) দ্বারা লিখনের সময় হরফগুলি সূচীমুখ ও ক্রমশঃ স্থূলাকারভাবে কীলকাকৃতি হইত, সেইজন্য এই নাম।

এলামীয়, প্রত্ন-ভারতীয়। এগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির পাঠোদ্ধার হইয়াছে, প্রত্ন-এলামীয় ও প্রত্ন-ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পায় প্রাপ্ত-প্রত্ন-ভারতীয় লিপিই অখণ্ড ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন।

চারিটি সুপ্রাচীন লিপি-পদ্ধতি হইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে ব্যবহৃত লিপি-গুলির বিবর্তন ঘটিয়াছে—(১) মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয়-ব্যাবিলোনীয় বাণমুখ লিপি (cuneiform writing); (২) মিশরীয় পুরোহিতদের প্রাচীন লিপিচিত্র (hieroglyphic writing) ও তাহা হইতে উদ্ভূত শিষ্ট জনের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্র (demotic writing; *demotic* = of the people, Greek *demotikos* = of the people); (৩) প্রত্ন-ভারতীয় লিপি; (৪) চীনীয় লিপি।

মিশরের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্রে ২৪টি—মতান্তরে ২৫টি—প্রতীক-চিহ্নের সাহায্যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি চিত্রিত। ফিনিশীয় বণিকগণ এই ২৪।২৫টি ধ্বনিচিত্ররূপ গ্রহণ করেন ও সেগুলির রূপান্তর সাধন করেন। ফিনিশীয় বণিকদের নিকট হইতে গ্রীকেরা এই বর্ণমালা গ্রহণ করেন, তাহা হইতে গ্রীক ও রোমক বর্ণমালার উদ্ভব। হিব্রু-আরবী-আরামীয় প্রভৃতি শেমীয় (Semitic) বর্ণমালাও মিশরীয় সংক্ষিপ্ত লিপি হইতে উদ্ভূত। শেমীয় বর্ণমালা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়।

চীনীয় লিপিচিত্র হইতে চীন ও জাপানের লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন হয়।

মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পায় আবিষ্কৃত বহু শত মুদ্রা বা সীলমোহরে উৎকীর্ণ, প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন, প্রত্ন-ভারতীয় লিপির এখনও পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধার না হওয়ায় পরবর্তী ভারতীয় লিপির সহিত তাহার যোগসূত্র নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই প্রত্ন-ভারতীয় লিপির পর খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের উৎকীর্ণ গিরি-অনুশাসনে প্রাচীন ভারতীয় লিপির দুইটি পদ্ধতি পাইতেছি—উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত-অঞ্চলে খরোষ্ঠী আর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপি। খরোষ্ঠী শেমীয়গোষ্ঠীর আরামীয় লিপি (Aramaic Script) হইতে উদ্ভূত বাণমুখ লিপি, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে খরোষ্ঠী ভারতবর্ষ হইতে চীনীয় তুর্কীস্তান পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর ভারতবর্ষে খারোষ্ঠী লিপির সন্ধান পাওয়া যায় না, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে খরোষ্ঠী লিপি ভারতবর্ষে লুপ্ত, ব্রাহ্মী-ই সর্ব-ভারতীয় লিপি রূপে প্রতিষ্ঠিত। অশোকের উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী হরফের পরিণত গঠন দেখিয়া মনে হয়, ব্রাহ্মী লিপি মৌর্য্যযুগের কয়েক শতাব্দী পূর্বে উদ্ভূত। ব্রাহ্মী ভারতবর্ষের বাহিরের কোনও লিপি হইতে উদ্ভূত অথবা সিন্ধু সভ্যতার প্রত্ন-ভারতীয় লিপিচিত্র হইতে বিবর্তিত, সে-সম্বন্ধে মতভেদ ও বিতর্ক আছে।

ব্যূলরের (Buhler)-এর মতে ব্রাহ্মী শেমীয় লিপি। যুক্তিসহ প্রমাণের অভাবে এই মত গ্রাহ্য হয় নাই। প্রাক্-আর্য্য-যুগের প্রত্ন-ভারতীয় লিপির—মোহেন-জো-দড়ো-

হড়প্পায় প্রাপ্ত শত শত মুদ্রালিপির—বিকাশ ব্রাহ্মী লিপি, ইহাই আধুনিক মত। ব্রাহ্মী লিপি রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক ভারতীয় লিপিমালায় এবং ভোট (তিব্বতী), বর্মী, যবদ্বীপী, সিয়ামী, কোরিয় প্রভৃতি লিপিতে পরিণত। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষের বাহিরে নীত, গৃহীত ও রূপান্তরিত হইয়া স্থানভেদে নানা রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ব্রহ্মদেশের মোন্ এবং তাহা হইতে উদ্‌ভূত ব্রন্‌মা বা বর্মী লিপি, কম্বোজের কম্বোজী ও তজ্জাত দৈ বা থাই বা সিয়ামী লিপি, মালয়ের মালয়ী লিপি, ইন্দোনেশিয়া (বা দ্বীপময় ভারতের) বলি, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সেলেবেসের লিপি, ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জের লিপি; প্রাচীন চম্পার লিপি, ভোট বা তিব্বতী লিপি, মধ্য-এশিয়ার খোটানের লিপি, কুচা নগরীর কুচী বা তুষার (তুখারীয়) লিপি, কোরিয়ার লিপি ইত্যাদি ব্রাহ্মী লিপির রূপান্তর। ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক ও সমুদ্রগামী ভারতীয় বণিক্‌দের প্রভাবে ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির এই প্রচার ও প্রসার ঘটে।

উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে স্বতন্ত্র ধারায় ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তন ঘটিয়াছে। উত্তর-ভারতে খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণ-রাজত্বকালে ও চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্ত-যুগে ব্রাহ্মী লিপির পরিবর্তন ঘটে। ছেনী-বাটালির মুখে পাথরের উপর সযত্নে খোদাই করা অশোকের ব্রাহ্মীলিপির হরফগুলি সরল, অনাড়ম্বর, ভাস্কর্য্যগুণোপেত, জটিলতামুক্ত। পরবর্তীকালে ভূর্জত্বকে ও তালপত্রে দ্রুত-লিখন ও লিপিচাতুর্য্য-প্রকাশক লিপিকরগণের বিবিধ ছাঁদ ও বৈচিত্র্যের ফলে অক্ষরগুলি ক্রমশঃ জটিল ও কুণ্ডলাকৃতি হইতে থাকে, ভাস্কর্য্যসুলভ অনাড়ম্বর সারল্য হারাইতে থাকে। প্রাদেশিক রূপভেদে তাহাদের রূপও পাল্টাইতে থাকে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মী উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতে অঞ্চলভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে—(১) 'শারদা' (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাবে), (২) 'নাগর' (দক্ষিণ-পশ্চিমে—গুজরাট-রাজপুতানা-মালবে—ও মধ্যদেশে), (৩) 'কুটিল' (পূর্ব-ভারতে)। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উত্তর-ভারতে ক্রমে নাগরীর বিপুল প্রসার ঘটে। 'নাগর' হইতে পরবর্তীকালে দেবনাগরী, গুজরাতী, কায়থী লিপির উৎপত্তি; 'শারদা' হইতে কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবের গুরুমুখী; এবং 'কুটিল' হইতে বাঙ্গালা, মৈথিল, অসমীয়া, উড়িয়া ও নেপালী লিপির উৎপত্তি। প্রায় সহস্রাব্দ পূর্বে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি নিজস্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মী লিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হইয়া প্রাচীন বট্টেলুত্ত[১] ও পল্লব লিপির মধ্য দিয়া আধুনিক তমিল্, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ ও গ্রন্থ প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হইয়াছে।

১ Vaṭṭa < Vṛtta,'round'+ezhuṭṭu (ইকুত্ত্), 'Writing'=Vaṭṭezhuṭṭu. বর্তমানে এই লিপি অপ্রচলিত।

প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া অন্যতম নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা— দিল্লী-মীরাট্ অঞ্চলের হিন্দুস্থানীর অন্যতর সাহিত্যিক রূপ—উর্দূতে, আরবী-লিপি ও আরবী-ফারসী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রত্নভারতীয়, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীর পর এই লিপি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

আরবের অধিবাসীরা সিরীয়দের নিকট হইতে লিপিবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল। ৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে উত্তর-সিরীয়ায় প্রাচীন সিরীয় (Syrian) বা আরামীয় (Aramaic) লিপির ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে বা তাহার কিছু পূর্বে সিরীয় লিপি হইতে প্রাচীন আরবী লিপির উদ্ভব। কালক্রমে প্রাচীন আরবী লিপির বিবর্তন ঘটে। আরবের নবতীঅন্ (Nabataean বা Nabathaean) নামক শক্তিশালী জাতি প্রাচীন আরবী লিপির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া নব্য আরবী লিপির সৃষ্টি করে—৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে ৭৫ খ্রীষ্ট অব্দের মধ্যে ইহার বিকাশ ঘটে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, মোহম্মদীয় যুগের প্রথম দিকে, দুই রীতির আরবী লিপির প্রচলন ছিল—কুফী (Cufic) ও নশ্‌খী (Nashki)। বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া সাধারণ কাজকর্মে বা লেখাপড়ার কাজে 'কুফী' লিপির ব্যবহার ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। অলঙ্করণের জন্য বা বিশেষ কারুকার্য্য-মণ্ডিত লিখনের (Calligraphy) জন্য এখনও ক্বচিৎ আরবী, ফারসী বা উর্দূ ভাষা লিখিতে কুফী ব্যবহৃত হয়। নস্‌খী বা নস্‌খ্ হইতে আধুনিক আরবী বা তজ্জাত লিপিগুলির উদ্ভব। আরবী লিপি ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক হইতে অসম্পূর্ণ হওয়ায় নানা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন বা diacritical marks দ্বারা বর্ণের ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা নস্‌খ্ লিপির বর্ণমালায় প্রয়োজন হয়। উত্তর সিরীয়ার খ্রীষ্টানেরা এসট্রান্‌জলো (Estrangelo) নামে বিশেষ এক ধাঁচের আরবী লিপি টানা-হাতে-লেখায় ব্যবহার করিতেন—নেস্তোরিঅন্ Nestorian ধর্মযাজকেরা[১] ঐ লিপি মধ্য-এসিয়ায় লইয়া যান এবং ঐ লিপির বিবর্তনে মধ্য-এসিয়া হইতে মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত বহু লিপির উদ্ভব ঘটে।

পুরাতন আরবী লিপির অপূর্ণতা পূরণ করার জন্য এবং ঐ লিপিতে হ্রস্বস্বরধ্বনি প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট বর্ণমালা না থাকায় নানা অসুবিধা দূর করার জন্য কতকগুলি চিহ্ন ও বিন্দু ('নোক্তা') সংযুক্ত করিয়া ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সুগম করা হয়। হ্রস্ব স্বর না থাকায় কেবলমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনির সমবায়ে যে ব্যবহারিক অসুবিধা ঘটিতে পারে তাহা দূর করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়—'Kl' 'কল্' দ্রুত পাঠকালে ভাষার পূর্বাপর সঙ্গতি অনুধাবন করিয়া 'কল্' Kal, 'কিল্' Kil বা 'কুল্' Kul কি উচ্চারণ হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য হ্রস্ব স্বরধ্বনি-

১ কনস্তান্তিনোপলের ধর্মযাজক-কুলপতি (Patriarch) নেস্তোরিঅস (৪২৮-৩১খ্রী:) Nestorius-এর অনুগামী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়।

গুলির জন্য, হসন্ত বা বিরামচিহ্নের জন্য, দ্বিত্বব্যঞ্জনের জন্য, বিবিধ ধ্বনি নির্দেশের জন্য নানা চিহ্নের উদ্ভাবন করিয়া আরবী লিপির ক্রমবিকাশ ঘটে।

আরবগণ পারস্যবিজয় করিলে কুফী ও নস্‌খী লিপি পারস্যে প্রসৃত হয়। বর্তমানে নস্‌খী লিপিতেই আরবী লেখা ও ছাপার কাজ চলে, ফারসী ও উর্দুতে লিখিতে এখনও কেহ কেহ নস্‌খী লিপি ব্যবহার করেন। নস্‌খী লিপির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া নস্ত'লিক্ লিপির সৃষ্টি, বর্তমানে আরবী লিপি হইতে বিবর্তিত নস্ত'লিক্ ধাঁচের লিপিতেই ফারসী ও উর্দু সাধারণতঃ লিখিত ও মুদ্রিত হয়।

মূল আরবী ভাষায় ২৮টি ধ্বনি, ফারসী ভাষা লেখার জন্য যখন আরবী লিপি গৃহীত হইল তখন ফারসীর কয়েকটি ধ্বনি আরবীতে না থাকায় আরবী লিপির বর্ণমালায় ফারসী ভাষার জন্য ৪টি নূতন বর্ণ বা হরফ সৃষ্টি করিতে হইল।

ভারতীয় ভাষা উর্দু—(অর্থাৎ, আরবী-লিপিতে আরবী-ফারসী বর্ণমালায় লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষা, মৌখিক ভাষা খড়ী-বোলীর ব্যাকরণ ও দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের ব্যবহৃত পরিচিত শব্দগুলির সহিত দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলা-সাহিত্য-বিষয়ক উচ্চ কোটির ফারসী বা আরবী শব্দ- সহযোগে সৃষ্ট নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা)—লেখার জন্য হিন্দীর কতকগুলি ধ্বনি (যেগুলি আরবী- ও ফারসীতে লেখার জন্য ছিল না সেগুলি) প্রকাশ করার প্রয়োজনে আরও কয়েকটি নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিতে হয়। আরবী বর্ণমালার ২৮টি বর্ণের সহিত ফারসী ভাষায় নূতন করিয়া সংযোজিত ৪টি বর্ণ ছাড়াও হিন্দীর আরও ৩টি বর্ণ যোগ করিয়া মোট ৩৫টি বর্ণ লইয়া উর্দু বর্ণমালা সৃষ্টি হয়।

উর্দুতে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির জন্য পৃথক হরফ নাই; অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির পরে 'হ' যোগ করিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনি বুঝান হয়—খ = কহ Kh, ঘ = গহ gh ইত্যাদি। সিন্ধী ভাষা আরবী-ফারসী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির জন্য হরফ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য উর্দু অপেক্ষা সিন্ধীর হরফের সংখ্যা বেশী।

উর্দু নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষা হইলেও ভারতীয় আর্য্যভাষার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সজ্জিত বর্ণমালা গ্রহণ করে নাই; আরবী-লিপির বর্ণমালা গ্রহণ করায় ধ্বনি প্রকাশে কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধা ও অপূর্ণতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানী ভাষার সমস্ত ধ্বনি প্রকাশে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে নাই।

আরবী লিপির 'নোক্তা' বা বিন্দু, লিপির অপূর্ণতা দূরীকরণে কিছুটা সহায়ক হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির বিশিষ্ট প্রতীকরূপে একটি, দুইটি বা তিনটি বিন্দু ব্যবহৃত হয়। একটি সরল চিহ্নের মাথায় অথবা নীচে এক বা একাধিক বিন্দু নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিকে বুঝায়। যেমন, একটি সরল চিহ্নের মাথায় একটি বিন্দু দিলে 'ন', তলায় বা নীচে একটি বিন্দু দিলে 'ব'; মাথায় দুইটি বিন্দু দিলে 'ত', তলায় দুটি বিন্দু দিলে 'য', 'এ' বা 'ঈ'; মাথায় তিনটি বিন্দু দিলে 'য' বা 'স', তলায় তিনটি বিন্দু দিলে 'প' হয়।

'এ, ঐ, ঈ' সন্ধ্যক্ষর (dipthong) ও দীর্ঘস্বর (long vowel) এবং ব্যঞ্জনধ্বনি 'য', 'ব' (v, w), এবং 'ও, ঔ, উ' ধ্বনিগুলির পার্থক্য আরবী লিপিমালায় প্রদর্শিত হয় না। আরবী লিপির আর একটি অসুবিধা, ইহা ডানদিক হইতে বামদিকে লেখা হইলেও ইহাতে সংখ্যাবোধক চিহ্নগুলি বামদিক হইতে ডাহিনে লেখা হয়। সংখ্যাচিহ্নগুলি ভারতবর্ষ হইতে আরবে নীত হওয়ায় সম্ভবতঃ ইহা ঘটিয়াছে।

এইরূপ কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য প্রগতিশীল তুর্কী ইসলামধর্মাবলম্বী হইয়াও আরবী লিপি ও বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া রোমান লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে।

আরবী ও ফারসী লিপির সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্যময় লিখন-প্রণালী (১) দৃঢ় সরল ভাস্কর্য্যগুণোপেত সরলরেখায় লিখিত কুফী লিপিতে, (২) ছন্দিত নস্‌খী লিপিতে, এবং (৩) হিল্লোলিত নস্ত'লিক লিপিতে প্রকাশিত। কিন্তু ভাষাজ্ঞান বেশ পাকা না হইলে এই লিপি বিশুদ্ধভাবে দ্রুত পাঠ করা কঠিন। দ্রুত লিখনের জন্য পাকা হাতের আরবী লিপি যাহা 'শিকস্তা' নামে পরিচিত তাহার বিশুদ্ধ দ্রুতপঠন সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সম্ভবতঃ এই সকল কারণে আরবী লিপি এবং আরবী-ফারসী বর্ণমালা ভারতে প্রচলিত হইলেও উর্দূ, কাশ্মীরী ও সিন্ধী ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়-ভাষাভাষী মুসলমানগণ অনেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখার জন্য এই লিপি সাধারণতঃ ব্যবহার করেন না।

হিন্দোস্তানী বা হিন্দুস্তানী দিল্লী-মীরাট অঞ্চলের পশ্চিমা-হিন্দী কথ্যভাষা, সন্নিহিত পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী ভাষার দ্বারা ইহা বহুল-প্রভাবিত। রাজধানী ও তাহার সন্নিকটবর্তী স্থানের ভাষা হওয়ায় মুসলমান রাজত্বকালে তুর্কী, ফারসী ও পশ্‌তো ভাষাভাষী অভিজাতবর্গ ইহা গ্রহণ করেন। এই সহজবোধ্য রাজার-চলতি ভাষা, সেনানিবাসের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তুর্কী ওর্দু Ordu, (অর্থ সেনানিবাস, ছাউনী; বাদশাহী লস্কর)> উর্দূ। মোগল বাদশাহদের সময় তাঁহাদের ফৌজ লস্করেরা যে ভাষায় সেনানিবাসে ও বাজারে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কথোপকথন করিত সেই মিশ্রিত ভাষা (patois) উর্দূ। মুসলমান শাসক ও অভিজাতদের সহায়তায় দিল্লী-মীরাট, আম্বালা-রামপুর, পাঞ্জাব-রাজস্থান—ক্রমে উত্তর-ভারতের সর্বত্র এই হিন্দোস্তানী ভাষা ছড়াইয়া পড়ে—নাগরী ও আরবী লিপিতে লিখিত হইতে থাকে। মুসলমান শাসনের পূর্বে শৌরসেনী অবহট্টের ন্যায় ইহা ক্রমে উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধ্য সাধারণ ভাষা *'lingua franca*-য় পরিণত হয়। এই মৌখিক ভাষা ক্রমে চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে ও সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী উত্তর-ভারতের মুসলমানগণ ইহা সাহিত্য-রচনায় ব্যবহার করিতেন। দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডার অধিপতি মুহম্মদ কুলি কুতব্ শাহ (মৃত্যু ১৬১১ খ্রী) উর্দূ ভাষায় দাক্ষিণাত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। চতুর্দ্দশ শতকে দিল্লীতে আমির খুস্‌রৌ (১২৫৩-১৩২৫ খ্রী) পশ্চিমা-হিন্দী কথ্যভাষার আধারে সৃষ্ট

সাহিত্যিক ভাষা উর্দূতে[১] কবিতা রচনা করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ দাবি করেন[২]। চতুর্দশ শতকে সৈয়িদ মুহম্মদ বন্দ-নওযাজ্ গেসূ-দরাজ্ (মৃত্যু ১৪৪২ খ্রী) "মিরাজু-ল-'আসিকীন্" নামক সুফী গ্রন্থে উর্দূ ব্যবহার করিয়াছেন। T. Grahama Bailey "Urdu: the name and the Language" (Journal of the Royal Asiatic Society, London, April 1930) প্রবন্ধে উর্দূ ভাষা একাদশ শতকে, গজনীর মামুদ কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকারের (১০২৭ খ্রী) পূর্ব, লাহোরের পুরাতন পাঞ্জাবী হইতে উদ্ভূত এবং পরবর্তীকালে দিল্লী অঞ্চলের 'খড়ী-বোলী' অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুস্তানী ভাষার দ্বারা সংস্কৃত ও পরিমার্জিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ—উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলমান লেখকদের আরবী লিপিতে লেখা আরবী-ফারসী শব্দ-মিশ্রিত হিন্দুস্তানী (উর্দূ)-র পাশাপাশি হিন্দু লেখকগণের দেবনাগরী লিপিতে লেখা সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত শব্দ-সহযোগে হিন্দুস্তানী ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে হিন্দুস্তানী বা উর্দূ ভারতবর্ষে ১৫ হইতে ১৬ কোটি লোক ব্যবহার করে, যদিও ইহা ৬ কোটি ভারতবাসীর মাতৃভাষা।[৩]

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা বা 'National Language' রূপে দেবনাগরী লিপি অথবা আরবী লিপিতে লিখিত হিন্দুস্তানীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একদিকে সংস্কৃত অপরদিকে আরবী-ফারসী ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ ও শব্দনির্মাণ, এবং দেবনাগরী ও আরবী উভয় লিপির এই ভাষায় ব্যবহার—হিন্দু-মুস্লিম্ ঐক্য ও সম্প্রীতির সহায়ক হইবে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মনে হয়ত এইরূপ যুক্তি কার্য্যকর ছিল, প্রধান কারণ অবশ্য সমগ্র উত্তর ভারতে এই ভাষার সহজবোধ্যতা ও বহুল ব্যবহার। উত্তরভারতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও বুদ্ধিজীবিগণ অনেকে হিন্দুস্তানী ভাষায় লিখিতে উভয় লিপিই ব্যবহার করিতেন। কাশ্মীর-পাঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশের বহু অভিজাত হিন্দু পরিবারেও উর্দূ মাতৃভাষারূপে কথিত হইত। জওহরলাল নেহরুর মাতৃভাষা ছিল উর্দূ। গান্ধীজি উত্তর-ভারতে এই সর্বজনবোধ্য সহজ হিন্দুস্তানীকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দিতে চাহিয়াছিলেন; ১৯১৮ সালে ইন্দোরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁহার ভাষণ হইতে আমৃত্যু তিনি এই মতই প্রচার করিয়াছেন। মৃত্যুর সাড়ে তিন মাস পূর্বেও ১২ই অক্টোবর ১৯৪৭ 'হরিজনসেবক'-এ প্রকাশিত গান্ধীজির উক্তি স্মরণীয়:

১ আমির খুস্রৌ ইহাকে 'হিন্দী', 'হিন্দবী', 'জবানে দেহল্বী' (দিল্লীর ভাষা) বলিয়াছেন। ভারতের দক্ষিণে ইহাকে 'দক্কিনী', গুজরাতে 'গুজর্বী' (গুজরাতী উর্দূ) বলা হইয়াছে। পরে ইহার নাম হয় 'জবানে উর্দূ'।

২ বালমুকুন্দ গুপ্ত, "হিন্দীভাষা", কলিকাতা, সংবৎ ১৯৬৪, পৃ. ৯।

৩ Suniti Kumar Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. III (George Allen & Unwin, London, 1971), p. 3. See also 'Report of the Language Commission' (Publication Dept., Govt. of of India, New Delhi, 1956) with Notes of Dissent by Suniti Kumar Chatterji and P. Subbaroyan.

"This Hindustani should be neither Sanskritised Hindi nor Persianised Urdu but a happy combination of both. It should also freely admit words wherever necessary from the different regional languages as also assimilate words from foreign languages, provided they can mix well and easily with our national language. Thus our national language must develop into a rich and powerful instrument capable of expressing the whole gamut of human thoughts and feelings. To confine oneself exclusively to Hindi or Urdu would be a crime against intelligence and the spirit of patriotism".

উভয় লিপির বন্ধনে বাঁধা হিন্দুস্তানীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়া গান্ধীজি ও নেহরু সাম্প্রদায়িক ঐক্যের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দুস্তানী নয়, হিন্দী এবং কেবলমাত্র নাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী-ই রাষ্ট্রভাষা হইবে, হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন এইরূপ উগ্র মত প্রচার করায়, গান্ধীজি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে পদত্যাগ করেন এবং ১৫ই জুলাই ১৯৪৫ পুরুষোত্তম দাস টণ্ডনকে একখানি পত্রে লেখেন :

'my definition of Rashtra Bhasha (national language) includes a knowledge of both Hindi and Urdu and both the Nagri and Urdu scripts. Only thus can a happy fusion of Hindi and Urdu take place.'

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাসনতন্ত্রে (Constitutionএ) হিন্দুস্তানী ভাষা কংগ্রেসের সরকারী ভাষারূপে প্রথম স্বীকৃতি পায়। হিন্দুস্তানীর দুই লিপিকেই স্বীকার করিয়া কংগ্রেস রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার ও লিপি-সমস্যার সমাধান-কল্পে স্থির করেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতেছে 'হিন্দুস্তানী' (হিন্দুর সংস্কৃত-বহুল সাধু-হিন্দীও নয়, মুসলমানের ফারসী-বহুল উর্দূও নয়), এবং এই রাষ্ট্রভাষা দেবনাগরী ও আরবী দুই লিপির যে কোনও একটিতে ইচ্ছামতো লেখা চলিবে।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্তানী তিন লিপিতে—দেবনাগরী, আরবী ও আঞ্চলিক লিপিতে (regional scriptএ)—লেখা চলিবে মত দিয়াছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে Constituent Assemblyতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ('national language') লইয়া বহু বিতর্ক ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। "Constituent Assembly Debates"-এ ও "Reports of Committees of the Constituent Assembly of India"-য় প্রকাশিত বিবরণগুলিতে এবং Indian National Archives-এ রক্ষিত ভাষা-বিষয়ক দুইটি গোপন বিতর্কের বিবরণে তাহার পূর্ণ ইতিহাস আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেখানে বহু বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাইবেন।[১]

১ এ বিষয়ে অতি-সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্র° H. M. Seervai, *Constitutional Law of India, A Critical Commentary*, (Bombay, 1967), ch. XIII 'Official Language', p 971 ff.

বিদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Granville Austinএর *The Indian Constitution : Cornerstone of*

Constituent Assembly-র Fundamental Rights Sub-Committee ২৪শে ও ২৫শে মার্চ ১৯৪৭ দুইটি অধিবেশনের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

"Hindustani, written at the option of the citizen in the Devnagari or the Persian script, shall, as the national language, be the first official language of the Union. English shall be the second official language for such period as the Union may by law determine."

মিনু মাসানী (বোম্বাইয়ের পার্শী, কংগ্রেস-সদস্য) ও শ্রীমতী হংস মেহ্‌তা (বোম্বাইয়ের হিন্দু ব্রাহ্মণ, কংগ্রেস-সদস্য) এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতান্তর-লিপিতে (note of dissentএ) লেখেন, তৃতীয় একটি লিপি—রোমান লিপিতেও—রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্তানী লেখা চলিবে, কারণ দক্ষিণ-ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক নাগরী বা উর্দু (আরবী) লিপির সহিত অপরিচিত।

১৪ই জুলাই ১৯৪৭—দেশ-বিভাগের ঠিক এক মাস পূর্বে—কন্‌স্টিট্যুয়েণ্ট এসেম্বলিতে গোঁড়া হিন্দীওয়ালারা ইংরেজী, হিন্দুস্তানী ও অন্যান্য সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষার দাবীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন এবং 'হিন্দুস্তানী'র পরিবর্তে 'হিন্দী' রাষ্ট্রভাষা হইবে এই দাবী উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই জুলাই ১৯৪৭ কংগ্রেস এসেম্বলি পার্টির বৈঠকে ৬৩ : ৩২ ভোটে গৃহীত হয় যে 'হিন্দুস্তানী' নয়, 'হিন্দী'-ই ভারতের রাষ্ট্রভাষা ('national language') হইবে, ৬৩ : ১৮ ভোটে গৃহীত হয় যে 'নাগরী' লিপিই ভারতের "জাতীয় লিপি" ('national script') হইবে ; এবং ইংরেজী 'দ্বিতীয় ভাষা' ('second language') রূপে চলিতে পারিবে। এই প্রস্তাবগুলির সহিত কন্‌স্টিট্যুয়েণ্ট এসেম্বলিতে আরও একটি প্রস্তাব সংবিধান-রচনার সময় হিন্দীর সমর্থকগণ উত্থাপন করেন—দেবনাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্নগুলিই সংবিধানে স্বীকৃত হইবে এবং সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হইবে। ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় এ-বিষয়ে বহু বিতর্ক ও তিক্ততার পর ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মুন্সী-আয়ঙ্গার[১]-উদ্ভাবিত সূত্রে ভাষা-ও-লিপি-সমস্যার সমাধানকল্পে এক আপোষ হয়। তদনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদ গৃহীত হয় : দেবনাগরী লিপিতে লেখা হিন্দী ভারতের 'সরকারী ভাষা' (Official language) হইবে, ভারতীয় সংখ্যাচিহ্নের আন্তর্জাতিক রূপ[২] সরকারী কাজে

A Nation, (Oxford University Press, 1966 ; Indian edition 1972) গ্রন্থের 'Language and the Constitution—The Half-hearted Compromise' নামক অধ্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে।

১ গুজরাতীভাষী কে. এম. মুন্‌সী ও তামিলভাষী দেওয়ান বাহাদুর (স্যর্) এন. গোপালস্বামী আয়ঙ্গার।

২ ২৬শে অগস্ট ১৯৪৯ কনস্টিট্যুয়েণ্ট এসেম্বলিতে নাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্ন বনাম আন্তর্জাতিক সংখ্যাচিহ্ন বিতর্কে, ডিভিসনে ভোট গণনায় ৭৪ : ৭৪ ফল হয়। হিন্দী-সমর্থকদের একজন ভোটদাতা নাগরীর পক্ষে ভোট দিয়া জরুরি প্রয়োজনে ডিভিসন দাবীর পূর্বে চলিয়া যাওয়ায় ৭৫ : ৭৪ দাবী করা হয়। পট্টভি সীতারামিয়া ও জহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন যে স্বল্প ভোটের ব্যবধানে সারা দেশের উপর নাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্ন চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না এবং হিন্দী-

ব্যবহৃত হইবে, এবং সংবিধান প্রবর্তনের পব হইতে ইংবেজী ভাষা অন্ততঃ ১৫ বৎসব সবকারী কাজে চলিবে[১]; এবং বাষ্ট্রপতি আদেশ প্রবর্তন করিলে অন্তর্বর্তীকালে ইংবেজী ভাষা ও ভাবতীয় সংখ্যাব আন্তর্জাতিক চিহ্নগুলি ছাড়া হিন্দী ভাষা ও দেবনাগবী লিপিতে লিখিত সংখ্যাগুলিও সবকাবী কাজে ব্যবহৃত হইবে।

Article 343. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagri form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagri form of numerals,

for such purposes as may be specified in the law.

বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভাবতে একটিমাত্র 'জাতীয় ভাষা' (national language) বা 'জাতীয লিপি' (national script) স্বীকৃত হয নাই। ভাবতেব প্রধান ১৪টি ভাষা (নিজ নিজ বিশিষ্ট লিপিতে) সংবিধানে স্বীকৃতি পাইযাছে।

ওয়ালারা তাহাতে সম্মত হন। "the international form of Indian numerals" আরবীতে গৃহীত সংখ্যাচিহ্নের আন্তর্জাতিক রূপ—"an euphemism for Arabic numerals" (Seerbhai, p. 973).

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে ব্রাহ্মী লিপিতে খোদিত ১, ৪, ৬ সংখ্যা অশোক-অনুশাসনে; খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে নানাঘাট প্রত্নলিপিতে ২, ৪, ৬, ৭, ৯; খ্রীষ্টীয ১ম শতকে নাসিকের গুহালিপিতে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯ সংখ্যাচিহ্ন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে মেসোপোটেমিয়ায় Severos Sebokht (আ° ৬৫০ খ্রীঃ) ভারতীয় হিন্দুদের ব্যবহৃত সংখ্যাগুলির উল্লেখ কবিযাছেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ বাগদাদে আববী ভাষায় অনূদিত, আরবীর মাধ্যমে ভারতীয় সংখ্যাগুলি ইওরোপে গৃহীত হয়। ৯৭৬ খ্রী স্পেনে একখানি পাণ্ডুলিপিতে আরবী সংখ্যাচিহ্নগুলি ব্যবহৃত।

১ The Official Languages Act, 1963 ২৬শে জানুআবি ১৯৬৫ সালের পবেও ইংবেজী ভাষার ব্যবহার সবকারী কার্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং ভারত-বাষ্ট্রের 'Official Language', দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী, ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করে নাই।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষা নাগরী লিপিতে বাঙ্গালার দুই প্রত্যন্ত অঞ্চলে—পশ্চিমপ্রান্তে মানভূম-পুরুলিয়ায় এবং পূর্ব্বপ্রান্তে শ্রীহট্টে—দুইটি বিভিন্ন রীতিতে সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা লিখিত হইত। ১২২৪ সালে (১৮১৭ খ্রীঃ) নাগরী অক্ষরে লিখিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একখানি পুথি পুণ্যশ্লোক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মানভূম জেলার লাডা-পার্‌ডা গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। ৯টি পালায় বিভক্ত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের এই অভিনব পুথিখানি আগাগোড়া দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত দেবনাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত—পঞ্চকোট চাকলার নাখদা পরগণার ডিমডিহা গ্রামের (বর্তমান পুরুলিয়া শহর হইতে তিন মাইল উত্তরে) শ্রীপণ্ডিত পটুনাএক কর্ত্তৃক লিখিত, নাখদা পরগণার কদড়া গ্রামের ছিরু মাঝি পুথিখানির অধিকারী, তাঁহার জন্য ১২২৪ সালের ১৪ই শ্রাবণ পুথিখানি লিপিকৃত।[১]

নাগরী অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা ভাষার কয়েকখানি পুথি বৃন্দাবন হইতে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (১৮৬৬-১৯৩৮) মহাশয়ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টে প্রচলিত 'সিলেট নাগরী' লিপি শ্রীহট্ট শহরে ও তাহার আশেপাশে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাঁহারা বাঙ্গালা লিপি বা আরবী লিপি ব্যবহার না করিয়া দেবনাগরী লিপির রূপান্তর সাধন করিয়া এবং বাঙ্গালা বর্ণমালার সংযুক্ত বর্ণগুলির বহুল-সংক্ষেপ করিয়া, কয়েকটি স্বরবর্ণ বর্জন করিয়া, নূতন একটি সংযুক্ত বর্ণ (আলেফ্-লাম আল্, 'আল্লা' শব্দ লিখিতেই কেবল এই সংযুক্ত বর্ণটির প্রয়োজন হয়) সৃষ্টি করিয়া এই অভিনব নাগরী লিপিতে বাঙ্গালা ভাষা লিখিতেন। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে আরব দেশ হইতে প্রবল শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক শাহ জালাল ভারতবর্ষে আসেন, তিনি মুসলমান সৈন্যদের লইয়া শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দকে আক্রমণ করেন, ১৩৮৪ খ্রী বর্তমান শ্রীহট্ট মুসলমান অধিকারে যায়। শাহ জালালের সহিত আগত মুসলমান সৈন্য, আউলিয়া ও অন্যান্য ব্যক্তি শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট হন। ইঁহাদের অনেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান অধিবাসী ছিলেন। শাহ জালাল শ্রীহট্টকে 'পবিত্র ভূমি' বলিয়া ঘোষণা করায় ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মুসলমানও উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারত হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া বসতি করেন। উত্তর-পশ্চিমে প্রচলিত হিন্দুস্তানী ভাষা এবং নাগরী লিপি ও নাগরী বর্ণমালা ইঁহারা ব্যবহার করিতেন। পরে আরবী লিপিতে লিখিত উর্দু ভাষা শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রসারিত হইলে শ্রীহট্টের এই সকল মুসলমান আরবী লিপিতে উর্দু ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু নাগরী অক্ষরও ত্যাগ করিলেন না। কালক্রমে এই সম্প্রদায়ের বহু

১ দ্র° শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৯ম সংস্করণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮০), শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত, ভূমিকা ৩।৵০—৩।৶০

স্বল্পশিক্ষিত বা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান যাঁহারা আরবী-ফারসী-উর্দু জানিতেন না, তাঁহারা স্থানীয় বাঙ্গালা ভাষা এই নাগরী অক্ষরে লিখিতে লাগিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত এই নাগরী লিপি ও বর্ণমালার হস্তলিখিত কোনও নমুনা আমাদের হাতে না আসিলেও খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে—সিপাহীবিদ্রোহের কিছু পরে—মুন্সী আব্দুল করিম[১] নামে শ্রীহট্টবাসী এক সুশিক্ষিত মুসলমান আরব, মিসর ও ইউরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ ফিরিয়া শ্রীহট্টে প্রচলিত নাগরী অক্ষরের স্থানীয় প্রচলিত রূপ সংস্কার করিয়া "সিলেট নাগরী" বর্ণমালা নামে অভিহিত করেন এবং এই বর্ণমালায় গ্রন্থ-মুদ্রণ প্রবর্তন করেন। এই হরফে গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় শ্রীহট্ট সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এই লিপি ও বর্ণমালা সমগ্র শ্রীহট্ট জেলায় এবং ক্রমে নিকটবর্তী ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং কাছাড় জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং এই বর্ণমালায় বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে। প্রথমে পাথরে খোদাই করিয়া লিথো প্রেসে এই লিপির দুই একখানি কেতাব মুদ্রণের পর কলিকাতার চিৎপুর রোডে বেণীমাধব ভট্টাচার্য্যের 'জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস'-এ এই লিপির টাইপ প্রস্তুত করাইয়া সিলেট নাগরীতে লিখিত পুস্তক মুদ্রণ শুরু হয়। পরে কলিকাতার শিয়ালদহের 'হামিদী প্রেস' এবং শ্রীহট্ট সহরের 'ইসলামিয়া প্রেস' এই কার্য্যে উৎসাহের সহিত অবতীর্ণ হয়। তারপর ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের দুই একটি শহরে এই হরফ বা টাইপে মুদ্রণ শুরু হয়। আরবী-ফারসী-উর্দু-বর্ণপরিচয়-হীন এবং যুক্তাক্ষর-বহুল বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীন বা আধুনিক বঙ্গসাহিত্য পড়িতে অনভ্যস্ত পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লা, চাষীবাসী ও জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সিলেট নাগরী বর্ণমালায় মুদ্রিত পুস্তকাদির প্রচুর প্রসার খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশকে ঘটে। মাত্র পাঁচটি স্বরবর্ণ, ২৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ, মোট ৩২টি বর্ণ লইয়া 'সিলেট নাগরী'র বর্ণমালা। দেবনাগরী বর্ণমালায় অ, ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ স্বরবর্ণগুলি সিলেট নাগরী সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছে। আনুনাসিক বর্ণগুলিকে কাটছাঁট করা হইয়াছে—ন, ম আছে; ঙ, ঞ, ণ বর্জিত। বাঙ্গালা লিপির বহুসংখ্যক সংযুক্ত বর্ণ এই লিপি সংক্ষিপ্ত করিয়া মাত্র ১৫টিতে দাঁড় করাইয়াছে—পরস্পরের মাথায় চড়িয়া, তলায় যুক্ত হইয়া, কাঁকালে উঠিয়া, গায়ে পড়িয়া সৃষ্ট যুক্তবর্ণ আয়ত্ত করার পরিশ্রম এই লিপিতে স্বীকার করিতে হয় না; মাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ[২] এই লিপিতে আয়ত্ত করিতে পারিলেই গ্রন্থ পাঠ করা যায়। সিলেট নাগরী বর্ণমালা মুদ্রাঙ্কনে যে আকারে ব্যবহৃত হইত তাহার কয়েক-খানি আলোকচিত্র শ্রীহট্ট বানিয়াচঙ্গ নিবাসী পদ্মনাথ দেবশর্মা মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যায় "সিলেট নাগরী" প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

---

১ আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ নহেন। সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর অফ্ স্কুলসের অফিসে কর্মচারী ছিলেন। 'সিলেট নাগরী'র আব্দুল করিম জাহাজ হইতে নদীতে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারান। ২ প্রথম সংযুক্ত বর্ণ আল্ (আলেফ্—লাম্) + বাঙ্গালা হইতে ১৫টি।

ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন ভারতীয় লিপি এবং উর্দূতে ব্যবহৃত আরবী লিপি ছাড়া বর্তমানে আর একটি লিপি—রোমান লিপি—ভারতে প্রচলিত।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে ফিনিসীয় লিপি হইতে গ্রীক লিপির এবং পরে তাহা হইতে রোমান লিপির উৎপত্তি। ফিনিসীয় ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সহিত নবসৃষ্ট ৭টি স্বরবর্ণ গ্রীক বর্ণমালায় যুক্ত হইল। খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ইতালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের নিকট হইতে রোমানরা লিপিবিদ্যা শিখিয়া রোমান লিপি সৃষ্টি করে। গ্রীকলিপির ইত্রাস্কন[১] (Etruscan) বর্ণমালা হইতে সৃষ্ট রোমান বর্ণমালা, লাতিনের মাধ্যমে, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষার বর্ণমালায় গৃহীত হয় ও ক্রমে পাশ্চাত্ত্য জগতে ছড়াইয়া পড়ে। রোমান লিপিতে প্রথমে কেবল Capital letters (majuscules) বা বড় হাতের অক্ষরগুলি প্রচলিত ছিল; ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই বড় হাতের অক্ষরগুলির রূপ যাহা ছিল এখনও প্রায় তাহাই আছে। খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে রোমান লিপিতে ছোট হাতের অক্ষর বা Small letters (minuscules), তাড়াতাড়ি টানা-লেখার জন্য প্রবর্তিত হয়, এগুলির রূপও প্রায় একই আছে। মূল রোমান লিপির সরল গঠন, প্রতিটি ধ্বনি পৃথক পৃথক্ বর্ণচিহ্নে প্রকাশ, দেশ-কাল ভেদে ইহার প্রায় অবিকৃত রূপ এবং ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ইহার বিশ্বময় প্রসার, এই লিপিকে বহুদেশের ও বহু জাতির মধ্যে সুপ্রচলিত করিয়াছে।

পোর্তুগীস বণিক ও রোমান-কাথলিক ধর্মযাজকগণ ভারতে রোমান লিপি আনিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকে গোমন্তক বা গোয়ায়[২] পোর্তুগীস্ যাজকগণ রোমান লিপিতে কোঙ্কনী মারাঠী ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া রোমান হরফে ভারতীয় ভাষায় লিখিত খ্রীষ্টধর্ম-বিষয়ক পুস্তক মুদ্রণ শুরু করেন। কোঙ্কনী ভাষায় সুশিক্ষিত ইংরেজ পাদরি টমাস্ স্টীভেন্স (১৫৪৯-১৬১৯) ষোড়শ শতকের শেষে পোর্তুগীস ভাষায় কোঙ্কনী ব্যাকরণ রচনা ও প্রকাশ করেন এবং সপ্তদশ শতকের প্রথমে বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে মারাঠী ভাষায় পদ্যে "ক্রীস্ত-পুরাণ" গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ (১৬১৩) করেন। গোয়ার ভারতীয় খ্রীষ্টানরা অনেকে এখনও রোমান লিপিতেই নিজ নিজ মাতৃভাষা লেখেন। এক সময়ে গোয়ার গোঁড়া খ্রীষ্টান শাসকেরা দেশীয় বর্ণমালা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীসরা প্রথম বাঙ্গালাদেশে আসেন, হোসেন শাহ তখন

---

১ টাইবার নদীর উত্তরে ইটালির প্রাচীন রাজ্য Etruria'র (বর্তমান Tuscany ও Umbriaর কিয়দংশ) অধিবাসী বা তাহাদের লিপি।

২ ভারতে পোর্তুগীসদের আগমন ১৪৯৭ খ্রী, ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে কেরলের কালিকট বন্দরে। ১৫১০ খ্রী পোর্তুগীসদের গোয়া অধিকার ও গোয়ায় পোর্তুগীস শক্তির ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন। বিদেশ হইতে আনীত রোমান টাইপে ১৫৫৭ খ্রী ভারতে প্রথম বই ছাপা হয়, গোয়ায় পোর্তুগীসভাষায় খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধে। ১৫৭৭ খ্রী কোচিনে পাদ্রি যোহান্নেস্ গোন্সাল্ভেস্ Joannes Gonsalves তামিল অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ভারতীয় বর্ণমালায় প্রথম বই ছাপান।

বাঙ্গালার নবাব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই পোর্তুগীস্ মিশনারিরা বাঙ্গালা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় রোমান লিপি ব্যবহৃত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিশনারিদের চেষ্টায়। বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান, পূর্ববঙ্গের ভূষণার ('বুসনা'-র) রাজকুমার, দোম্ আন্তোনিও দো রোজারিও ১৭শ শতকে 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' রচনা করেন, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এই বইখানির রোমান লিপিতে লেখা বাঙ্গালা রূপ (মানোএল দা আসসুম্প্‌সাম্-কৃত পোর্তুগীস ভাবানুবাদসহ) মুদ্রণের জন্য বঙ্গদেশ হইতে পোর্তুগালে প্রেরিত হয় ১৮শ শতকে, ঐ পাণ্ডুলিপি পোর্তুগালের এভোরা নগরে সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল, বর্তমানে লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে।

পোর্তুগীস্ পাদরী মানোএল্ দা আসসুম্প্‌সাম্, পোর্তুগীসে লিখিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা-পোর্তুগীস ও পোর্তুগীস-বাঙ্গালা শব্দকোষ[১] বাঙ্গালা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখেন ও মুদ্রণ করেন (রচনা পূর্ববঙ্গে ১৭৩৪, মুদ্রণ লিস্‌বনে ১৭৪৩)। তাঁহার রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (Crepar Xaxtrer Orth, bhed) গ্রন্থখানিও রোমান লিপিতে বাঙ্গালা গদ্যে রচিত, রোমান হরফে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বনে মুদ্রিত।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রোমান লিপিতে পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলি লিখিতে ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙ্গালা ভাষায় রোমান লিপিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা বিভিন্ন আদিবাসী-সমাজে কথিত অনার্য্য ভাষাগুলি লেখার জন্য রোমান্ লিপি প্রয়োগ করেন, রোমান হরফে অনার্য্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন।

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন নিরক্ষর অনার্য্য-ভাষায় প্রচলিত রূপকথা, লোক-কাহিনী, গান প্রভৃতি ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রযত্নে ও কল্যাণে রোমান লিপিতে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতের আর্য্যেতর এই ভাষাগুলির সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য রোমান লিপিতে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত এই সব রচনা অমূল্য উপকরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খ্রীষ্টান্ মিশনারীরা রোমান্ লিপিতে এই সব

---

১ Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguez. Dividido em duas partes Dedicado Ao Excellent. E Rever Senhor. D. Fr. Miguel De Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy deligencia do Padre Fr. Manoel Da Assumpc,am Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. + Lisboa : Na Offic. de Francisco Da Sylva. Livreiro da Academia Real, e do Senado. Anno M. DCC XLIII. Com todas as licencas necessarias. (আখ্যাপত্র)। গ্রন্থখানির প্রথম ৪০ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ; শব্দকোষের ১ম ভাগ (৪১-৩০৬ পৃষ্ঠা) বাঙ্গালা-পোর্তুগীস অভিধান ; ২য় ভাগ (৩০৭-৫৭০ পৃষ্ঠা) পোর্তুগীস-বাঙ্গালা অভিধান, ৫৭১-৫৯২ পৃষ্ঠায় তিথির নাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, সপ্তগ্রহের নাম, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের নাম, গায়ত্রী মন্ত্র, সমোচ্চার্য্য বাঙ্গালা শব্দাবলী।

নিবক্ষব ভাষায বাইবেলেব অনুবাদ কবিযা, খ্রীষ্টীয ধর্মকাহিনী বর্ণনা কবিযা, রোমান্ হবফে গ্রন্থ প্রকাশ কবেন এবং বোমান্ লিপিতে ঐ সকল ভাষায পঠন-পাঠনেব অগ্রগতি সাধন কবেন। বিহাবেব দুমকায স্কান্দিনেভীয ধর্মযাজকদেব প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকে প্রোটেস্টান্ট ও বোমান-কাথলিক মিশনাবীবা অস্ট্রিক্ গোষ্ঠীব নিবক্ষব ভাষা সাঁওতালী, মুণ্ডাবী, খাসিযা প্রভৃতিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচাব কবিযা ঐ সব ভাষাভাষী আদি-বাসীগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কবাব জন্য উপযুক্ত লিপিব প্রযোজন অনুভব কবেন। প্রথম দিকে তাঁহাবা সাঁওতালী ও খাসিযাব জন্য বাঙ্গালা লিপি এবং মুণ্ডাবীব জন্য নাগবী লিপি ব্যবহাব কবেন। তাবপব তাঁহাবা বোমান লিপি ব্যবহাব শুরু কবেন—সাঁওতালী ও খাসিযা ভাষাব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বোমান লিপি এবং মুণ্ডাবী ভাষাব ক্ষেত্রে বোমান ও নাগবী উভয লিপি-ই তাঁহাবা ব্যবহাব করিতেছেন। এই সব অস্ট্রিক্ ভাষাব সাহিত্য খ্রীষ্টীয ঊনবিংশ শতকেব প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তাবপব এগুলি লিপিবদ্ধ হইযাছে ও হইতেছে। সাঁওতালী রূপকথা ও গীতিকবিতাব সৌন্দর্য্য এবং মুণ্ডা গীতিকবিতা ও প্রেমগীতিব সহজ সাবল্য ও উষ্ণতা, কৌমজীবনেব প্রাণময অকৃত্রিম রূপ প্রতিফলিত কবিযাছে। নবওযেব মিশনাবী Rev. P. O. Bodding এই সব ভাষাব সাহিত্য বোমান হবফে এক পাতায মূল ও পাশেব পাতায ইংবেজী অনুবাদ-সহ নবওযেব বাজধানী অস্‌লোব Oslo Institute of Comparative Culture এবং ডেন্‌মার্কেব বাজধানী কোপেন্‌হেগেন্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবিযাছেন। মুখ্যতঃ ইউবোপীয মিশনাবীদেব প্রযত্নে ও কল্যাণেই এই ভাষাগুলি লিপিবদ্ধ হইযাছে এবং বোমান ও ভাবতীয বর্ণমালায স্থাযী রূপ লাভ কবিযাছে।[১]

সম্প্রতি সাঁওতালী ভাষাব নিজস্ব লিপি উদ্ভাবন ও প্রচলনেব জন্য শিক্ষিত সাঁওতালীদেব মধ্যে কেহ কেহ সচেষ্ট হইযাছেন। বোমান, বাঙ্গালা, দেবনাগবী লিপি বর্জন কবিযা সাঁওতালীব নিজস্ব লিপি প্রবর্তনেব জন্য সাঁওতাল-সম্মেলনে প্রস্তাবও উঠিযাছে। এই লিপিব 'ওল্' (Ol) নামকবণ হইযাছে, এখনও ইহা পবীক্ষা-নিবীক্ষাব স্তবে আছে; ইহাব বর্ণমালা সুচিন্তিত ও সুপবিকল্পিত নহে।

ভারতেব ভোট-চীন গোষ্ঠীব ভাষা বা কিবাত ভাষাগুলি বহুশঃ নব্য-ভাবতীয লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ কবিযাছে। এগুলিব মধ্যে লেপ্‌চা বা বোঙ্গ্ (Rong) ভাষাব নিজস্ব

১ Father Hoffmann, *Mundari Encyclopaedia*, 13 pts. (Govt. of Bihar); Rev. P. O. Bodding-এব এবং Rev. L. O Skrefsrud-এব সংগৃহীত ও প্রকাশিত সাঁওতালী রূপকথা ও লোকসাহিত্য; বামদাস টুডুব সঙ্কলিত সাঁওতাল লোকসাহিত্য; W. G. Archer-এব তত্ত্বাবধানে বিহাব-সবকাব-প্রকাশিত কোলগোষ্ঠীব বিভিন্ন ভাষাব লোকগীতি; এবং St. Francis de Sales-এব অনুগামী ইতালীয বোমান কাথলিক Salesian মিশনাবিদেব দ্বাবা সংগৃহীত ও প্রকাশিত খাসিযা ভাষাব গ্রন্থগুলি কৌতূহলী পাঠক দেখিতে পাবেন।

বর্ণমালা আছে, ঐ বর্ণমালা তিব্বতী হইতে গৃহীত। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারকালে কাশ্মীর ও উত্তর-ভারতের ভারতীয় লিপির রূপান্তরে তিব্বতী লিপি সৃষ্ট হইয়াছিল, লেপ্‌চা বা রোঙ্‌ বর্ণমালা তাহার রূপান্তর। কিন্তু লেপ্‌চাভাষীর সংখ্যা মাত্র ২৫ হাজার, তাঁহারা ক্রমশঃ ভারতীয় আর্য্যভাষা (নেপালী বা গোর্খালী বা খস্‌-কুরা) ও দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করিতেছেন। নেপালের প্রাচীন নেবারী জাতি (Newari) বঙ্গ-বিহার-মিথিলার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগে প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্বেই উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা জোগাইয়াছে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক হইতেই তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে প্রচলিত ভোট-চীন গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যের রূপ নেবারী ভাষায় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব-ভারতীয় 'কুটিল' লিপি নেপালের লিপিকরগণ কর্তৃক পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া নেবারী লিপির সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ বাঙ্গালা-আসামী, মৈথিল, উড়িয়া লিপিরই সগোত্র নেবারী লিপি। কিন্তু নেবারী লিপির বর্ণমালায় আজ পর্য্যন্ত একখানি বইও মুদ্রিত হয় নাই। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শান্ত নেবারী জাতি যুদ্ধপ্রবণ গোর্খাদের দ্বারা বিজিত হয় এবং নেপালী (গোর্খালী বা পর্বতীয়া বা খস্‌কুরা) ভাষা নেপালের রাজকীয় ভাষা হওয়ায় নেপালী ভাষার লিপি দেবনাগরীতেই নেবারী ভাষার রচনাদি মুদ্রিত হইতেছে। ভোট-চীন গোষ্ঠীর মেইতেই বা মণিপুরী, বোডো (কাছাড়ী, গারো, মেচ, রাভা, টিপ্‌রা, দীমা-সা) এবং গারো ভাষা বাঙ্গালা-আসামী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। মেইতেই বা মণিপুরীর নিজস্ব প্রাচীন লিপি ছিল, ভারতীয় লিপি হইতেই তাহার উদ্ভব। কিন্তু ১৮শ শতক হইতে মেইতেই ভাষা বাঙ্গালা লিপি গ্রহণ করিয়াছে। ভোট-চীন গোষ্ঠীর অপর ভাষা অহম্‌ ১৩শ শতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, অহম্‌ ভাষায় রচিত পুরাতন ঐতিহাসিক সাহিত্য 'বুরঞ্জী' উল্লেখযোগ্য, অহমের নিজস্ব লিপিতে অহম্‌ ভাষায় রচিত দুই একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর অহম মুদ্রায় অহম লিপির বর্ণ রহিয়াছে। আসামী-ভাষী হিন্দুদের মধ্যে অহম্‌ জাতি মিশিয়া গিয়াছে ও আসামী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে।

গারো, লুশেই এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগাভাষা খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রযত্নে অগ্রসর হইতেছে এবং রোমান লিপিতে এই সব ভাষার রচনাও লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইতেছে। হিমালয়ের সানুদেশে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত আকা, আবর-মিরি, দফ্‌লা, মিশ্‌মী প্রভৃতি ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষাগুলি মোট ২০ হইতে ২২ হাজার লোক বলে, এগুলির কোনও লিপি ও বর্ণমালা নাই।

ভোট-চীন গোষ্ঠীর ম্রন-মা (ব্যম্মা) বা বর্মীভাষা সাহিত্যে সমৃদ্ধ। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে পগানের রাজা অনিরুদ্ধ ও তাঁহার দুই পুত্র রাজা চোলু ও রাজা চন্‌-জিৎ-থা'র সময়ে ইহা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সময়কার অস্ট্রিক জাতির মোন্‌দের মধ্যে প্রচলিত ভারতীয়

লিপি কিছু রূপান্তর করিয়া বর্মী লিপি সৃষ্ট হয। আরাকানের আরাকানী ভাষা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রূ উপভাষা বর্মী-ভাষার অন্তর্গত, এগুলি বর্মী লিপিতে লিখিত হয।

উত্তর-পশ্চিম আসামে ও উত্তর-বর্মায বিক্ষিপ্ত খাম্‌তী ভাষা এবং উত্তর-বর্মার শান্ ভাষা (শ্যামী Siami ভাষার রূপভেদ) ভোট-চীন গোষ্ঠীর দৈ বা থাই (Thai) ভাষার অন্তর্গত। বর্মীদের সহিত নিকট সংস্পর্শের ফলে খাম্‌তী ও শান্ ভাষা বর্মী লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে।

কোনও ভাষায ব্যবহৃত বর্ণ অর্থাৎ ধ্বনির প্রতীকচিহ্নগুলির সমষ্টি 'বর্ণমালা' (alphabet)। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ Alpha ও দ্বিতীয় বর্ণ Beta-র সমবায়ে গ্রীক alphabetos, লাতিন alphabetum, ইংরেজী alphabet। কোনও ভাষার বর্ণমালাই নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায উহা ঐ ভাষায় ব্যবহৃত বা উচ্চারিত সমস্ত ধ্বনিকে প্রকাশ করিতে পারে না। একই বর্ণচিহ্নের দ্বারা একাধিক ধ্বনি অনেক সময় নির্দেশিত হয়, যথা, বাংলায় অ- বর্ণের দ্বারা 'অ', 'ও' দুইটি ধ্বনি: অনন্ত, অতুল (ওতুল); ইংরাজীতে 'a' ৬টি স্বরধ্বনির প্রতীকচিহ্ন: তু° father, man, have, spade, water, was; ইংরেজী put, but, lute-এ 'u'-বর্ণ তিনটি পৃথক স্বরধ্বনির প্রতীকচিহ্ন। আবার একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ বর্ণমালায় ব্যবহৃত হয়—যথা বাঙ্গালা জ য; শ ষ স। কালক্রমে উচ্চারণ-বিবর্তনের জন্য ভাষায় বহু ধ্বনি লুপ্ত হইলেও বর্ণমালায় লুপ্ত ধ্বনির বর্ণগুলি কখনও কখনও সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সুচিরাগত প্রথায় রক্ষিত হয়—যথা, বাঙ্গালা বর্ণমালায় ঋ ঌ য ব ণ।

বিভিন্ন ভাষায বর্ণমালার সংখ্যাও বিভিন্ন। মিশরীয় বর্ণমালায় ২৪ (মতান্তরে ২৫)টি বর্ণ, হিব্রুতে ২২টি, গ্রীকে ২৪টি, রোমকে ২৬টি বর্ণ। ইংরেজী ভাষায ২৬, ফরাসীতে ২৩, লাতিনে ২২, ডাচে (ওলন্দাজে) ২৬, স্পানিশে ২৭, ইতালিয়ানে ২০, রাশিয়ানে ৪৮, সংস্কৃতে ৫০টি বর্ণ। আরবীতে ২৮, ফারসীতে ৩২, তুর্কীতে ৩৩, উর্দুতে ৩৫টি, বর্মীতে ১৯টি বর্ণ। বিখ্যাত K'anghsi Dictionary-তে (১৭১৬ খ্রী) চীনীয় বর্ণমালা ৪০,৫৪৫; পরবর্তীকালে সংক্ষিপ্ত হইয়া চীনীয় বর্ণমালা ১০,০০০। এক পিকিংয়ের উপভাষাতেই ব্যবহৃত ৪২০০ শব্দের জন্য ৪২০টি প্রতীক, অর্থাৎ গড়ে একটি প্রতীক-চিহ্নে ১০টি শব্দ। জাপানী ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি মাত্র ৪৭টি বর্ণে প্রকাশ করা যায় দেখিয়া পরবর্তীকালে জাপান চীনীয় বর্ণমালা রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত করিয়া মাত্র ৪৭টি বর্ণে জাপানী ভাষার বর্ণমালা সংহত করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক, পূর্বাপূর্বি ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত। সংস্কৃতে মূল ধ্বনির সংখ্যা ৫০, বর্ণমালায় বর্ণসংখ্যাও ৫০, প্রতিটি ধ্বনির চিহ্ন সুনির্দিষ্ট। গ্রীক-রোমক বর্ণমালার মত সংস্কৃতে স্বর-ব্যঞ্জন এলোমেলো ভাবে সজ্জিত নয়। উচ্চারণস্থান ও হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনি অনুসারে সংস্কৃতে ১৪টি স্বরবর্ণ বিন্যস্ত; সর্বাপেক্ষা লঘু স্বর 'অ' প্রথমে, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ যৌগিক স্বর 'ঔ' সর্বশেষে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ক্রমবিভক্ত ও বর্গীকৃত। মুখবিবরের অভ্যন্তর হইতে বাহিরের স্পর্শ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত—কণ্ঠ হইতে তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ পর্য্যন্ত পর পর উচ্চারণস্থানের ক্রম ধরিয়া—কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য পাঁচটি স্পর্শবর্ণের বর্গ: প্রতি বর্গে ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রথমে দুইটি অঘোষধ্বনি (একটি অঘোষ অল্পপ্রাণ, অপরটি অঘোষ মহাপ্রাণ), তারপর দুইটি ঘোষবৎ ধ্বনি (একটি ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ, অপরটি ঘোষবৎ মহাপ্রাণ), তারপর সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনির সমাবেশ করিয়া প্রতি বর্গে পাঁচটি করিয়া মোট ২৫টি স্পর্শধ্বনি, এবং প্রত্যেকটি ধ্বনির নির্দিষ্ট প্রতীকরূপে ২৫টি স্পর্শবর্ণ। স্পর্শবর্ণের পর চারটি অর্ধব্যঞ্জন অন্তঃস্থবর্ণ (Semi-Vowels and liquids) 'য র, ল, ব'—বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত ইহাদের উচ্চারণে মৌলিক পার্থক্য। তাহার পর ৩টি অঘোষ উষ্মবর্ণ 'শ, ষ, স' এবং একটি ঘোষবৎ উষ্মবর্ণ 'হ'। সর্বশেষে অনুস্বার ও বিসর্গ এবং অনুনাসিক বিন্দু। বাগ্‌যন্ত্র ও মুখবিবরের অভ্যন্তর হইতে ধ্বনিগুলি যে ভাবে ও যে ক্রমে নিঃসারিত হইতেছে তাহার প্রতি সূক্ষ্ম ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত লক্ষ্য রাখিয়া আর কোনও ভাষার বর্ণমালা এই ভাবে বিন্যাস করা হয় নাই। এইরূপ বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত বর্ণমালা আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার॥

গ্রন্থপঞ্জী

Issac Taylor, The Alphabet 2 vols., 1883, 2nd edn. 1890; W. S. Mason, A History of the Art of Writing, 1920; Edward Clodd, The Story of the Alphabet, 1900, 3rd edn. 1938; Oscar Ogg, 26 Letters, 1948; I. J. Galeb, A Study of Writing, 1952; J. Friedrich, Extinct Languages, 1957; Nina M. Davies, Picture-Writing in Ancient Egypt, 1958; W. Flinders-Petrie, The Formation of the Alphabet, 1912; G. Buhler, Indian Palaeography, Eng. Trans. ed by J. H. Fleet, 1904; Rakhal Das Banerji, The Origin of the Bengali Script, 1919.
গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝা, ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা॥

পরিষৎ-সংবাদ

১৩৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮২ বৎসরে পদার্পণ করিল। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৮১তম বর্ষে উপনীত হইল।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ 'দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠা হয়, শ্রাবণ মাসের শেষে একাডেমির পত্রিকা 'The Bengal Academy of Literature. Vol. I. No. 1' প্রকাশিত হয়। ৭ই ফাল্গুন ১৩০০ একাডেমির বাঙ্গালা নামকরণ হওয়ার পর "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। The Bengal Accademy of Literature. Vol. I. No 8" হইতে ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত এই নামে পরিষদের পত্রিকা প্রকাশিত হয়; ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্য্যায়ের পত্রিকা ইংরেজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক ছিল। ১৩০১ শ্রাবণ হইতে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র বর্ষ গণনা করা হইতেছে ॥

পরিষদের ৮২তম বর্ষ কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পরিষদ্ মন্দির হইতে ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুআরি (বৃহস্পতিবার ৩০শে পৌষ ১৩৭১) তারিখে অপহৃত ১১শ শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি বর্তমান বর্ষে আমেরিকার বোস্টন মিউজিয়ামের সৌজন্যে পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এই সংক্রান্ত 'শুভ-সংবাদ' ৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষৎ-সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পরিষৎ-সম্পাদক যথাসময়ে প্রকাশ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্টনি লাল্সলট্ ডিয়াস্ বর্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলংকৃত করিয়াছেন। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদ্ মন্দিরে তাঁহার শুভাগমন প্রার্থনা করিয়া পরিষৎ-সম্পাদক মাননীয় রাজ্যপালকে আহ্বান জানাইলে তিনি পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে যোগদান করিতে এবং পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলংকৃত করিতে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদ্ মন্দির হইতে অপহৃত একটি বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধার বিষয়ে বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের সহিত পরিষৎ-সম্পাদকের পত্রালাপের ও গত ৬৫ বৎসরের পুরাতন নথিপত্রের সহায়তায় অপহৃত মূর্তির স্বত্বস্বামিত্ব পরিষৎ-সম্পাদক কর্তৃক প্রমাণের পর বোস্টন মিউজিয়মের পরিচালক ও পরিষৎ-সম্পাদকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের নকল ও চিঠিপত্রের নকল পরিষৎ-সভাপতি আচার্য্য

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা মাত্র তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গভারতীর প্রবীণ সেবক, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ায় মাননীয় রাজ্যপাল সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের চিকিৎসার জন্য পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রেরণ করেন। মাননীয় রাজ্যপালের এই মহানুভবতায় পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করা হয়। মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশে বীরভূম জেলার কুড়মিঠা গ্রামে সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের গৃহে সুযোগ্য সরকারী চিকিৎসক গিয়া তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। বঙ্গভারতীর সেবকের প্রতি রাজ্যপালের এই শ্রদ্ধা সাহিত্য-পরিষদের সেবকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়াছে॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির প্রাক্তন সদস্য স্বর্গত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীজয়দেব গুপ্ত ও পুত্রবধূ শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী (প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা) প্রতি বৎসর বঙ্গের কোনও প্রবীণ সাহিত্য-সেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে কিছু অর্থদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'রবিবাসর'-এর সর্বাধ্যক্ষ ও সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের মারফৎ তাঁহারা পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট এই প্রস্তাব করেন। বর্তমান বর্ষের জন্য পরিষৎ-সম্পাদকের নিকটে ৩০০ টাকার চেক শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ তাঁহারা প্রেরণ করেন। বর্তমান বর্ষে তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতি শ্রীজয়দেব গুপ্ত ও শ্রীমতী চিত্রিতা দেবীকে তাঁহাদের সাহিত্য-প্রীতি ও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবকগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্য সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পরিষদের আজীবন সদস্য ও সুহৃদ্ শ্রীবলাইচাঁদ সাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হিসাব পরীক্ষার কার্য্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বর্তমান বর্ষে তিনি পরিষৎ-সম্পাদকের হাতে ছয় হাজার টাকা 'সুশান্তবালা স্মৃতি তহবিল' প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়াছেন। শ্রীসাহার ইচ্ছানুসারে ঐ টাকা ব্যাঙ্কে সর্বোচ্চ সুদে স্থায়ী আমানত রাখা হইয়াছে। ঐ গচ্ছিত তহবিলের সুদ হইতে প্রতিবর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য উপকরণ ক্রয় করা হইবে। প্রাচীন গ্রন্থাদি রক্ষার জন্য এই তহবিল হইতে নিয়মিত ব্যবস্থা হইবে।

রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশনের কর্তৃপক্ষ বর্তমান বর্ষে পরিষদের পুরাতন দুর্লভ পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ৯৭৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা হইতে বহু দুর্লভ

প্রাচীন গ্রন্থ বাঁধান হইয়াছে। পরিষদের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সম্প্রতি পরিষৎ-সম্পাদককে তাঁহারা আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ফাউণ্ডেশনের কর্তৃপক্ষকে এজন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি॥

১৩৮১ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে তিনজন কবির চিত্রপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

১৩৮১ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের চিত্রপ্রতিষ্ঠা-উৎসব যথাযোগ্য মর্য্যাদার সহিত সমারোহ-সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। রবীন্দ্রনাথের 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' সঙ্গীতটি এই পুণ্য অনুষ্ঠানে উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে গীত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী কুমারী শুক্লা কুমারের উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধূপদীপ-শোভিত তিনখানি চিত্রপট মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীমদনমোহন কুমার-রচিত 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন ও প্রথম গ্রন্থখানি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ পরিষৎ-সদস্য আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে উপহার দেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের পরিবারে রক্ষিত একখানি পুরাতন ফটোগ্রাফ হইতে কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহেমরঞ্জন দাস একখানি নূতন চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য উপহার দিয়াছেন।

কবি করুণানিধানের জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহের সময় কবির যে-সকল ফোটোগ্রাফ ও চিত্র শ্রীমদনমোহন কুমার সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে শিল্পী শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়, আর. এ. (লণ্ডন) অঙ্কিত করুণানিধানের একখানি চিত্র ছিল। করুণানিধানকে সম্মুখে বসাইয়া শিল্পী ঐ ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন। করুণানিধানের কবি-ব্যক্তিত্ব চিত্রখানিতে পরিস্ফুট। কবি স্বয়ং ঐ চিত্রখানিতে স্বাক্ষর করিয়া শিল্পীকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। করুণানিধানের স্পর্শধন্য এই অপ্রকাশিতপূর্ব ছবিখানি পরিষৎ-প্রকাশিত 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন ও কাব্য' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। মূল ছবিখানি হইতে করুণানিধানের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কনের ভার শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অর্পণ করিয়াছিলেন, এই উৎসবে ঐ তৈলচিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের স্বাক্ষরিত একখানি পুরাতন ফোটোগ্রাফ হইতে তাঁহার তৈলচিত্র প্রস্তুতের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শিল্পী শ্রীবিভূতি সেনগুপ্তকে দেন। কবির স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত তৈলচিত্র এই উৎসবে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রদত্ত পুস্তকাদির কোনও তালিকাও আমরা পরিষদ্ কার্য্যালয়ে খুঁজিয়া পাই নাই। অর্থাভাবে পরিষদ্ প্রয়োজনীয় র‍্যাক্ ও আলমারি তৈয়ারী করাইতে না পারায় এই প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থগুলি ৮ বৎসর ধরিয়া ভূমিশয্যায় ধূলিমলিন ও জীর্ণতর হইতেছিল। ১৩৮১ বঙ্গাব্দে আমরা এই দুর্লভ সংগ্রহ পঞ্জীয়ন করিয়াছি, মোট ২২৫০ খানি প্রাচীন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা এই সংগ্রহে আছে। স্ট্যাকরুমে নূতন র‍্যাক প্রস্তুত করাইয়া, ধূপন-প্রকোষ্ঠে (fumigation chamber-এ) শোধন করিয়া এই দুর্লভ সম্পদ্ সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে। 'সাবিত্রী লাইব্রেরী' হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্য হইতে কয়েকখানিমাত্র দুর্লভ গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম ও প্রকাশকাল নিম্নে দেওয়া হইল; সম্পূর্ণ তালিকা গ্রন্থাগারিকের নিকট পরিষৎ-সদস্যগণ দেখিতে পাইবেন :

বাঙ্গালা

১। কাদম্বিনী-বিলাস—ত্রৈলোক্যনাথ দে, ১২৭২ বঙ্গাব্দ।
২। প্রেম-প্রবাহিনী—বিহারীলাল চক্রবর্তী, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
৩। চণ্ডকৌশিক, ১২৭৫।
৪। বিক্রমোর্বশী—কালিদাস, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ।
৫। জমিদার-দর্পণ—মীর মশাররফ হোসেন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
৬। সবিতা-সুদর্শন—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
৭। সাক্ষাৎদর্পণ নাটক, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
৮। বর্ষবর্তন, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ।
৯। শুক-বিলাস—নন্দকুমার কবিরত্ন, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ।
১০। প্রবোধ প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ।
১১। রত্ন-বেদিকা নাটক—প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
১২। মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ।
১৩। মানস-কুসুম—রামদয়াল ঘোষ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
১৪। নিসর্গ-সন্দর্শন—বিহারীলাল চক্রবর্তী, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।
১৫। নন্দ-বিদায় নাটক—গিরিশচন্দ্র দাস, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
১৬। সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক—প্রাণনাথ দত্ত, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
১৭। সমাজ-সংস্করণ—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।
১৮। মাধব-মালতী—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।
১৯। মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়—টেকচাঁদ ঠাকুর, ১২৬৬।
২০। চক্ষুঃস্থির নাটক—ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
২১। বল্লালী খাত নাটক—১২৭৪ বঙ্গাব্দ।

২২। অম্বিকা-মঙ্গল—ফণিভূষণ বসু, ১২৮৫।
২৩। স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ—বাধামাধব মিত্র, ১২৭০।
২৪। লক্ষ্মণ-বর্জন নাটক—শ্রীশচন্দ্র বায়চৌধুরী, ১২৭৭।
২৫। সরোজিনী বা চিতোব আক্রমণ নাটক, ১৭১৭ শকাব্দ।
২৬। মাতৃ-বিয়োগ—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
২৭। দ্বাদশ কবিতা—দীনবন্ধু মিত্র, ১২৭২ বঙ্গাব্দ।
২৮। বোধেন্দু-বিকাস—ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।
২৯। আত্মীয সভাব সভ্যদিগেব বৃত্তান্ত, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
৩০। অভিমন্যুবধ কাব্য—অঘোবনাথ শর্ম্মা, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
৩১। কিছু কিছু বুঝি—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
৩২। সঙ্গীত রত্নশত—মদনমোহন ঘোষ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
৩৩। শকুন্তলাব বনবিহাব—বসিকচন্দ্র বায়, ১৮৭৫ খ্রীঃ।
৩৪। পদ্মাবতী নাটক—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১২৭২।
৩৫। কি দুঃখেব সত্তব সাল—১২৭১ বঙ্গাব্দ।

ইংরেজী

1. A Narrative of the transaction in Bengal—Francis Gladwin, 1788
2. Ivanhoe—Sir Walter Scott, 1830
3. My Diary in India—W. H. Russell, 1860
4. The Campaign of Sedan—George Hooper, 1870
5. Poetry for Children—Charles & Mary Lamb, 1878
6. The Place of Politics in the Life of a Nation—Annie Besant, 1895

পত্রিকা

১। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১ম কল্প, ১ম ভাগ, ১২৭২ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক: উমেশচন্দ্র দত্ত, আশুতোষ ঘোষ।
২। সাধনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯৮ ও পববর্তী সংখ্যা
সম্পাদক: সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব।
৩। জ্ঞানাঙ্কুব, ১ম বর্ষ, ৩য়—১২শ সংখ্যা, ১২৭৯ ও পববর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক: শ্রীকৃষ্ণ দাস।
৪। জাহ্নবী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯১ ও পববর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক: বীবেশ্বব পাঁড়ে, নলিনীবঞ্জন পণ্ডিত, গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী।

৫। বহস্য-সন্দর্ভ, ৭ম বর্ষ, ১২৭৮ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : বাজেন্দ্রলাল মিত্র, হারাণচন্দ্র রক্ষিত ও অন্যান্য।

৬। নাবায়ণ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৩ ও পববর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন দাস।

৭। প্রচার, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২৯১ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায।

৮। নবজীবন, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২৯১ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : অক্ষযচন্দ্র সরকাব।

৯। নব্যভাবত, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২৯০ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : দেবীপ্রসন্ন রাযচৌধুরী।

১০। ভারতী, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ-চৈত্র ১২৮৪ ও পববর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, স্বর্ণকুমাবী দেবী ও অন্যান্য।

১১। বঙ্গদর্শন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৭৯ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায।

১২। কল্পনা, ১ম বর্ষ, ১২৮৭-৮৮ ও পববর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায।

১৩। কল্পদ্রুম, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১২৮৬।
সম্পাদক : দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ।

১৪। বান্ধব, ১ম বর্ষ, ১২৮১ ও পববর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

১৫। আর্য্যদর্শন, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২৮১ ও পববর্তী সংখ্যা
সম্পাদক : যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায।

১৬। সাহিত্য, ২য বর্ষ, ১২৯৮ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ইংরেজী পত্রিকা

The Dawn, 903.
Editor : Satischandra Mukherjee.

৫. Theosophy in India, 1905
Editor : G. S. Arundale.

পরিষদের বহু মূল্যবান্ সম্পদ্ ও দুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থাদি অবহেলায ও অযত্নে নষ্ট হইতেছে বলিযা ১৯শে মে ১৯১২ (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯) তারিখের পত্রে পবিষদেব সাধারণ সদস্য শ্রীমদনমোহন কুমাব তৎকালীন সভাপতি ও সম্পাদকেব নিকট অভিযোগ কবিয়া-

ছিলেন এবং ঐ অভিযোগ বিবেচনার জন্য নিযুক্ত 'পরিষদ্-সম্পদ্-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত কমিটি'ব দৃষ্টি কতকগুলি পবিত্যক্ত গ্রন্থ ও অব্যবহার্য্য জিনিসপত্রেব স্তূপের দিকে আকর্ষণ কবিযাছিলেন। দুঃখেব বিষয়, উক্ত তদন্ত কমিটি তাঁহাদেব উপর ন্যস্ত দাযিত্ব পালন না কবায ন্যাসবক্ষক-সমিতিব অনুমোদনে ও সম্মতিতে কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ৫ই মাঘ ১৩৮০ (১৯শে জানুআরি ১৯৭৪) উক্ত তদন্ত-কমিটি বাতিল কবেন। ১৩৮১ বঙ্গাব্দের প্রাবম্ভে পবিষৎ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাযের অনুমতি লইয়া বর্তমান পবিষৎ-সম্পাদক ঐ পবিত্যক্ত গ্রন্থ ও অব্যবহার্য্য জিনিসপত্রেব স্তূপ হইতে পবিষদের তিন জন কর্মীব সহাযতায বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ ও দুর্লভ প্রাচীন পত্রিকা উদ্ধার কবাইযাছেন। উক্ত স্তূপ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায দুই হাজার জীর্ণ পুস্তক ও পত্রিকা পাওযা গিযাছে, বহু নষ্টপ্রায় গ্রন্থ ও পত্রিকাব ছেঁড়া খোলা পাতাগুলি সাজাইযা বাখা হইতেছে, এবং সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে তালিকাবদ্ধ কবা হইতেছে। এই পরিত্যক্ত পুস্তক-পত্রিকাগুলির অধিকাংশই অতিজীর্ণ ও ভঙ্গুব হইযাছে, আব কিছুকাল পবেই এগুলি চিবতবে বিনষ্ট হইবে। এই স্তূপ হইতে যে-সমস্ত দুর্লভ পুবাতন পুস্তক, পত্রিকা ও প্রথম সংস্করণেব গ্রন্থ পাওযা গিয়াছে সেগুলিব কযেকখানিব নাম, লেখকেব নাম ও প্রকাশ-কাল নিম্নে দেওয়া হইল :

বাঙ্গালা

১। বিজয-বসন্ত—হবিনাথ মজুমদাব, ১৭৯১ শক।

২। শ্রীযুত গববনর্ জেনবল বাহাদুবেব হজুর কৌন্সেল হইতে যে যে বিষযে যে যে আইন ইঙ্গবেজী ১৭৯৪ সালেব যে যে তাবিখে জাবী হয তাহাব ফিরিস্তি।

৩। গবর্ণমেণ্ট গেজেট, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। বাঙ্গালা ব্যাকবণ—লোহাবাম শিবোবত্ন, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ।

৫। হৃদযোচ্ছ্বাস বা ভাবতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি—যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, ১২৮৭।

৬। কলিকাতাস্থ সদব দেওযানী আদালতেব সরকাবী নিষ্পত্তি সমূহ [ ]।

৭। বিদ্যাসুন্দব টপ্পা—বংশীবদন চট্টোপাধ্যায, ১২২১।

৮। ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তেব জীবন চবিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, ১২৯২।

৯। বত্রিশ সিংহাসন—কালীপ্রসাদ কবিবাজ, ১২৮৩।

১০। জাতকচন্দ্রিকা—সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, ১৮৫০ শক।

১১। শ্রীশ্রীমৎ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ—প্রবোধানন্দ গোস্বামী অনু°, ১৮৮২ খ্রীঃ

১২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচবিতামৃত গ্রন্থ (আদি লীলা), ১২৭৩।

১৩। হ্যামলেট—ললিতমোহন অধিকাবী অনু°, ১২৯৯।

১৪। বাঙ্গালা হাতেমতাই—ঈশ্বচন্দ্র সবকাব, ১২৮৫।

১৫। আনন্দ সিদ্ধান্ত—শ্রীমৎ যোগানন্দ পবমহংস, ১৮৬৫

১৬। বিষ্ণু পুরাণ—বেদব্যাস, ১২৯৭।
১৭। প্রমথনাথ মিত্র গ্রন্থাবলী—প্রমথ নাথ মিত্র, ১৩০৪।
১৮। ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪২ আইন।
১৯। ইংরাজী ১৮১৬ সাল হইতে ১৮২১ সালের আইন।
২০। ইস্টাম্প আইন, ১২৭২।
২১। তারা মা—তারাকুমার কবিরত্ন ১৩০১।
২২। নব্য রসায়নী বিদ্যা—প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১৯০৬ খ্রীঃ।
২৩। হিন্দুশাস্ত্র (২য় খণ্ড)—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৩০৩।
২৪। কাঞ্চনবালা—পঞ্চানন রায়চৌধুরী, ১৮৯৯ খ্রীঃ।
২৫। বীরবরণ—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯০।
২৬। একমেবাদ্বিতীয়ং—রাজা রামমোহন রায়, ১৭৬৫ শকাব্দ।
২৭। পদ্যমালা (৩য় ভাগ)—মনোমোহন বসু, ১৩০০।
২৮। বাউল সংগীত—পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য, ১২৯২।
২৯। বৃহৎ বাউল সঙ্গীত—নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংগ্রা°, ১২৯৩।
৩০। বঙ্গীয় সমালোচক—ফকিরচাঁদ বাবাজী, ১২৮৭।
৩১। বাউল সঙ্গীতহার (১ম ও ২য়)—দশরথ সাহা, ১২৯৩।
৩৩। বাউল সঙ্গীত, ১ম ভাগ—হরিদাস বাবাজী, ১২৯১।
৩৪। বাউল সঙ্গীত (৭ম-১০ম খণ্ড)—ফিকিরচাঁদ, ১২৯২।
৩৫। বাউল সঙ্গীত, ২য় খণ্ড—তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন, ১২৮৯।
৩৬। মুদ্রারাক্ষস—হরিনাথ ন্যায়রত্ন, ১৮৬৭ খ্রীঃ।
৩৭। থিয়েটার সঙ্গীত—শরচ্চন্দ্র সরকার সংগ্রা°, ১২৯৫।
৩৮। সুধাকর ব্যাকরণ—শ্যামাচরণ কবিরত্ন, ১২৯৫।
৩৯। অর্জুন বিজয়—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, ১৮৯৬ খ্রীঃ।
৪০। মনসার ভাসান—কেতকানন্দ দাস, ১২৭৬।
৪১। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—হীরালাল চক্রবর্ত্তী, ১২৮৭।
৪২। বিজয়কুমার—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩০৪।
৪৩। নলচরিত কাব্য—যাদবচন্দ্র তর্কবত্ন, ১৭৮৭ শকাব্দ।
৪৪। ভারতবর্ষ বিচার—রামচরণ শিরোরত্ন, ১২৮৪।
৪৫। বৈষ্ণবাচার দর্পণ—নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ১৮১৯ খ্রীঃ।
৪৬। লক্ষণ বর্জন—দামোদর মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৭ সম্বৎ।
৪৭। ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়নিরূপণ—হরিমোহন প্রামাণিক, ১৩০২।
৪৮। মাতাজী আশ্রম—চুণীলাল মিত্র ১২৯৫।

৪৯। বঙ্কিম-জীবনী—হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ১৩০৬।
৫০। ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, ১৩৩৩।
৫১। ক্ষুদিরাম—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯৪ (অসম্পূর্ণ)।
৫২। শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন—নীরদবিহারী গোস্বামী, ১২৯৬।
৫৩। বিদ্যাসুন্দর টপ্পা—বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রা°, ১২৯৪।
৫৪। রামের বিয়ে (প্রহসন), ১২৮৩।
৫৫। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা ?—রামচন্দ্র দত্ত, ১২৯৯।
৫৬। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবন-চরিত—বিপিনবিহারী মিত্র, ১২৮৬।
৫৭। ভজহরি—পথিকচন্দ্র কবিরত্ন, ১২৯৩।
৫৮। গণিত বিজ্ঞান—জয়গোপাল গোস্বামি, ১২৭৭।
৫৯। পরেশের প্রমাদ— [ ], ১২৯২।
৬০। উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ—পঞ্চানন তর্করত্ন, ১২৯৭।
৬১। গৃহলক্ষ্মী—গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ১৩০৩।
৬২। প্রলয়তত্ত্ব—চন্দ্রশেখর বসু, ১২৯২।
৬৩। সন্ধ্যাসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৮৮।
৬৪। দৈনিক প্রার্থনা—কেশবচন্দ্র সেন, ১৮১০ শক।
৬৫। শরীর বিধান বা জীবিতের দেহতত্ত্ব—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮৮০ খ্রীঃ।
৬৬। বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি—চন্দ্রশেখর বসু, ১২৮২।
৬৭। সাধু গিরীন্দ্রমোহনের জীবনী—শশীভূষণ বসু, ১৮৮৯ খ্রীঃ।
৬৮। বিচার তরঙ্গিণী—কাশীদাস মিত্র, ১২৭৫।
৬৯। জানকী বিলাপ—হরিমোহন রায়, ১২৮২।
৭০। কমলে কামিনী—জীবনকৃষ্ণ সেন, ১২৯০।
৭১। কলির অবতার—মহেন্দ্রনাথ নাথ, ১২৯৪।
৭২। কলি মাহাত্ম্য—এস. বি. পাল, ১৩০৬।
৭৩। কাশরোগ চিকিৎসা—অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য, ১৮৮৩ খ্রীঃ।
৭৪। লক্ষণ দিগ্বিজয়—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য, ১৭৯০ শক।
৭৫। অঞ্জলি—হরিবোল চৈতন্যস্বামী, ১৩০৪।
৭৬। পদকল্পলতিকা—গৌরমোহন দাস সংগ্রা°, ১২৯৭।
৭৭। মূল চণ্ডীর ভাষা—যাদবচন্দ্র শর্ম্মা, ১২৭৬।
৭৮। হরিশ্চন্দ্র নাটক—মনোমোহন বসু, ১২৮৬।
৭৯। অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব—বীরেশ্বর পাঁড়ে, ১২৯৫।
৮০। বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়—গোপাল উড়ে, ১৩৩৪।

৮১। বেদান্ত দর্শন—চন্দ্রশেখর বসু, ১২৯৭।
৮২। সাধন প্রদীপ—শশধর তর্কচূড়ামণি, ১৮২৯ শক।
৮৩। অভিমন্যু সম্ভব কাব্য—প্রসাদ দাস গোস্বামী, ১৮০৩ শক।
৮৪। বসাবিষ্কার বৃন্দক—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১২৮৭।
৮৫। ভুবনদীপকম্—ভট্টনারায়ণ, ১২৯২।
৮৬। রিপুবিহার—মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী, ১২৭৮।
৮৭। এটা কোন যুগ?—সখারাম গণেশ দেউস্কর, ১২৯৯।
৮৮। রামায়ণ—বাল্মিকী, ১৮০৩ খ্রীঃ। (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস)
৮৯। কথা-সরিৎ-সাগর—চন্দ্রনাথ বসু অনু°, ১৩০৯-১৩১৪।
৯০। ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ, ১৩১৭।
৯১। সর্‌জীবাগান—কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৫ খ্রীঃ।
৯২। উজীরপুত্র—ফকিরচাঁদ বর্ম্মণ, ১৮৭৩ খ্রীঃ।
৯৩। ব্যাকরণ সংগ্রহ—হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন স°, ১৯০২ খ্রীঃ।
৯৪। মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং—বোপদেব কৃত, ১২৬১।

ইংরেজী

1. Original Papers relative to the disturbances in Bengal, 1763.
2. Press & Press Laws in India—Hemendra Prasad Ghose, 1930.
3. Proposals for and contributions to A Ballad history of England and the States sprung from her—W. C. Bennett, 1868.
4. The Kinship between Hinduism and Buddhism—Henry S. Olcott, 1893.
5. Sermista : A drama in five Acts, tr from the Bengali by the author Michael M. S. Dutt, 1859.
6. Sacontala or the Fatal Ring, tr. by Sir William Jones, [ ]
7. Modern Painters, Vol. I. 3rd ed. by A Graduate of Oxford, 1846.
8. Origin of the Durga Puja—Pratapachandra Ghosha, 1874.
9. The Sayings of Sri Ramakrishna, Comp. Swami Abhedananda, 1903.
10. Concise History of Religion, Vol. II—F. J. Gould, 1895.
11. Goethe—A. Hayward, 1884.
12. Burke : Selected Works, Vol. I ed. by Payne, 1881.
13. Imperial Dictionary, Vol. II, Comp. Ogilvie, 1856.
14. Literary Studies, Vol. I—Walter Bagehot, 1879.
15. Encyclopaedia Americana, Vol. II, 1830.

16. Keshub Chunder Sen in England. Vol. I, 1881
16. History of the United States—Salma Hale, 1848
17. The Prelude—W. Wordsworth, 1887
18. Massillon's Sermons Vol. I, 1742
19. A Calender of Indian State Papers (Secret Series), Fort William, 1774-78. (1864)
20. The Women of Shakespeare. tr. by H. Zimmern, 1894
21. Man All Immortal—D. W. Clark, 1864
22. A Comprehensive History of the Religion of the Hindus —Dhirendranath Pal, 1901
23. Mudra Rakshasa, Ratnavali etc. tr. by H. H. Wilson, 1901
24. A History of the Early part of the reign of James the Second—James Fox, 1808
25. The Spoilt Child [আলালের ঘরের দুলালের ইংরেজী অনুবাদ] tr. by G. D. Oswell, 1893
26. The Soul of India—Bipin Chandra Pal, 1911
27. A School History of India—Haraprasad Sastri, 1896
28. Naradiya Dharmasastra—Julius Jolly, 1876
29. A Memoir on the Coefficients of Numbers being a Chapter in the Theory of Numbers—Brajendranath Seal, 1891
30. Distracted Love [উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম]—D. N. Singhaw, 1904
31. The Hindu System of Religions, Science and Art—Kishorilal Sarkar, 1898
32. The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy—Mary Carpenter, 1875
33. Puranas—H. H. Wilson, 1898
34. Asiatic Researches, or Transactions of the Society, Vol. I, II, III, IV, V, 1799
35. The Life of Lorenzo De Medici—W. Rosoe, 1847
36. Studies in Early Indian Thought—D. J. Stephen, 1918
37. The Works of the English Poets—Samuel Johnson, 1779
38. A Sketch of the History of Orissa—G. Toynbee, 1873
39. Birds and Flowers—Mary Howitt, 1871
40. A Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese—Samuel Beal, 1871
41. Echoes from Old Calcutta—H. E. Busteed, 1882
42. Indian Coins (with 5 plates)—E. J. Rapson, 1898
43. Kasi or Benares, 1897
44. Abstracts of the Papers printed in the Philosophical Trans-

action of the Royal Society of London Vol. II : 1815—1830, 1833

45. Outlines of Natural Philosophy, Vol. I—John Playfair, 1819
46. Dictionary in English and Bengalee, Vol. I—Ram Comul Sen, 1834
47. The Srauta-Sutra of Katyayana, ed. Dr. Albrecht Weber, 1856
48. Thesaurus/Numismatum./E Musæo/Caroli Patini/Doctoris Medici Parisiensis./Sumptibus Autoris./ M.DC. LXXII. [১৬৭২ খ্রী.] [প্রাচীন মুদ্রা সংক্রান্ত দুর্লভ সচিত্র গ্রন্থ]।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত, পূর্বসূরীদের সুকৃতিলব্ধ এই অমূল্য সম্পদ্ ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করিতে হইলে একটি আধুনিক fumigation chamber, পরিষদ্-ভবনে lamination-এর সরঞ্জাম ও দুর্লভ জীর্ণ গ্রন্থ বাঁধাইয়ের দপ্তরী-খানা, microfilm করার ব্যবস্থা এবং কতকগুলি সুরক্ষিত পুস্তকাধার অবিলম্বে প্রয়োজন। এজন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ও সেই জনসাধারণের গঠিত সরকার এবং সহৃদয় পরিষৎ-সদস্যগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতি লইয়া আমরা গৌরব করি, শ্রম-ও সেবার দ্বারা সেই গৌরব-কীর্তনের অধিকার আমাদের অর্জন করিতে হইবে॥

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই ১৯৭৪, অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় পরিষদ্-মন্দিরে পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা-দিবসে পরিষদ্ মন্দির সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা হয়। প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ ও আম্রপল্লবে মাঙ্গলিক রচনা করা হয়। চিত্রশালার প্রবেশপথ ও গৃহতল, রমেশ-ভবনের দ্বারপথ ও সভাকক্ষ শোভনসুন্দর আলপনায় মণ্ডিত হয়। পরিষৎসভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআর্ল্টনি লান্সলট্ ডিয়াস্ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই উপলক্ষে মাননীয় রাজ্যপাল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় পরিষদ্ মন্দিরে শুভাগমন করিলে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষ হইতে রাজ্যপালকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং পরিষৎ-সভাপতি ও কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সদস্যগণের সহিত মাননীয় রাজ্যপাল পরিষদের গ্রন্থশালা, চিত্রশালা (museum) ও পুথিশালা পরিদর্শন করেন। চিত্রশালায় রক্ষিত প্রাচীন মূর্তি প্রত্নবস্তু ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ, বঙ্গের সাহিত্যিক

ও মনীষিবৃন্দের চিত্রপট হস্তলিপি পাণ্ডুলিপি ও ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, সিস্টার্ নিবেদিতার ডায়েরি ও পেন্সিলস্কেচ, কাদম্বরী দেবী কর্তৃক বিহারীলালকে প্রদত্ত সাধের আসন ইত্যাদি রাজ্যপাল বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত দর্শন করেন; পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথিগুলির সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। চিত্রশালা পরিদর্শনান্তে মাননীয় রাজ্যপাল রমেশ-ভবনের সুসজ্জিত সভাকক্ষে আগমন করেন। পরিষদের সদস্যগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা করেন।

সমবেতকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে প্রেরিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শুভেচ্ছা-বাণী, রোগশয্যালগ্ন প্রবীণ সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শুভকামনা, কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সুধীজনের বাণী সভায় পঠিত হয়। পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে যে সমস্ত গ্রন্থ, পুথি, প্রত্নবস্তু ও শিল্পকর্ম উপহারস্বরূপ পরিষদ্ মন্দিরে প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলির একটি প্রদর্শনী পরিষৎ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। মাননীয় রাজ্যপাল পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রীর প্রদর্শনীটি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে বাঙ্গলার মত সমৃদ্ধ ভাষার আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহার প্রদত্ত হওয়া উচিত, বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাহার অন্তত একখানি কপি লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদান করার জন্য আইন হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টিও মাননীয় রাজ্যপাল এ-বিষয়ে আকর্ষণ করেন।

৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের সাধনা ও কর্মপ্রেরণার বহু অপ্রকাশিত তথ্য-সম্বলিত একখানি পুস্তক "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পর্ব" পরিষদের সভাপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ঐ গ্রন্থের প্রথম কপি মাননীয় রাজ্যপালকে পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষৎ সভাপতি উপহার দেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত একাদশ শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারের শুভ সংবাদ পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার সভায় ঘোষণা করেন এবং বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে, মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ডিয়াসকে, ও ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাওলকে এই বিষয়ে সহায়তার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে গ্রীস হইতে ভারততত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীমতী এলিকি জান্নাস্ Dr. Mrs. Heliki Zannas পরিষৎ মন্দিরে আগমন করেন এবং গ্রীসের আথেনাই (Athens) বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দিমিত্রিঅস্ গালানস্-এর তৈলচিত্র হইতে তিনি যে-ছবি প্রস্তুত করিয়া ভারতে আনিয়াছেন তাহা সভাস্থলে স্থাপনা করেন।

আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার রাজ্যপালকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ভাষণ দেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতীত গৌরব ও বর্তমানের নানামুখী প্রচেষ্টার আলোচনা করেন, সদ্যপ্রকাশিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস' গ্রন্থখানিতে পরিষদের যে বিস্মৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখ করেন। পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য সুনীতি-কুমার তাঁহার ভাষণে পরিষদের বিচিত্র কর্মধারার পরিচয় দেন, পরিষদে কিভাবে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন, এবং গ্রীস হইতে বঙ্গদেশে তথা ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দিমিত্রিঅস্ গালানস্-এর জীবন ও কীর্তির কথা বর্ণনা করেন। পরিষদের উদ্যোগ- ও উন্মেষ-পর্বে ইউরোপীয় মনীষিবৃন্দের সহিত সংযোগের বিচিত্র ইতিহাস —যাহা এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল-তাহা—পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রকাশিত হওয়ায় সভাপতি মহাশয় আনন্দপ্রকাশ করেন এবং প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহার ছাত্র পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার যে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সফল হওয়ায় তাঁহাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন ও বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌরবময় কীর্তির আলোচনা ও পরিষদের বর্তমান উন্নয়নমূলক সমবেত চেষ্টার প্রশংসা করেন, অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অর্থাভাবে পরিষদের যে সমস্ত অমূল্য রত্ন যথাযোগ্যভাবে সংরক্ষণ করা যাইতেছে না সেগুলির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মাননীয় রাজ্যপাল এই সকল অমূল্য সম্পদ্ সংরক্ষণের জন্য দশ হাজার টাকা দান সভাস্থলে ঘোষণা করেন। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ রাজ্যপালের এই মহানুভবতায় সহর্ষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ভাষণে বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বঙ্গের দুই প্রাচীন সারস্বত প্রতিষ্ঠান, এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানাভাবে কার্য্যকর ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। এবং সেজন্য দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড়তর সক্রিয় যোগ তিনি কামনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতুলনীয় দানের কথা উল্লেখ করেন এবং পরিষদের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানান।

সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান, সাহিত্যিক-তীর্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরিশেষে পরিষদের পক্ষ হইতে মাননীয় রাজ্যপাল, আচার্য্য সুনীতিকুমার, আচার্য্য রমেশচন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, 'বনফুল', অভ্যাগত

সুধীবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দকে পরিষৎ-সম্পাদক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদের যে সকল কর্মী নিরলস শ্রমে, হাসিমুখে, নিজেদের নিদারুণ দৈন্য ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও পরিষদের সেবা করিতেছেন ও এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সমবেত-কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত "জনগণ-মণ-অধিনায়ক" গীত হওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়॥

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসবের পর আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে পরিষদের ৮১তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৩৮১ সনের পরীক্ষিত হিসাবপত্র ও উদ্বর্তপত্র, ১৩৮২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ (বজেট) সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের ৮২তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হয় এবং কার্য্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণের নাম ও শাখাপরিষৎ-সমূহ কর্তৃক নির্বাচিত শাখা-প্রতিনিধি-গণের নাম সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত হয়। শ্রীবলাইচাঁদ সাহা (কুণ্ডু) ও শ্রীমলয়কুমার দের চার্টার্ড একাউন্টটান্ট-দ্বয় বিনা পারিশ্রমিকে পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, এবং ১৩৮২ বঙ্গাব্দের জন্য তাঁহাদিগকে হিসাব পরীক্ষক নির্বাচন করা হয়। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানান্তে সভাভঙ্গ হয়॥

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ॥

শুভ সংবাদ

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদের সদস্য, হিতৈষী ও সুহৃদ্‌গণের নিকট একটি পরম শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার অপরিসীম সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি গ্রামের নিকটবর্তী একটি স্থান হইতে তিনটি দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের) পরিষদের চিত্রশালায় (Museumএ) ৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। পরিষৎ-সদস্য কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহ এই তিনটি দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিকট প্রদান করেন। ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ রবিবার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৯, কবির দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মূর্তিগুলি সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শন করেন। এই মূর্তি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্য্য William Rothenstein উইলিয়ম্ রদেনস্টাইন, E. B. Havel ই. বি হ্যাভেল, Percy Brown পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কে. কুমারস্বামী প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত শিল্প-রসিকদের সবিস্ময় প্রশংসা অর্জন করে। ২১শে ফেব্রুআরি ১৯১১ রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আসিয়া এই বিষ্ণুমূর্তি তিনটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন :

I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures; and I think the day will come when full justice wil be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things.

Wiliam Rothenstein
President,
Society of India, Great Britain and Ireland.

February 21, 1911

এই মূর্তি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ সালে লণ্ডনে Royal Academy of Art রয়েল একাডেমি অফ্ আর্ট কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে প্রদর্শিত হইয়া বিশ্ব-শিল্পরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই তিনটি বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে একটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ (১লা মার্চ ১৯৫৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত হয়। ২৫শে ফাল্গুন ১৩৬৩ (৯ই মার্চ ১৯৫৭) কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সম্পাদক নির্মলকুমার বসু এই বিষ্ণুমূর্তি নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া এ-বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে প্রকাশ করেন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ (৮ই জুন ১৯৫৭) তারিখের কার্য্যনির্বাহক

সমিতিব সভায তৎকালীন সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায জানান যে, গত ১লা মার্চ তারিখে পবিষদ্ হইতে যে মূল্যবান মূর্তিটি অপহৃত হইযাছে এবং যাহা এখন পুলিসেব অনুসন্ধানেব বিষয় হইযা আছে তাহা কলিকাতারই কোন ধনী ব্যক্তি ৫০০ পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয কবিযাছেন বলিযা তিনি সংবাদ পাইযাছেন। ঐ টাকা ফেবত পাইলে উক্ত ব্যক্তি মূর্তিটি ফেবৎ দিতে পারেন বলিযা আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে এবং পবিষদেব স্বার্থেব দিকে দৃষ্টি বাখিয়া মূর্তিটি পুনঃসংগ্রহ কবা প্রযোজন বলিযা তিনি চেষ্টা কবিতে বলেন। ২১শে আষাঢ ১৩৬৪ (৬ই জুলাই ১৯৫৭) কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিব সভায "সহকাবী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায জানাইলেন যে, পবিষৎ হইতে অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিটিব সন্ধান নেহাৎ ঘটনাচক্রে পবিষদেবই একজন সভ্য শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশযেব নিকট হইতে পাওযা যায। কলিকাতাব কোন বিশিষ্ট সংগ্রহকারী উহা পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয কবিযাছেন বলিযা জানা যায। ঐ সংগ্রহকাবী পাঁচশত টাকা বিনা বসিদে ফেবত পাইলে ও তাঁহাব নাম প্রকাশ না পাইলে মূর্তিটি পরিষদকে প্রত্যর্পণ কবিতে বাজী হন। উপাযান্তব না থাকায় এবং মূর্তি ফেবত না পাইবার আশঙ্কায বাধ্য হইয়া পাঁচশত টাকা দিযা ঐ মূর্তি ফেবত লওযা হইযাছে।" সভাপতি ও সম্পাদক দুইজনেই কলিকাতার বাহিবে থাকায় শ্রীঅজিত ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায মূর্তিটি পবিষদেব তহবিল হইতে ৫০০ টাকা ব্যযে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং পবে সভা এই খবচ মঞ্জুব কবেন।

পুলিসেব সহাযতা না লইযা এবং পুলিসকে না জানাইযা পরিষৎ নিজ সম্পত্তি ক্রয় কবেন। এ-বিষযে অনুসন্ধান কবিযা সম্প্রতি জানা গিযাছে যে আলিপুরেব রাজা সন্তোষ বোডেব এক ধনাঢ্য ব্যক্তিব গৃহে মূর্তিটি ছিল এবং সেখান হইতে মূর্তিটি আনা হইযাছিল।

তাহাব পব ১৯৬৫ সালেব ১৪ই জানুআবি মধ্যবাত্রে পবিষদের মিউজিযমের তালা ভাঙ্গিযা অপব দুইটি বিষ্ণুমূর্তি চুবি হয। কলিকাতা পুলিসে ও গোযেন্দাবিভাগে সংবাদ দেওযা হয, কিন্তু কোনও মূর্তিবই সন্ধান পাওযা যায না। এ ব্যাপাব লইযা আর কেহ অগ্রসব হন না। এই সংক্রান্ত পুলিস বিপোর্টেব ফাইলটি পরিষৎ-কার্য্যালয হইতে পরে অদৃশ্য হয।

পবিষদেব বিভিন্ন মূল্যবান্ সম্পদ্, প্রাচীন মুদ্রা, প্রত্নবস্তু ইত্যাদি চুরি গিযাছে, স্থানান্তবিত হইতেছে, এবং অবৈধভাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিযা ১৯শে মে ১৯৭২ সালে পরিষদের সাধারণ-সদস্য-রূপে শ্রীমদনমোহন কুমার তৎকালীন পবিষৎ সভাপতি নির্মলকুমার বসু ও সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীব নিকট দৃষ্টান্ত-সহকারে কতকগুলি অভিযোগ করেন। অভিযোগগুলির তদন্তেব জন্য ১১ই জুন ১৯৭২ (২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯) 'পরিষৎ-সম্পদ্-সংরক্ষণ-ও-পবিচালন-তদন্ত-কমিটি' নিযুক্ত হয। দুঃখের বিষয, তদন্ত-কমিটিব কার্য্য

সামান্য অগ্রসর হইয়া বন্ধ হয়। উক্ত তদন্ত-কমিটি তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্য, কাগজপত্র ও কার্য্যবিবরণ পুনঃপুন অনুরোধ সত্ত্বেও কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতির নিকট দাখিল করেন নাই। কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ৫ই মাঘ, ১৩৮০ (১৯শে জানুআরি, ১৯৭৪) উক্ত তদন্ত-কমিটি বাতিল করেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া পরিষদের অপহৃত সম্পদ্ পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৭৪ সালের জানুআরি হইতে বর্তমান সম্পাদক অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৭৪ সালের জানুআরি-ফেব্রুআরি মাসে বর্তমান পরিষৎ-সম্পাদক, পরিষৎ-সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতি লইয়া, ঐ অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিগুলির আলোকচিত্র মনোমোহন গাঙ্গুলীর "Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবি হইতে তুলিয়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রখ্যাত মিউজিয়মে পাঠাইয়া অনুরূপ বিষ্ণুমূর্তি সেখানে আছে কিনা এবং থাকিলে তাহার পরিচয় বিবরণাদি জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার Museum of Fine Arts, Bostonএর কিউরেটর শ্রীযুক্ত যান্ ফন্টেন Jan Fontein ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ-সম্পাদককে জানান যে দুইটি মূর্তির একটির অনুরূপ (ঈষৎ বিকৃত) মূর্তি বোস্টন মিউজিয়মে ১৯৭০ সালে প্রাচীন-শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত হইয়াছে এবং ১৯৩৩ সালে দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture' গ্রন্থে মুদ্রিত ঐ মূর্তির চিত্র দেখিয়া তাঁহারা উহা ক্রয় করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থে বা মুদ্রিত চিত্রে ঐ মূর্তি যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মূর্তি তাহা কোথাও উল্লেখ নাই। ঐ মূর্তির স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণ দাখিলের জন্য পরিষৎ সম্পাদককে আহ্বান জানাইলে পরিষদের গত ৬৫ বৎসরের পুরাতন নথিপত্র ও ২৫ বৎসর পূর্বেকার সংবাদপত্রাদির বিবরণ ও আলোকচিত্রাদি হইতে পরিষদের স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণের নিদর্শন সঙ্কলন করিয়া পরিষৎ-সম্পাদক পাঠান। পরিষদের স্বত্বস্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পরিষদের সম্পত্তি পরিষদে প্রত্যর্পণের জন্য সম্পাদকের অনুরোধে বোস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ অসাধারণ সৌজন্য ও সহৃদয়তার সহিত স্বীকৃত হন এবং সম্পাদকের প্রস্তাব-অনুযায়ী ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হাতে উহা সমর্পণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বোস্টন মিউজিয়মের আইন-উপদেষ্টা মেসার্স কোএট্, হল এণ্ড স্টুয়ার্ট Cohate, Hall & Stewart বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং বোস্টন মিউজিয়ামের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য খসড়া প্রস্তুত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ও সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট শ্রীস্বদেশভূষণ ভূঞ্যা পরিষদের পক্ষে উহা অনুমোদন করেন। গত ২২শে মে, ১৯৭৪ ঐ চুক্তিপত্রের 'প্রথম পক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর পক্ষে সম্পাদক শ্রীমদনমোহন

কুমার এবং 'দ্বিতীয় পক্ষ বোস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস্'-এর পক্ষে ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল্ সী রূপেল্ Merrill C. Rūepell ঐ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও শীলমোহর করেন।

অতঃপর পরিষৎ-সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য এবং ভারত সরকারের ব্যয়ে মূর্তি ভারতে আনার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও তাঁহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানান যে ভারতীয় পররাষ্ট্র-মন্ত্রকে ও ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দফ্‌তরে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটরকেও প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠাইতেছেন।

১২ই জুলাই, ১৯৭৪ মহামান্য রাজ্যপাল রাজভবনে অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের সহিত আলোচনা-কালে এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ ও দলিলপত্র দেখিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

১৯শে জুলাই, ১৯৭৪ বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর পরিষদের ঐ বিষ্ণুমূর্তি ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলের T. N. Kaul-এর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত উহা গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক রাজ্যপাল শ্রীআন্টনি লান্সলট্ দিয়াসের প্রস্তাব অনুসারে ঐ মূর্তি ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পাঠাইবেন। যথোপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ ঐ বিষ্ণুমূর্তি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত আন্টনি লান্সলট্ দিয়াসের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষদ্ মন্দিরে আয়োজিত একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে মহামান্য রাজ্যপাল উহা পরিষদ্ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবীন বর্ষারম্ভে ইহা আমাদের শুভ কর্ম্মপথে প্রেরণা দিবে।

নানা কারণে এ সম্পর্কিত সকল সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে এতদিন গোপন রাখা হইয়াছিল। ৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবের প্রাক্কালে মূর্তি প্রত্যর্পিত হওয়ায় এই আনন্দ-সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পরিষৎ-সদস্যগণের ও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইল।

এই ব্যাপারে সর্ববিধ সহায়তা দান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, রাজ্যপাল শ্রীআন্টনি লান্সলট্ দিয়াস্, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাওল, বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত যান্ ফন্টেন্ Jan Fontein ও ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল সী রূপেল, Cohate Hall & Stewart প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়েল্ড এস. হেনশ্ Weld S. Henshaw, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅজিত ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের

এসিস্টান্ট সেক্রেটারি কল্যাণীয, শ্রীমান্ অজিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাযকে মূর্তি পুনরুদ্ধাবেব বিভিন্ন পর্য্যায়ে প্রয়োজনীয় পবামর্শ, নির্দেশ ও সদুপদেশেব জন্য সর্বান্তঃকবণে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁহাদেব সহায়তা ব্যতীত এই কার্য্য সম্পন্ন কবা সম্ভব হইত না।

অপহৃত দুইটি বিষ্ণুমূর্তি এক লক্ষ ডলাবে আমেবিকায বিক্রয কবা হইযাছে এইরূপ সংবাদ পাইয়া পবিষৎ-সম্পাদক কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসবক্ষক-সমিতিকে জানাইযাছিলেন। এখন জানা গিয়াছে যে বোস্টন মিউজিযমেব কর্তৃপক্ষ ৫০ হাজাব ডলারে (পৌনে চার লক্ষ টাকায) পবিষদে প্রত্যর্পিত এই বিষ্ণুমূর্তিটি ক্রয কবিযাছিলেন। ভারতের জনৈক বিখ্যাত শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতাব নিকট হইতে বোস্টন মিউজিযম উহা ক্রয করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রেতা পরিষৎ-সম্পাদকেব সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া মূর্তি কিভাবে তাঁহাব হস্তগত হয তাহা ব্যাখ্যা করিবেন, বোস্টন মিউজিযম কর্তৃপক্ষ গত ২২শে মে ১৯৭৪ তাবিখে পবিষৎ-সম্পাদককে লিখিযাছেন। উক্ত বিক্রেতা অদ্যাবধি পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আমবা অধীব আগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি।

অপহৃত দ্বিতীয মূর্তিটির পুনবাগমনে পরিষদ্-মন্দির শ্রীমণ্ডিত হইবে, পবিষদেব বিরাশীতম বর্ষেব প্রাবম্ভে ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা ও কামনা॥

পরিশেষে, পরিষদের সদস্যগণকে আমবা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ২২শে জুলাই, ১৯৭৪ মাননীয রাজ্যপাল রাজভবনে পবিষৎ-সভাপতি ও পবিষৎ-সম্পাদকেব সহিত আলোচনাকালে পবিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, গ্রন্থশালা প্রভৃতিব উন্নযন সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ প্রকাশ করিযাছেন। বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব প্রতি তাঁহাব এই প্রীতি ও আনুকূল্য পরিষদেব উন্নয়নেব বিশেষ সহাযক হইবে॥

বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব
কার্য্যনির্বাহক-সমিতিব পক্ষে
শ্রীমদনমোহন কুমাব
সম্পাদক॥

৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১॥
২৫শে জুলাই, ১৯৭৪॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস

প্রথম পর্ব

THE BENGAL ACADEMY OF LITERATURE

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

[১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮৯৩-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সৃষ্টির গোড়ার কথা, ১৮৭২ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পরিষৎ প্রতিষ্ঠার চিন্তা, কল্পনা ও প্রয়াসের কাহিনী ; নবজাত পরিষদের আদর্শ ও কর্মসূচী প্রসঙ্গে জন্ বীম্‌স, ফ্রীড্‌রিখ্ মাক্স ম্যূলর, মনিয়র-উইলিয়ম্‌স, উইলিয়ম উইল্‌সন হাণ্টার, জর্জ বার্ডউড্ প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীর অমূল্য পত্রাবলী ; তাঁহাদের সহিত লিওটার্ড, বিনয়কৃষ্ণ দেব, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের যোগাযোগ ; বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত সাহিত্যপরিষদের সংযোগ ; মাতৃভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের আদর্শ উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীগণের সম্মিলিত প্রয়াস—বঙ্গসংস্কৃতির তথা ভারত-সংস্কৃতির এক বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার ॥

"উপযুক্ত গবেষকের গভীর অধ্যয়ন এবং অভিনিবেশের কাছে এখনও ভাগ্যক্রমে কখনও-কখনও এইরূপ মূল্যবান্ সামগ্রী আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা অনুসন্ধিৎসুর সন্ধানকার্য্যের গৌরব সূচিত করে ॥

এতাবৎ সাধারণ্যে অজ্ঞাত কতকগুলি প্রামাণিক তথ্য বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও উৎসাহে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলে এই সমস্ত মূল্যবান্ দলিল আমরা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি।

এই কাজে যিনি নিজেরই উৎসাহে এবং আগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কাছে এমন অনেক আশ্চর্য্য এবং মনোহর তথ্য আহরণ করিয়া এই পুস্তকে পরিবেষণ করিলেন, তাঁহার কাছে সমগ্র বঙ্গভাষী জাতির তথা আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির আলোচকদের সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করিতেই হয়।"

—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬০ ; চারখানি দুষ্প্রাপ্য হাফ্‌টোন চিত্র, পুরাতন দলিলপত্রের ১২ খানি আলোকচিত্র। দাম পনের টাকা ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ক্রোড়পত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ

দ্বিরশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মান্যবর পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যপাল মহোদয়, সমবেত সজ্জনবৃন্দ—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজিকার এই দ্বিরশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা তথা পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় যাঁহার সহযোগিতা স্বাভাবিক-ভাবেই অপেক্ষিত, তাঁহাকে আমরা আজ আমাদের মধ্যে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালাদেশের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ইংরেজ আমলে অবিভক্ত বঙ্গদেশের (গৌড-বঙ্গের) এবং অধুনাতন ভারত-রাষ্ট্রের অধীন পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যের ইংরেজ শাসক এবং ভারতীয় রাজ্যপাল এতগুলি হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালার ছোট-লাট লর্ড কারমাইকেল সাহেব (১৯১২-১৯১৭) ভিন্ন আর কেহই সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-সম্বন্ধে আগ্রহ দেখান নাই এবং আমরাও তাঁহাদের আর কাহারও সাহচর্য্যের জন্য চেষ্টিত হই নাই, এবং বঙ্গসংস্কৃতির অমূল্য ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পূর্ণ আমাদের এই পরিষদ্-মন্দিরে তাঁহাদের কাহাকেও আমরা পাই নাই। এই ব্যাপারেই আক্ষেপ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনা ও সঙ্গীতের গুণগ্রাহিতা ইংরেজ সরকারের পক্ষে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে দুরধিগম্য বলিয়া, স্বয়ং বঙ্গভাষী দেশবাসী জনগণের প্রতিভূ হইয়া রবীন্দ্রনাথের গানের যৎকিঞ্চিৎ মর্য্যাদা দিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন॥

সুখের বিষয়, আমাদের এখনকার রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত দিয়াস্ আমাদের দেশেরই মানুষ—ইনি পশ্চিম-ভারতের গোমন্তক বা-গোয়া-অঞ্চলের অধিবাসী, কোঙ্কণী ভাষা ইঁহার মাতৃভাষা, এবং এই কোঙ্কণী-ভাষা বাঙ্গালা-ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পৃক্ত। উপরন্তু, ইঁহার সহধর্মিণী বাঙ্গালা-দেশেই—বাঁকুড়ায়—ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার পিতা Joseph A. Vas, I. C. S. যোসেফ এ ভাস, আই-সী-এস্ বোম্বাই-বাসী গোয়ার মানুষ, তিনি বাঁকুড়ার সুদক্ষ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। শ্রীমতী দিয়াস্‌কে আমরা বঙ্গ-দুহিতা বা আমাদের ঘরের মেয়ে বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে ইঁহারা দুই জনেই জড়িত। বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগের জন্য ইঁহারা পরিষদের পরম আত্মীয়॥

পরিষদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের রাজ্যপালের নিকট হইতে আমরা নানা ভাবে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। সুতরাং আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁহার শুভাগমন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ॥

লাতীন ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—সুদূর আফ্রিকা হইতে সব সময়েই কিছু-না-কিছু নূতন বস্তু পাইতে পারা যায়, ex Africa semper aliquod novi. আমাদের পরিষদের আশী বৎসর ধরিয়া এই যে প্রতিষ্ঠা-দিবস আমরা বৎসরের পর বৎসর পালন করি, তাহাতে আমাদের একটি কামনা, যাহা স্বল্প পরিমাণেও পূর্ণ হইয়া থাকে তাহা হইতেছে আমরা এই দিন পরিষদের সেবায় অর্থাৎ বঙ্গভাষা-জননীর সেবায় নূতন উপায়ন, কিছু-না-কিছু, উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। পরিষদের হিতৈষিগণ কেহ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি, বা দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক, অথবা প্রাচীন কোন শিল্পদ্রব্য, বাঙ্গালার মনীষীদের কোনও স্মৃতিচিহ্ন, কোনও চিত্র, অথবা স্বরচিত পুস্তক, এইরূপ রক্ষণযোগ্য দান পরিষদের সংগ্রহ-শালা অথবা গ্রন্থশালার জন্য আনিয়া দেন। কখনও-কখনও এরূপও হইয়া থাকে যে এই দান বা উপায়ন নূতন কোনও গবেষণামূলক গ্রন্থ, ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক মনস্বী নিজের জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার ফলস্বরূপ পরিষদের সেবায় উপস্থিত করিয়া নিজে ধন্য হন॥

আপনারা সকলেই জানেন, এই দুই বৎসর পরিষদের ইতিহাস এক নূতন পর্য্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে-সব কথার আলোচনা এখন পরিষদের ইতিহাসের আলোচনার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমরা সকলেই জানি—পরিষৎ বিশেষ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই দুই বৎসরের পরিচালকগণের নিষ্ঠা এবং অতন্দ্র শ্রমের ফলে এখন পরিষদের অবস্থা কতকটা আমরা সামলাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছি। এই কার্য্যে দেশের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সত্যকার সুহৃদ্বর্গ অকুণ্ঠ সহায়তা করিয়াছেন, এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও সহায়তা পাইয়াছি। পরিষদের পরিচালনার কার্য্যে যেমন আমরা কতকটা বিপদ্‌জাল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি, তেমনই পরিষদের আধিমানসিক এবং আনুষঙ্গিক আধ্যাত্মিক দিকেও আমাদের গতি অবরুদ্ধ হইতে আমরা দেই নাই। নানা বাধা বিপত্তি ও সঙ্কটের মধ্যেও পরিষদের গবেষণামূলক পুস্তক এবং পত্রিকা প্রকাশনার কার্য্য আমরা যথাশক্তি চালাইয়া আসিয়াছি। আমাদের পত্রিকা এখন সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে। আমরা "ভারতকোষ" নামে আমাদের বাঙ্গালা-ভাষার অভিনব লঘু বিশ্বকোষ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ সম্পূর্ণ করিয়াছি। পরিষদের ৭৫-বৎসর-পূর্তি উপলক্ষ্যে পরিকল্পিত "স্মারকগ্রন্থ" বাহির করিয়াছি, এবং "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"-এর ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান্ একখানি আকরগ্রন্থের, সাহিত্যচর্চা এবং ভাষাতত্ত্বালোচনার শ্রেষ্ঠ বিচার-পদ্ধতি ধরিয়া, সটীক নবম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মর্য্যাদা প্রকৃতভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এবং যে মনীষী এই গ্রন্থ

আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে উপহার দিয়া এবং তাহার প্রথম সম্পাদনা করিয়া জাতিকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই পুণ্যশ্লোক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের জীবনবৃত্ত ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের ঋষিঋণ পরিশোধের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। উপরন্তু অনুরূপভাবে এই ঋষিঋণ-পরিশোধের আর একটি সার্থক প্রচেষ্টা পরিষদের পক্ষ হইতে হইয়াছে—আমাদের উৎসাহী সম্পাদক শ্রীমান্ মদনমোহন কুমার তাঁহার অতন্দ্র কর্মশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বাঙ্গালার এক শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, যাঁহাকে আমরা তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম সেই করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ও কাব্যের আলোচনা অবলম্বন করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে নিজ ব্যয়ে একখানি বিরাট্ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বর্ষের পরিষদের লক্ষণীয় কার্য্যের মধ্যে এই দুইটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য॥

এতদ্ভিন্ন আমরা বহু কবি, লেখক ও মনীষীর হস্তাক্ষর, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ও স্মারকদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি। সেগুলির পরিচয় আমাদের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে পাওয়া যাইবে॥

পরিষদ্ আজ ৮২ বৎসর বয়সে উপনীত হইল। আজিকার দিনেও আমরা পরিষদের হিতৈষী বন্ধুদের নিকট হইতেও অন্যান্য বৎসরের মত কিছু-কিছু উপায়ন লাভ করিয়াছি। সেগুলি আপনাদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইতেছে॥

উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠা-দিবসে অত্যন্ত গৌরববোধের সহিত বঙ্গভাষী জনগণের সামনে যে তথ্যসম্পুট উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি, সেটি হইতেছে পরিষদের স্থাপনার ইতিহাস, এবং পরিষদের কর্মাদর্শের মূল অনুপ্রেরণা কিভাবে আমারা প্রাপ্ত হইতে পারিলাম, তাহার লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার-মূলক এই বইখানি—যাহা আজ আমরা প্রথম প্রকাশিত করিতেছি। বইখানি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পর্ব"। নানা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া, অভাবনীয় নূতন তথ্য সমাবেশ ইহাতে করিয়াছেন পরিষদের সম্পাদক শ্রীমান্ মদনমোহন কুমার। এই বই উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান কিভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল—এবং সেই ধ্বংসের কারণ অবহেলা, অজ্ঞতা ও উপেক্ষা, এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত গবেষক বা কর্ণধারের শর্বিলক-বৃত্তি॥

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পরিষদের স্থাপনা এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সুষ্ঠু ভাবনার জন্য আমরা আধুনিক যুগের অর্থাৎ ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের কাছে চিরঋণী। পরিষদ্ যাহা করিয়াছেন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে—বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে—তাহাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রেরণা জোগাইয়াছেন কয়েকজন বিদেশী মনীষী, যাঁহারা ইউরোপের পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করিয়া ভারতবিদ্যার চর্চার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—জন্ বীম্‌স্, ফ্রীড্‌রিখ্ মাক্স ম্যুলর, স্যর্ উইলিয়ম্ উইলস্‌ন্ হাণ্টার,

স্যর্ মনিয়র মনিযব-উইলিযম্‌স্, স্যর্ জ্যর্জ বার্ডউড্। আমাদেব মাতৃভাষা চর্চাব ক্ষেত্রে ইঁহাদেরই প্রবর্তিত ধাবাব মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কবিযাছিলেন স্বযং ববীন্দ্রনাথ, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী এই তিন ঋষি—এবং ইঁহাদেব উত্তবসাধক এখনকাব কালেব বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লইযা যাঁহাবা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা কবিতেছেন সেই-সব আগ্রহশীল বঙ্গসন্তান ॥

শ্রীমান্ মদনমোহনেব সঙ্কলিত এই পুস্তকখানি নানা নূতন তথ্যে অপূর্ব হইযাছে। এই গ্রন্থপাঠে, আমাদেব বাঙ্গালীব দ্বাবা তাহাব মাতৃভাষাব চর্চা বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে কোন্ পথ ধবিযা আবম্ভ হইযাছিল, তাহাব একটা দিগ্‌দর্শন পাওযা যাইবে ॥

'আত্মানং জানীহি'—আপনাকে জানো, এই আত্মজ্ঞান ব্যতীত কোনও উদ্যম কার্য্যকব বা সফল হয না। এই নূতন বৎসবেব প্রাবম্ভে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ্ বাঙ্গালী জাতিকে যে বইখানি উপহাব দিলেন—"বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব ইতিহাস : প্রথম পর্ব"—তাহা বাঙ্গালীর আত্মজ্ঞান উদ্বোধনেব সহাযতা কবিবে। ইহাতেই আমাদেব নূতন বৎসবেব ভবিষ্যৎ সার্থকতার আভাস পাইতেছি বলিযা আমবা আনন্দিত ॥

আমাদের নিজেদেব সম্বন্ধে জানিবাব শুনিবাব এবং শিখিবাব অনেক কিছু আছে। ইউরোপীয সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে নূতন-ভাবে সংস্কৃত-ভাষাব মূল্য এবং মর্য্যাদা বিশ্বমানবেব সমাজে প্রতিষ্ঠা কবিযা গিযাছেন, তাহা আধুনিক ভাবতীয সংস্কৃতিব ইতিহাসে এক অপূর্ব বস্তু ॥

* * * * *

সম্প্রতি আমাদেব কেহ-কেহ এইরূপ একজন বিস্মৃত-প্রায ইউবোপীয পণ্ডিতেব কথা জানিতে পারিতেছি ; এবং ইঁহাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান কবিবাব আগ্রহ লইযা সম্প্রতি এই বৎসর, ইংবেজী ১৯৭৪ সালেব এপ্রিল মাসে, ইউবোপে গ্রীসেব আথেনাই (আথেন্স) নগবে একটু অন্বেষণ কবিবাব সুযোগ আমাব হইযাছিল। কিন্তু দেখিলাম, তাঁহাব সম্বন্ধে নূতন করিয়া অনেক কিছু কাজ কবিবাব থাকিলেও, একজন আমেবিকান পণ্ডিত Catholic University of America কাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ্ আমেবিকাব Siegfried A. Schulz সীগ্‌ফ্রীড্ এ. শুল্‌ৎস্ ইংবেজী ভাষায দুইটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিযা গিযাছেন[১], তাহাতে মুখ্য কথাগুলি প্রায সবই বলিযা গিযাছেন। কিন্তু আবও কতকগুলি কথা একটু গভীরভাবে আমাদেব জ্ঞানগোচবেব অপেক্ষায বহিযাছে। এই-সব কথাব সম্বন্ধেও শুল্‌ৎস্ তাঁহাব যুক্তি এবং অনুমানও আমাদেব সমক্ষে উপস্থাপিত কবিযাছেন। এই পণ্ডিত

১ শুল্‌ৎসেব এই দুই প্রবন্ধ—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয হইতে প্রকাশিত পত্রিকা—"ভাবতী—Journal of the Department of Indology, Banaras Hindu University (1965-66, No. 9, pt II)"—এবং "Journal of the American Oriental Society" (1969, pp. 339-356), এই দুই পত্রিকায মুদ্রিত হইয়াছে।

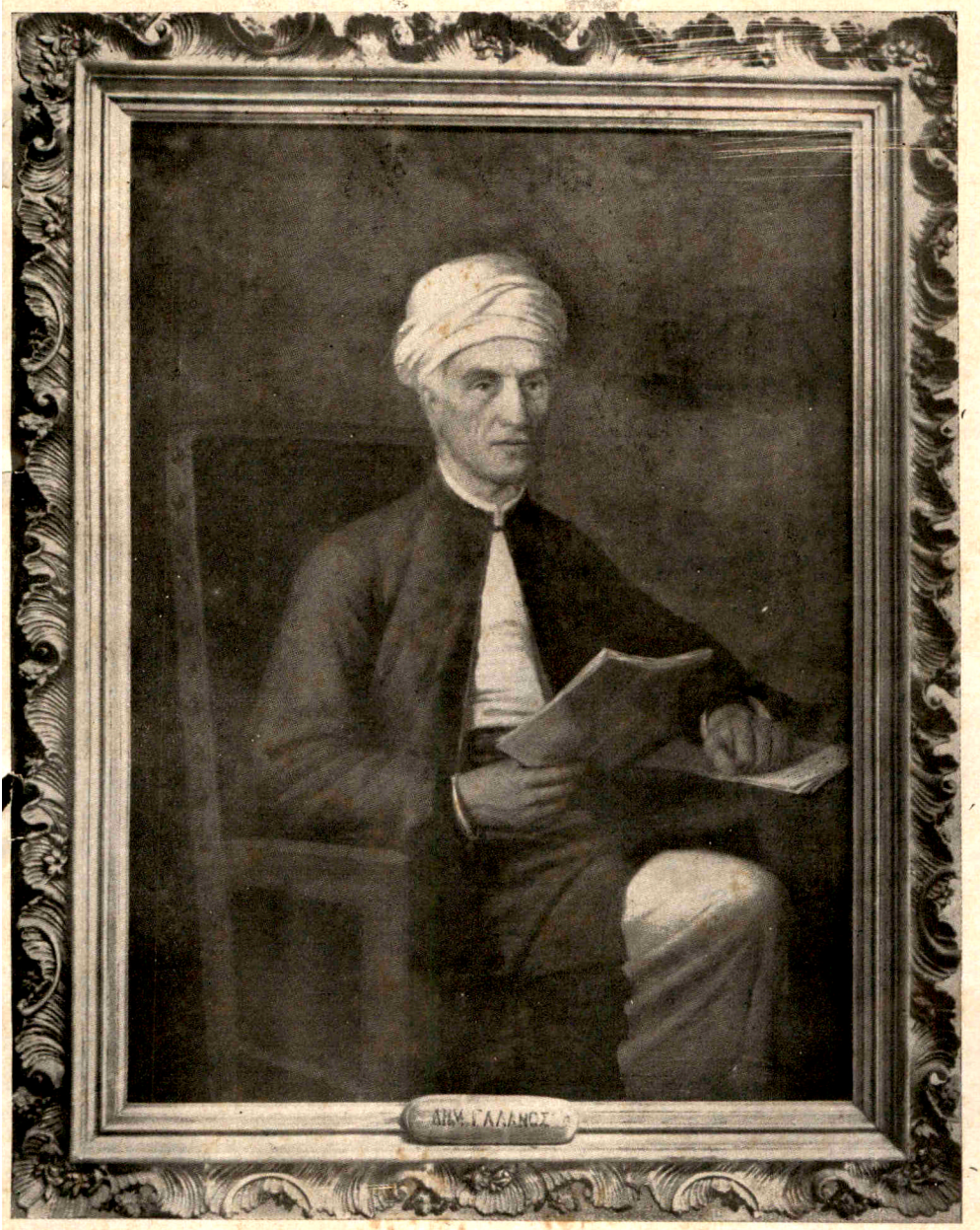

Demetrios Galanos. দিমিত্রিঅস্ গালানস্

ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতবিৎ

জন্ম — আথেনাই, ১৭৬০ মৃত্যু — কাশী, ১৮৩৩

ভারতে আগমন, ১৭৮৬; ঢাকা ও কলিকাতা, ১৭৮৬-১৭৯৩;

কাশীতে সংস্কৃত-চর্চা ও গ্রীকভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, ১৭৯৩-১৮৩৩

(আথেনাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে Dr. Mrs. Heliki Zannas শ্রীমতী এলিকি জান্নাস্-এর সৌজন্যে)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদর্শিত ॥

Demetrios Galanos. দিমিত্রিঅস্ গালানস্

(অধ্যাপক E. P. Panagopoulos-এর সৌজন্যে)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদর্শিত ॥

ব্যক্তি হইতেছেন গ্রীস-দেশ হইতে ভারতে—প্রথমে বঙ্গদেশে—আগত এক বিরাট্ বিদ্বান্ ও মনীষী। ইহার নাম ছিল Demetrios Galanos দিমিত্রিঅস্ গালানস্ (জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১৭৬০—১৮৩৩)। আথেনাই (আথেন্স)-নগরীতে ইঁহার জন্ম, মাতৃভাষা গ্রীকের ব্যাকরণ এবং সাহিত্য খুব গভীরভাবে স্বদেশে অধ্যয়ন করেন, গ্রীক ভাষার একজন মূর্ধন্য পণ্ডিত হন, পরে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ কি ২৭ বৎসর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে আসেন—ভারতে উপনিবিষ্ট তাঁহার স্বদেশবাসী কতকগুলি গ্রীক বণিকের সন্তানদের গ্রীক-ভাষা পড়াইবার জন্য। ইনি প্রথম ঢাকাতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। পরে কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতায় গ্রীক ছেলেমেয়েদের জন্য স্থাপিত ইস্কুলে গ্রীক ভাষা পড়াইতেন। ইঁহার এক বিশেষ মিত্র ও সহায় হন ঢাকা ও কলিকাতার Bonfield Lane-এর গ্রীক বণিক Constantinos Pandazy কন্‌স্তান্তীনস্ পান্দাজি। গালানস্ বাঙ্গালা-দেশেই বাঙ্গালা, ফারসী এবং হিন্দুস্থানীও শিখেন। পরে ১৭৯৩ সালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন, এবং একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর কাশীতেই কাটাইয়া সেইখানেই ১৮৩৩ সালে দেহরক্ষা করেন। কাশীতে ইনি সংস্কৃত-ভাষার মোহে পড়িয়া যান, এবং সেইখানে গভীরভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতের মত বেশভূষা করিয়া মাথায় পাগড়ী পরিয়া থাকিতেন। ইংরেজেরা ইঁহার পাণ্ডিত্যের কথা জানিয়াও ইঁহাকে তেমন আমল দেয় নাই। তবে ইঁহার সংস্কৃত জ্ঞান, স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স্-প্রমুখ পশ্চিম-ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী, জর্মান ও ইতালীয় পণ্ডিতদের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক পদ্ধতির ছিল না। ইনি মধ্যযুগের খ্রীষ্টান Byzantine বিজান্তীয় মনোভাবেরই মানুষ ছিলেন, তবে বিদ্যা-বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভগবদ্‌গীতার একটি অনুবাদ প্রাচীন গ্রীক ভাষায় করেন। ভারতীয় দর্শনের গভীর বিষয়ে ইঁহার আগ্রহ তেমন গভীর হয় নাই। বৈদিক সাহিত্য—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ছিল না, এবং তখনও ইউরোপীয়দের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর কেহ বৈদিক সাহিত্যের খবর পান নাই। কিন্তু ভারতীয় নীতিশাস্ত্র এবং ভারতীয় ইতিহাস পুরাণ বিষয়ক কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ইনি গ্রীক-ভাষায় অনুবাদ করেন। এই-সমস্ত অনুবাদ তিনি করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশের প্রাচীন ধারা-মত, প্রাচীন-গ্রীক-ভাষাতেই—আধুনিক গ্রীক-ভাষায় নহে। জর্মান পণ্ডিতেরা ইঁহার চাণক্যের অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং ইঁহারই মাধ্যমে নীতিশাস্ত্রবিদ্ চাণক্যের সহিত ইউরোপের প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার অনূদিত হস্তলিখিত গ্রীক পুস্তক এবং কিছু-কিছু সংস্কৃত পুথিও তিনি স্বদেশে আথেনাই-নগরীর নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যান। আথেনাই-যের জাতীয় গ্রন্থশালায় হস্তলিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ইঁহার অনূদিত ও উপহৃত হস্তলিখিত পুস্তকগুলি ২০ খণ্ডে এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আছে, এবং এগুলির মধ্যে অনেকগুলি ইতিমধ্যে আথেনাই-যের মুদ্রক ও প্রকাশক G. Typaldos তিপাল্‌দস্-এর যত্নে ও অর্থব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বদেশে বিদেশে

এগুলিব এখনও তেমন আলোচনা হয নাই। গালানস্ ভাবতবর্ষে ব্যবসাযেব সূত্রে কিছু অর্থ উপার্জন কবিযাছিলেন এবং তিনি প্রায আশী হাজাব মোহব বিকৃথ হিসাবে বাখিযা যান। ইহাব অর্ধেক তাঁহাব ভ্রাতুষ্পুত্র Pandoleon বা Pantaleon পান্তালেওনকে দান কবেন, এবং বাকি অর্ধ নবস্থাপিত আথেনাই-বিশ্ববিদ্যালযকে দান কবিযা যান। এই অর্থে আথেনাই-বিশ্ববিদ্যালযেব গৃহাদি নির্মাণকার্যে সহাযতা হয। আথেনাই-বিশ্ববিদ্যালযে ইঁহাব তৈলচিত্র রক্ষিত হইযাছে।

গালানস্ ছিলেন মধ্যযুগেব মনোভাবেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত ধর্মবিশ্বাসী পণ্ডিত—তাঁহাব মানসিক বাতাববণ ছিল আমাদেব দেশেব প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ জ্ঞানী বা বিদ্বান্ পণ্ডিতেবই মত। আমাদেব দেশেব খ্রীষ্টীয অষ্টাদশ শতকেব কোনও মহাপণ্ডিত যদি মাত্র সংস্কৃত-বিদ্যাব আবেষ্টনীব মধ্যে মানুষ হইযা ইউবোপীয বিদ্যাব—লাতীন, গ্রীক, ইংবেজী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যেব—আলোচনায অবতীর্ণ হইযা কেবল যদি সংস্কৃত বিদ্যাবই জ্ঞান লইযা সেগুলিব বিচাবে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে যেমনটি হইত, গ্রীক পণ্ডিত গালানসেব সংস্কৃত-চর্চাও অনেকটা সেই প্রকাবেব অনুরূপ বস্তু হইযাছিল। কিন্তু একটি বড কথা এখানে আছে। গালানস্ কতকগুলি গ্রীক ধর্মীয বিদ্যালযে—আমাদেব দেশেব সংস্কৃত টোলেব মত বিদ্যাকেন্দ্রে—তাঁহাব মানসিক শিক্ষা পাইযাছিলেন। গ্রীক Hellenic হেল্লেনিক বা প্রাচীন গ্রীক যুগে ভাবতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসেব সাক্ষাৎ সম্পর্কেব প্রথম সূত্রপাত হয। সোক্রাতেসেব সঙ্গে আথেনাইতে একজন ভাবতীয বিদ্বানেব আলাপ হইযাছিল, গ্রীক গ্রন্থে তাহাব উল্লেখ আছে। সম্রাট্ আলেক্সান্দবেব ভাবত আক্রমণেব পবে এই সংযোগ আবও ঘনিষ্ঠ হয, এবং ভাবত হইতে গ্রীসে এবং গ্রীস হইতে ভাবতে পণ্ডিতজনেব গমনাগমন হইত। ইহাব কযেক শতক পূর্বেই পিথাগোবাসেব মত গ্রীক দার্শনিক ভাবতে আসিযাছিলেন এবং ভাবতবর্ষেব প্রভাব, আধ্যাত্মিক চিন্তা, পুনর্জন্মবাদ, আমিষবর্জন প্রভৃতি বিষযে গ্রীসেব দার্শনিক চিন্তাব উপবেও পড়িযাছিল। অতি ক্ষীণ ধাবায এই প্রভাব গ্রীসে যাইতে থাকে। Neo-Platonist বা নব্য-প্লাতোনিক্ মতবাদেব দার্শনিকেবা ভাবতবর্ষেব দ্বাবা বিশেষ প্রভাবিত হন এবং উঁহাদেব মধ্যে কেহ-কেহ ভাবতবর্ষেও আসিযাছিলেন। এদিকে গ্রীসে প্রাচীন গ্রীক ধর্মেব অবসান ঘটিল, এবং তাহাব স্থানে ভক্তিমূলক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নবপ্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টান ধর্মেব উপব ভাবতেব ধর্মচিন্তাব প্রত্যক্ষ এবং পবোক্ষ প্রভাবও আসিল—Essenes, Therapeutai এস্সেনি, থেবাপিউতাই প্রভৃতি সম্প্রদাযেব সাধকগণেব মতবাদ এবং তাঁহাদেব জীবনচর্য্যা, বিশেষ কবিযা তাঁহাদেব দ্বাবা অনুষ্ঠিত কৃচ্ছ্রসাধন ও যোগানুষ্ঠান, এগুলি ধীরে-ধীবে প্রথম যুগের গ্রীক খ্রীষ্টানগণেব বিশ্বাস ও আচাবেব মধ্যে একটা স্থান কবিযা লয। খ্রীষ্টীয ১২৯৬ হইতে ১৩৬০ পর্য্যন্ত যাঁহাব জীবৎকাল ছিল, সেই বিখ্যাত এক গ্রীক খ্রীষ্টানধর্মনেতা Gregorios Palamos গ্রেগোরিওস্ পালামস্ একপ্রকাবেব খ্রীষ্টান 'যোগ' অভ্যাস

করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। এই খ্রীষ্টান যোগের ধারণা ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি অদ্ভুতভাবে ভারতের পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের শিক্ষার সঙ্গে মেলে। ইহাতে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের সহিত প্রাণায়ামের, এবং নির্জন স্থানে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাভি-মূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধ্যান-দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি দর্শনের প্রয়াসের মুখ্য স্থান ছিল। তদ্ভিন্ন, এই যোগের মতে পরব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ রূপও কল্পিত ছিল। শুদ্ধ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগ ও যোগচর্য্যা, আসন ধ্যান ধারণা প্রভৃতির স্থান ইহাতে প্রধান ছিল॥

এই মতের যোগীদিগের তখনকার যুগের গ্রীক ভাষায় বলিত Hesykhastes 'হেসিখাস্তিস্', ইংরেজীতে Hesychast ('হেসিকাস্ট'); শব্দটির মৌলিক অর্থ হইতেছে 'চুপ করিয়া থাকা, তুষ্ণী অবলম্বন করা, শান্তভাবে অবস্থান করা, মৌনী হওয়া'। সুতরাং 'হেসিখাস্তিস্' শব্দকে আমাদের 'মুনি' শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। হেসিখাস্ত মতের বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের যাজক ও পণ্ডিত এই গ্রেগোরিওস্ পালামস্। কিন্তু এই মতের প্রতিবাদ করিয়া উহার বিরুদ্ধে লেখেন আর একজন গ্রীক খ্রীষ্টান পণ্ডিত, তিনি ছিলেন Calabria কালাব্রিয়ার (দক্ষিণ ইতালীর) অধিবাসী Barlaam বারলাম (খ্রীঃ ১৪শ শতক) নামে একজন খ্রীষ্টান গ্রীক সাধু। কিন্তু এই মতবাদ ইঁহাদের এই আপত্তি বা সমালোচনায় ধ্বংস হয় নাই। ইহা ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতে থাকে এবং এই মতের পরিপোষকগণের দ্বারা ইহার প্রচারও হইতে থাকে॥

গালানস্, যে-সকল গ্রীক খ্রীষ্টান বিদ্যাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করেন এবং যেখানে তাঁহার গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ করেন, তাহার মধ্যে Misolonghi মিসোলংগী নগরের গ্রীক খ্রীষ্টান বিদ্যাকেন্দ্রে Panagiotis Palamiris বা Palamos পানাযোতিস্ পালামস্ নামে গ্রীক ব্যাকরণ বিষয়ে ও অন্য শাস্ত্রে এক অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, গালানস্ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পণ্ডিত গ্রীক যোগী হেসিখাস্তিস্ সম্প্রদায়ের মতের একজন পরিপোষক ছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে পুস্তকাদিও রচনা করেন। গালানস্ মিসোলংগীতে চার বৎসর ধরিয়া পানাযোতিস্ পালামস্-এর শিষ্য ছিলেন। এরূপ অনুমান শ্রীযুক্ত শুল্‌ৎসের মতে অযৌক্তিক হইবে না যে গ্রীসে ইতিপূর্বে ভারত হইতে আগত এই ধার্মিক যোগসাধন সম্বন্ধে এইভাবে সন্ধান পাইয়া, ইহার সম্বন্ধে আরও জানিবার আগ্রহ গালানসের হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষেই ইহার যে উৎস বিদ্যমান, প্রাচীন গ্রীক পুস্তক পাঠে তাঁহার সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার কাশীতে আগমন ও অবস্থান, সংস্কৃতচর্চা, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভারতবর্ষে আনাইয়া গ্রীক ভাষার আরও অধিক জ্ঞান অর্জন করিয়া এই-সবের চর্চায় তাঁহার—গালানসের নিজের—সহায়ক করিবার আগ্রহ সম্ভবতঃ ছিল, এবং গালানস্ কাশী হইতে নিজে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সম্বন্ধে কোন উৎসাহ আর দেখান নাই॥

হেসিখাস্তিস্ বা বিজাতীয় খ্রীষ্টান যোগী মতবাদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত গালানসের কথা আরও জানিতে পারিলে, আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভারত ও গ্রীসের সহযোগিতার কথা আমাদের কাছে আরও পরিস্ফুট হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা নূতন তথ্য পাইব কি না জানি না। কিন্তু যেটুকু জানিতেছি তাহাতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়িতেছে, এবং বিপুল সম্ভাবনার আভাস আমরা পাইতেছি॥

গালানসের অনূদিত গ্রন্থাবলী এখন ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সময় হইয়াছে॥ এই কার্য্যে আধুনিক গ্রীসের এবং ভারতের উভয় দেশের পণ্ডিতের সাহচর্য্য আবশ্যক হইবে। গালানস্ বাঙ্গালা-দেশে এবং কাশীতে ছিলেন, তাঁহার ভারত-প্রবাসের সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর তিনি এই দুই স্থানেই অতিবাহিত করেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে অধিক আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। গালানসের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া এইভাবে আর একজন ইউরোপীয় মনীষীর সঙ্গে, ঢাকায়, কলিকাতায় এবং কাশীতে, বাঙ্গালার মানুষের একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল—যে যুগে স্যর চার্লস্ উইল্কিন্স, নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্হেড্, স্যর উইলিয়ম জোন্স, উইলিয়ম বোল্টস্, হেনরি পিটস্ ফরস্টার, হেনরি টমাস্ কোলব্রুক্ প্রমুখ কতকগুলি ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালাদেশে দেখা দেন এবং ইঁহারাই ভারতের সঙ্গে বাহিরের আর্য্যজগতের মৌলিক সংযোগ আবিষ্কার করেন। বাঙ্গালার, ভারতের এবং ইউরোপের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক নব পর্য্যায় এইভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়॥

এই শুভ দিনে, আমাদের একজন বিস্মৃত ভারতবিদ্যাবিদ্, যাঁহার মাতৃভাষা ছিল গ্রীক এবং যিনি গ্রীসদেশের তাঁহার পূর্বজ-গণের মত ভারতের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেগুলির চর্চায় দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া বঙ্গদেশে—ঢাকায়, কলিকাতায় — ও বারাণসীতে আত্মনিয়োজিত হইয়াছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক দিমিত্রিঅস্ গালানসের সম্বন্ধে এই পুণ্যপ্রসঙ্গের অবতারণা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিরাশীতম প্রতিষ্ঠাদিবসে সমীচীন বলিয়া মনে করি। আশা করি যথাকালে বাঙ্গালী ও অন্য ভারতীয়গণের কাছে দিমিত্রিঅস্ গালানসের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইবে॥

* * * * * *

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই বিরাশী বৎসরের প্রতিষ্ঠাদিবসে আপনাদের সকলকে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি যে কাজ আমরা করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহার মূল্য সহৃদয়তার সহিত আপনারাও উপলব্ধি করিবেন। আর একটি গুরুভার কার্য্যে আমরা অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাতেও আপনাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ এবং বহুবর্ষব্যাপী সহায়তা আমরা চাই—সেটি হইতেছে, এই একাশী বৎসর ধরিয়া যে আকাঙ্ক্ষা সাহিত্য পরিষদ্ মনে-মনে

পোষণ করিয়া আসিতেছে—বাঙ্গালা ভাষার একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে রচিত এবং ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং সাহিত্যিক প্রয়োগের দ্বারা অলঙ্কৃত অভিধান—যে অভিধানকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার তথা সমগ্র বঙ্গভাষী প্রদেশের প্রান্তিক ও সাম্প্রদায়িক সর্বপ্রকারের লোকভাষার সংগ্রহরূপে আমরা স্থাপন করিয়া যাইতে পারিব—তাহার উপাদান সঙ্কলনে, প্রণয়নে ও প্রকাশে আপনাদের সকলের কার্য্যকরী সহযোগিতা। বঙ্গবাণীর পূজার উপায়ন সংগ্রহে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা ও প্রার্থনা করি॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

একাশীতিতম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ৮১তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সশ্রদ্ধ ও সাদব সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবিযা বার্ষিক কার্য্য-বিববণ উপস্থাপিত কবিতেছি।

আলোচ্য বর্ষেব মধ্যে যে-সকল সাহিত্যসেবী ও দেশেব কৃতী সন্তান পবলোক গমন কবিযাছেন সর্বাগ্রে তাঁহাদেব স্মৃতিব প্রতি গভীব শ্রদ্ধা নিবেদন কবি।

বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু পবিষদেব বিশিষ্ট সদস্য ও পবিষদেব বিজ্ঞানশাখাব পূর্বতন সভাপতি ছিলেন। তাঁহাব পবলোক গমনে পরিষদ্ স্বজন-বিযোগেব বেদনা ও অভিভাবক-বিযোগেব ক্ষতি অনুভব কবিতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব প্রাক্তন সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব পবলোক গমনে পবিষৎ মর্মাহত।

ঐতিহাসিক তাবাচাঁদ, অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ (অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায), রতনমণি চট্টোপাধ্যায, শঙ্কবনাথ (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য), নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীঅববিন্দ আশ্রমেব শ্রীমা, প্রতিভা মুখোপাধ্যায, শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দ্রকুমাব গঙ্গোপাধ্যায, অধ্যাপক প্রফুল্লকুমাব গুহ, অনাদিকুমাব ঘোষ দস্তিদাব, কবি বিজযলাল চট্টোপাধ্যায, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সৈযদ মুজতবা আলী, নগেন্দ্রকুমাব গুহ বায, মুজাফ্ফব আহমেদ, পাহাড়ী সান্যাল (নগেন্দ্রনাথ সান্যাল), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায, বুদ্ধদেব বসু, ননীমাধব চৌধুবী আলোচ্য বর্ষে পবলোকগমন কবিযাছেন।

তাঁহাদেব সকলেব পবলোকগত আত্মাব শান্তি কামনা কবি॥

পৃষ্ঠপোষক

অত্যন্ত আনন্দ ও সুখেব বিষয যে পশ্চিমবঙ্গেব মাননীয বাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্টনি লাম্সলট্ দিয়াস্ বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব পৃষ্ঠপোষক পদ অলঙ্কৃত কবিতে সম্মত হইয়াছেন। বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সংস্কৃতিব প্রতি শ্রীযুক্ত দিযাস্ ও তাঁহাব সহধর্ম্মিণীব অনুবাগ সুদীর্ঘ দিনেব। শ্রীমতী দিযাস্ বঙ্গভূমিতেই ভূমিষ্ঠ হইযাছেন ও বাল্য-কৈশোব অতিবাহিত কবিযাছেন। বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব সহিত তাঁহাদেব আত্মীযতাব যোগ গভীব হওযায আমবা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইযাছি॥

আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক সহায়তা

গত বৎসবেব তুলনায আলোচ্য বর্ষে পবিষদেব আর্থিক অবস্থাব কিছুটা উন্নতি হইযাছে। আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব নিকট হইতে কর্মচাবী নিযোগ খাতে

১১,৩০০ টাকা, পুস্তক প্রকাশ খাতে ১,২০০ টাকা, পত্রিকা প্রকাশ খাতে ২,০০০ টাকা, পৌনঃপুনিক অনুদান ১১,০০০ টাকা, গচ্ছিত তহবিলেব দেনাশোধ খাতে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া গিযাছে। রাজা রামমোহন লাইব্রেবি ফাউনডেশন কমিটি এ বৎসব পুবাতন পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ৯,৭৫০ টাকা পরিষদকে দান করিয়াছেন। এজন্য পশ্চিমবঙ্গেব শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষা মহাধ্যক্ষ ও শিক্ষা-সচিব এবং অর্থ-সচিবকে আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পবিষদ্ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে নিজেব চেষ্টায সংগৃহীত ৯৫০ টাকা গচ্ছিত তহবিলেব ঋণ পরিশোধ কবিয়াছিল, ১৩৮০ বঙ্গাব্দে পবিষদ্ নিজেব চেষ্টায সংগৃহীত ৩,২৫০ টাকা গচ্ছিত তহবিলেব ঋণ শোধ কবিযাছে। বঙ্গসাহিত্যানুবাগীদেব সহায়তা এবং পবিষদেব আয়বৃদ্ধি ও মিতব্যযিতা দ্বাবা গচ্ছিত তহবিলগুলি আমবা কযেক বৎসরেব মধ্যে পূবণ কবিতে পারিব আশা করি॥

গৃহ সংস্কার

পবিষদেব গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, গবেষণাকক্ষ ও পুথিশালাব জন্য বর্তমান পরিষদ্-ভবনেব উপর তৃতীয় তল নির্মাণের বিশেষ প্রযোজন। পরিষদের প্রাচীন পুথি, পট ও চিত্র, দুর্লভ জীর্ণ গ্রন্থ এবং মনীষীদের চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপিগুলি স্বাভাবিক ক্ষয হইতে রক্ষার জন্য ত্রিতলে অন্ততঃ একখানি বাতানুকুল (এযার কণ্ডিশন) কক্ষ নির্মাণ করা প্রযোজন। পরিষদ্-ভবন ও রমেশ-ভবনেব সংস্কাবে প্রযোজনীয উপকবণ, শ্রম ও অর্থদানেব জন্য পরিষদেব সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায, সহকারী সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব ও পবিষৎ সম্পাদক বঙ্গসাহিত্যানুবাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট সংবাদপত্র ও বেতাব মারফৎ আবেদন কবেন। সুখের বিষয, বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী বহু ব্যক্তিব নিকট হইতে এই আবেদনে সাডা পাওযা গিয়াছে। ১৩৮০ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন ব্যক্তিব নিকট হইতে মোট ৩,৫৩৮·২৩ টাকা গৃহসংস্কাব কার্য্যেব জন্য চাঁদা পাওযা গিয়াছে। যাঁহাবা এই বিষযে পবিষদ্‌কে সাহায্য কবিয়াছেন তাঁহাদেব প্রত্যেককেই সাধুবাদ জানাই॥

স্মৃতি-পুরস্কার

গত বৎসব হইতে 'হেমচন্দ্র স্মৃতি-পুবস্কাব', 'অক্ষয়কুমার বডাল স্মৃতি-পুবস্কাব', 'স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কার' ও 'লীলা দেবী স্মৃতি-পুবস্কাব' পুনঃপ্রবর্তন কবা হইযাছে। এই উপলক্ষে গত ৮১তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদেব সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধেব জন্য উক্ত পুবস্কাবগুলি পবিষৎ সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায প্রদান কবেন।

১। **হেমচন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার**॥

বিষয : হেমচন্দ্রেব কবিতায সমকালীন বাঙালী সমাজ।

লেখক : শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শিক্ষা

জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং জননীকল্পা ব্রজমোহিনীদেবীর তত্ত্বাবধানে সানিহাট পল্লীতে হরিমোহনের শিক্ষারম্ভ হয়। সানিহাটে ত্রৈলোক্যনাথের একটি পাঠশালা ছিল। হরিমোহন এই পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। পিতা যদুনাথ তৎকালীন প্রচলিত দেশীয় শিক্ষালাভ করিয়া যজন-যাজন করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। সে যুগে এই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। সেজন্য পিতৃমাতৃহীন হরিমোহন ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতে বেশ বেগ পাইয়াছিলেন। এই বংশের পূর্ব-পুরুষগণের অনেকেই বঙ্গসাহিত্য ও সঙ্গীতে পারঙ্গম ছিলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় হরিমোহনের পিতামহ। হরিমোহন প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন, "বদন অধিকারীর সমস্ত গান আমার পিতামহের মুখস্থ ছিল।[৭] তৎকালীন অধিকাংশ পল্লীগ্রামের মত সানিহাটেও কবিগান, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। হরিমোহনের তরুণ চিত্তে এই সব সাহিত্য সঙ্গীতের প্রভাব মুদ্রিত হইয়া যায়। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সূচনা এখানেই। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া হরিমোহন ক্রমান্বয়ে ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া, পাকুড় প্রভৃতি স্থলের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে ত্রৈলোক্যনাথের নিকট আত্মীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৮] এবং তৎপত্নি বিনোদিনী—

নানাবিধ অলঙ্কারে কিবা শোভা কলেবরে।
রক্তবাসপরা যিনি মঙ্গলা রূপিণী
নিয়ত যুবতী যেন ষোড়শ-বর্ষীয়া হেন,
প্রসন্নবদনা সদা যিনি ত্রিলোচনী ॥
মুণ্ডমালাবলীধরা পীনোন্নত পয়োধরা,
শবোপরি দেবী জটামুকুটমণ্ডিতা।
শত্রুক্ষয়করী যিনি সাধকাভীষ্টদায়িনী
সৌভাগ্যজননী সর্ব্বসম্পদপ্রদাতা ॥
সানিহাটে অধিষ্ঠান পাতকী করিতে ত্রাণ
ভক্তের লইতে পূজা মন্দিরে বিরাজ।
করযোড়ে কহে হরি যেন যমভয়ে তরি
চরণে শরণ মাগো! লইলাম আজ ॥

অপ্রকাশিত, 'শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা' পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী স্তবের কিয়দংশ।'

৭। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। গোপাল উড়ের টপ্পা (১৩১৭) ভূমিকা।
৮। ইনি সাহিত্যিক ও সাময়িকপত্রসেবী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কিনা, জানিতে পারি নাই।

দেবীর আনুকূল্যলাভ করিয়া ভাগলপুরের একটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন—পরে মুজঃফরপুরের মুখার্জিস্ সেমিনারি স্কুল হইতে হরিমোহন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার ছাত্রব্রতের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

বিবাহ

হরিমোহন হুগলী জেলার মাকালপুর সন্নিকটস্থ শিকটা গ্রামনিবাসী কৃষ্ণলাল দেবশর্ম্মণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ক্ষেত্রদাসীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণলালের এই পরিবার পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলার মেমারীতে বসতি স্থাপন করেন। ক্ষেত্রদাসী ১৩২৪ বঙ্গাব্দে লোকান্তরিত হন। হরিমোহনের কনিষ্ঠা কন্যা দুর্গাবালা দেবী বিদুষী মহিলা। অধুনা তিনি কাশীবাসিনী। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত "শশিকলার স্বয়ম্বর" নামে তাঁহার একখানি অপ্রকাশিত কাব্য-নাটকের পাণ্ডুলিপি হরিমোহনের বাসভবনে রক্ষিত আছে। হরিমোহনের ছয় কন্যা ও চারি পুত্র। কনিষ্ঠ কালীনারায়ণ ও দুর্গাবালা ব্যতীত সকলেই গত হইয়াছেন।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদ্দশা হইতেই মাতৃভাষার প্রতি হরিমোহনের প্রবল অনুরাগ সূচিত হয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গ লইয়া গদ্য-পদ্য ও গান রচনা করিয়া সাহিত্যানুরাগী মহলে খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রমে তিনি হুগলী জেলার ভেড়ামারা নিবাসী অম্বিকাচরণ গুপ্ত, চুঁচুড়ার সাহিত্যাচার্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার এবং বঙ্গবাসী কার্যালয়ের অন্যতম সুলেখক বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। তাঁহাদের সুপারিশক্রমে তিনি 'বঙ্গবাসী' কর্ণধার যোগেশচন্দ্র বসুর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার আনুকূল্য লাভ করেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া উঠে।

সাময়িকপত্র সেবা

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ সাময়িকপত্র সেবার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন ১০ টাকা বেতনে প্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। সে সময় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালীন সম্পাদক। ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে 'বঙ্গবাসী'ই সর্বপ্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় (১৮৯১)। কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনা কালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আমি সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 'মাসিক বসুমতী'

পত্রিকার কতিপয় সংখ্যায়। পরে রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[৯] হরিমোহন জীবনে অন্যকোন চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। একাদিক্রমে প্রায় ৩২ বৎসর কাল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সেবা করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদনা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের সময় তাঁর বেতন ছিল ১২০ টাকা। চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকিলেও সাধারণী (১৮৭৩) পত্রিকার সঙ্গে হরিমোহনের কোন সংস্রব ছিল না। এই সূত্রে একটি উক্তির কথঞ্চিৎ উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি 'Jogendranath Bose, afterwards the founder and editor of Bangabasi, learned the art of editing under him in the columns of the Sadharani. Nistramohan Sengupta, Harimohan Mukherjee and many other writers wrote for the journal as well. Harimohan began to write for it in 1875. Hence after wards almost every week, a poem or article of his used to appear in the paper of Sadharani."[১০] স্বভাবতই মনে হইতে পারে আমাদের আলোচ্য হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'সাধারণী'র লেখকসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই উক্তি ভ্রান্তিকর। বর্তমান হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার অনেক আগে আরও দুইজন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্য-সংসারে খ্যাতি অর্জন করেন। একজনেই এই হরিমোহন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। একজন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী কবি- (১৮৬৯) খ্যাত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে র (১২৮৩), কাদম্বিনী নাটক (১৮৬১), মণিমালিনী (১৮৭৪) এবং জয়বতীর উপাখ্যান ৬৩) উল্লেখযোগ্য। অপর হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন নৈহাটী সন্নিহিত রাহুতা ম নিবাসী রস সাহিত্যিক ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সাধারণী মপ্রকাশ, বান্ধব, নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। তিনি মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, ক, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কিছুকাল 'সোমপ্রকাশে'র াদনা করেন। মুকুট উদ্ধার (১৮৬১), অদৃষ্ট-বিজয় (১৮৬১), জীবন সঙ্গীত (১৮৮০), য় প্রতিমা (১৮৮২), যোগিনী (১৮৭৯), কমলাদেবী (১৮৮৫), জীবনতারা (১৮৮৯) ভি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই শেষোক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের ারণী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

'বঙ্গবাসী'র সম্পাদনা বিভাগে হরিমোহন প্রায় ২৯ বৎসর সহকারী সম্পাদকের পালন করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গবাসী সম্পাদক রায়সাহেব বিহারীলাল সরকার

৯। শ্রীহারাধন দত্ত। বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র : দেশ ও কাল (১৯৬৫)
১০। P. N. Bose & H. W B Moreno. A Hundred years of the Bengali Press etc. (1920)

পরলোকগমন করিলে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের উপর বঙ্গবাসী সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কিন্তু হরিমোহন দীর্ঘকাল 'বঙ্গবাসী' সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় শ্রাবণ মাসে হরিমোহন লিখিত কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইংরাজ সরকারের বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়। ফলে 'বঙ্গবাসী' পুনরায় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আদালতের রায়ে সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর নটবর চক্রবর্তী দোষী সাব্যস্ত হন। জরিমানা হিসাবে অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাঁহাদের হাজতবাসের আদেশ হয়। কিন্তু পত্রিকার তদানীন্তন পরিচালক ও মালিক মহেন্দ্রকুমার বসু পরে জরিমানার অর্থ আদালতে জমা দিয়া দেন। এই উপলক্ষে ইংরাজ সরকার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। তাঁহাকে ঐ মাসের বেতন হইতে বঞ্চিত করা হয়। এই ঘটনায় হরিমোহন মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হন এবং বঙ্গবাসী সম্পাদনার কর্ম্ম হইতে পদত্যাগ করেন। এই বৎসরের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হরিমোহনের প্রসিদ্ধ কবিতা 'কারাগার' বঙ্গবাসীতে পত্রস্থ হয়। কবিতাটির প্রথম লাইনে ছিল, "জন্ম তোমার কারাগারে, তাই কারাগার বাস ভাল।" শেষের লাইনে ছিল "কারার নামে কি যে ভয়, জেনেছি তা দয়াময়।"

বঙ্গবাসীর কর্ম জীবনে হরিমোহন সাহিত্য গবেষক, গ্রন্থ সম্পাদক এবং খ্যাতি লেখক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ লাভ করেন। এই সৌভাগ্যের জন্য তিনি 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও তৎপুত্র বরদাপ্রসাদ বসুর উদ্দেশে একাধিক ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের কৃপায় আমার যে সাহিত্য শিক্ষা আরম্ভ, আজ সেই ক্ষুদ্র ফলে তৎপুত্র শ্রীমান বরদাপ্রসাদকে যে আমি কিছু পরিমাণেও তৃপ্ত করিতে পারি ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?"[১১] অন্যত্র বঙ্গবাসীর অন্যতম সম্পাদক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকারকে তিনি তাঁহার সাহিত্য গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[১২] হরিমোহন বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় কবিতা, গান, প্রবন্ধ, রসরচনা, সংবাদ অনুবন্ধ প্রভৃতি আমৃত্যু ভূরি ভূরি লিখিয়াছেন। এ যুগে তাহার পরিমাপ সম্ভব নহে। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ও তিনি 'বঙ্গবাসী'র জন্য সংবাদ ও গান পাঠাইয়াছিলেন। তৎকালীন সম্পাদক শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে একখানি পত্রে লিখিতেছেন—"আপনার পত্র পাইয়াছি এবং গান ও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।"[১৩] বস্তুতঃ বঙ্গবাসী সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, বঙ্গবাসীর আদর্শে উজ্জীবিত হইয়া, বঙ্গবাসীর সম্পাদক পদে উন্নীত

১১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ভজহরি সর্দ্দার (১৩১৪), নিবেদন।

১২। আমার সাহিত্য গুরু,—সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১) ভূমিকা।

১৩। হরিমোহনের বাসভবনে রক্ষিত বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্যের ৯ চৈত্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের প

হইয়া হরিমোহন বাঙলা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সে জন্যই 'বঙ্গবাসী' পত্র সম্পাদন হরিমোহনের সাহিত্য সেবক জীবনে এক তাৎপর্যময় অধ্যায়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী দরবারের সময় বঙ্গবাসীর সত্ত্বাধিকারী পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহযোগিরূপে হরিমোহন দিল্লী গিয়াছিলেন।

মৃত্যু

প্রৌঢ়াবস্থায় হরিমোহন বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই দুই পুত্র—চারি কন্যা গত হইয়াছিল। দুই জামাতা ও পরলোক গমন করেন। রোগ-শোক দারিদ্রের নিষ্পেষণ সকলই হরিমোহন নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, কোন কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৩ মাঘ, শনিবার (১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪২) তারিখে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

গ্রন্থাবলী

হরিমোহন রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাদির মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি নিম্নে তাহার কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। সঙ্গীতসার সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। সম্পা. (বঙ্গবাসী, ১৩০৬)
[বিদ্যাপতি হইতে প্রেমদাস মোট ১২ জন কবির সঙ্গীত সঙ্কলিত হইয়াছে]
২। সঙ্গীত সার-সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পা (বঙ্গবাসী ১৩০৬)
[জয়দেব হইতে পরবর্তী একশতাধিক কবির সঙ্গীত সঙ্কলিত হইয়াছে]
৩। সঙ্গীত-তরঙ্গ। ৺রাধামোহন দাস। সম্পা. (বঙ্গবাসী ১৩১০)
[অবতরণিকায় গ্রন্থের পরিচয়, গ্রন্থের কবিত্ব। সম্পাদন প্রণালী, গ্রন্থকারের গুণ পরিচয়, প্রভৃতি ১২ পৃষ্ঠার আলোচনা]
৪। বঙ্গভাষার লেখক। সম্পা. ১ম ভাগ (বঙ্গবাসী ১৩১১) [৪ পৃষ্ঠার ভূমিকা]
৫। ভজহরি সর্দার (আখ্যান, বঙ্গবাসী ১৩১৪)
৬। নকুড়বাবু (নক্সা-১৩১৬) পশুপতি প্রেস
৭। গোপাল উড়ের টপ্পা অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান (বঙ্গবাসী ১৩১৭)
[ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা]
৮। দাশরথিরায়ের পাঁচালী। ৪র্থ সং, সম্পা. (বঙ্গবাসী ১৩৩১)
[প্রস্তাবনা ১০ পৃষ্ঠা, অভিমত সংগ্রহ ১০ পৃষ্ঠা, সমালোচনা ২৮ পৃষ্ঠা. দাশরথি রায়ের জীবনী ১৯ পৃষ্ঠা]
। শিবাজীর ভবানী পূজা, কাব্য-নাটক (?)
। স্বদেশী সামগ্রী, গুপ্তপ্রেস (?)
১১। সঙ্গীত লহরী (অপ্রকাশিত)
১২। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা (অপ্রকাশিত)
১৩। ন'কড়ির মা (বড গল্প) অপ্রকাশিত [ক্রমশঃ]

হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি

শ্রীমদনমোহন কুমার

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ২০ মাইল (৩১ কিলোমিটারের কিছু বেশি) দূ
হাড়মাসড়া গ্রাম। তালডাংরা থানার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই গ্রামটি সুপ্রাচীন
গ্রামটিতে জৈন ধর্মের কয়েকটি পুরাকীর্তি ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। মাকড়া পাথ
তৈরি উড়িষ্যা শৈলীর পঞ্চরথ ও শিখরদেউল এবং প্রস্তরনির্মিত পার্শ্বনাথ মূর্তি বহুদিন পূর্বে
আবিষ্কৃত হয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি এই গ্রামটি আকর্ষণ করেছে। পার্শ্বনাথ মূর্তিটি
গ্রামের একটি পুকুর থেকে একদা পাওয়া গিয়েছিল। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে
শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এই গ্রামটির কয়েকটি পুরাকী
উল্লিখিত হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা থেকে শিলাবতী নদী-বাহিত পথে জৈন সংস্কৃ
শিলাবতীর উত্তরে হাড়মাসড়া গ্রামে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল এবং হাড়মাস
একদা জৈন ধর্ম-কেন্দ্ররূপে প্রাচীন বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পরবর্তীকা
জৈন-ধর্মের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত ও বৈষ্ণব মূর্তি
পূজা ও মন্দির অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাড়মাসড়া গ্রাম
বিভিন্ন সম্পন্ন অভিজাত গৃহস্থ পরিবারে পোড়ামাটির কাজ করা (Terracotta) ইঁ
অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হয়। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দনের একাধিক মন্দির, নবরত্ন রাসমঞ্চ
পঞ্চরত্ন মন্দিরে বৈষ্ণব বিগ্রহ পরবর্তীকালে গ্রামটিতে বৈষ্ণব প্রভাব সূচিত করে।

১৩৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে (১৯৭৫, মার্চ) বাঁকুড়া জেলায় খরার জন্য সরকারী টেস্ট
রিলিফের কাজের সময় হাড়মাসড়া গ্রামে পুরাতন মজা পুষ্করিণী সংস্কারের কাজ শুরু হয়
সেই সময় 'খোঁড়া' নামক একটি পুষ্করিণী খনন কালে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায়
পুষ্করিণীটির এক পাশে সেচের খাল (canal) ও অপর দুই পাশে চাষের জমি, আর
পাশে কাঁকুরে মাটির জমি, এই জমি অন্য তিন দিকের জমি থেকে বেশ একটু উঁচু।
গ্রামে ইতিপূর্বে আরও দুই তিনটি বৃহদাকার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেগু
মধ্যে একটি জৈনমূর্তি স্থানীয় গ্রামবাসীরা বহুকাল ধরে 'খাঁদেশ্বরী' নামে পূজো
আসছে।

'খোঁড়া' পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য খননকালে ১৩৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে একটি চতুর্ভু
সিংহবাহিনী শক্তিমূর্তি, একটি ক্ষুদ্রকায় প্রস্তরনির্মিত গজলক্ষ্মীমূর্তি, একটি ধাতুমুদ্রা

9 JUN 1976

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর জন প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবির বঙ্গভাষায় রচিত প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ, সন্ধ্যা অপভ্রংশে রচিত সরোজবজ্রের দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষ, হট্টে রচিত 'ডাকার্ণব'; নেপাল রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি পুঁথির সংগ্রহ।

মূল্য পনের টাকা

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম আকরগ্রন্থ। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম হইতে ১১শ খণ্ড

সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী

মূল্য : ১২৫·০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৩৭৪৩

বাঙালী জাতির সারস্বত-সাধনার পীঠভূমী
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্ব্যশীতিতম
বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমাদের
সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা জানাই

JUN 1976

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২/১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০১২

শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৭২-১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
অজিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।